মাসুদ রানা

শুভ্র পিঞ্জর

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

মাসুদ রানা ৪১৭

শুভ্র পিঞ্জর

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7417-3

প্রস্তাবনা

আর্কাইভ রেকর্ড। দ্য টরোন্টো ডেইলি স্টার। ২৩ নভেম্বর, ১৯৩৭।

রহস্যময় অন্তর্ধান!

এস্কিমো গ্রাম জনশূন্য!!

(বিশেষ প্রতিনিধি)

লেক টেরিটোরি, ২২ নভেম্বর। উত্তরাঞ্চলের হ্রদ এলাকায় একটি এস্কিমো গ্রাম জনশূন্য হয়ে যাওয়ার কাহিনির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর। তাঁর বক্তব্যে জানা যায়, দশ দিন আগে জেফ অ্যাবেল নামে একজন সিল-শিকারী এ-বিষয়ে প্রথম তাঁদেরকে খবর দেন। খবরে প্রকাশ, সিলমাছের খোঁজে লেক অ্যাঞ্জিকুনি-র পারের দুর্গম এলাকায় গিয়েছিলেন মি. অ্যাবেল; সেখানকার এক এস্কিমো গ্রামে ঢুকে পুরো এলাকা জনশূন্য অবস্থায় আবিষ্কার করেন তিনি। কোনও নারী, পুরুষ বা শিশু ছিল না গ্রামে; প্রতিটি বাড়ি ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। মি. অ্যাবেলের মনে হয়েছে—একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছে প্রতিটা মানুষ, কারণ তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পড়ে ছিল ঘরের ভিতরে।

আর.সি.এম.পি-র ইন্সপেক্টর জ্যান বার্নার্ড ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এসে সিল-শিকারীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। গ্রামবাসীরা সত্যিই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। তিনি সাংবাদিকদেরকে জানান, 'তল্লাশিতে আমরা অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকা খাদ্যসামগ্রী, শিকারের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পেয়েছি। কিন্তু গ্রামবাসীদের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি। এমনকী তাদের পায়ের ছাপও দেখা যায়নি কোথাও। এস্কিমোদের স্লেড-ডগগুলোকে পাওয়া গেছে বরফে চাপা পড়া অবস্থায়—অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, না খেতে পেয়ে মারা গেছে কুকুরগুলো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এস্কিমোদের প্রাচীন গোরস্থানটা তছনছ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি কবর খুঁড়ে ভিতর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে মৃতদেহ। কে বা কারা এ-কাজ করেছে, কেন করেছে... তার কোনও সদুত্তর নেই আমার কাছে।'

অনুসন্ধান ও তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের পক্ষ থেকে। তবে এখন পর্যন্ত এস্কিমো গ্রামবাসীদের অন্তর্ধান এক মস্ত বড় রহস্য...

এক

সাম্প্রতিক সময়। উত্তর মহাসাগর। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ।

আর্কটিক সার্কেল থেকে পাঁচশো আটত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে, চল্লিশ ফ্যাদম গভীরতায়, তরল অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলেছে ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল। প্রায় নিঃশব্দে ঘুরছে টুইন প্রপেলারের ব্লেড, মার্কিন নৌবাহিনীর নবীন রিসার্চ সাবমেরিনটা সাবলীল গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বরফ ও পানির গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করছিল ভিতরে, সেটার ব্যাঘাত ঘটল প্রক্সিমিটি অ্যালার্ম বেজে ওঠায়। ব্রিজের ডাইভিং অফিসারের পোস্টে ছোট একটা ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকল কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার।

'সুইট মাদার অভ গড!' সবিস্ময়ে বলে উঠল সে। 'দ্যাটস্ আ মনস্টার!'

এগজিকিউটিভ অফিসারের এই মন্তব্য শুনে কোনও ভাবান্তর হলো না ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডনের চেহারায়। পেরিস্কোপ-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চোখ লাগিয়ে রেখেছেন স্কোপের অপটিকাল সাইটে, সাবমেরিনের টাইটেনিয়াম ও কার্বন স্টিলের খোল ছাড়িয়ে সামনের সাগরকে স্টাডি করছেন। আর্কটিকে এখনও শীতকাল বিরাজ করছে, কবে শেষ সূর্য দেখেছেন ভুলেই

গেছেন। সময়টা তাই দুপুর হলেও পানির উপর-নীচ... দু'জায়গাতেই জেঁকে বসে আছে আঁধার। চাঁদের হালকা আভা আছে আকাশে, তবে সারফেসে জমে থাকা বরফের পরত পেরিয়ে তার খুব সামান্যই আসতে পারছে নীচে। পেরিস্কোপে মাথার উপরের বরফের ছাত দেখছেন ক্যাপ্টেন—পোলার আইস ক্যাপের হিসাব অনুসারে পুরুত্ব দশ ফুটের বেশি হবে না, তবে সেটা স্রেফ গড়পড়তা হিসাব। ভাসমান বরফের এই এবড়ো-খেবড়ো স্তর কোথাও মাত্র ছ'ইঞ্চি পাতলা, আবার কোথাও বা নেমে এসেছে আশি ফুট নীচ পর্যন্ত।

তবে এ-মুহূর্তে সামনে যে-পাহাড়টা উদয় হয়েছে, সেটা সবকিছুকে হার মানাবে। বরফের এক মাউণ্ট এভারেস্ট... উল্টো হয়ে ঝুলছে পানির তলায়। সারফেসের কাছাকাছি অংশটা চওড়া; যত গভীরে নেমেছে, ততই সরু হয়ে এসেছে—ইনভার্টেড মাউন্টেইন বলে এগুলোকে।

চূড়ার মত অংশটার চারপাশে চক্কর দিল পোলার সেণ্টিনেল। কমাণ্ডার ফিশার অনুমান করল, 'কমপক্ষে এক মাইল হবে গভীরতা।'

'এক দশমিক চার মাইল,' সঠিক হিসাব জানাল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে বসা চিফ অভ দ্য ওয়াচ। টপ-সাউণ্ডিং সোনারের ডিসপ্লে-তে আঙুল রাখল। হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ডওয়েভের মাধ্যমে বরফের পুরুত্ব মাপে যন্ত্রটা।

পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরালেন না ক্যাপ্টেন গরডন। ক্যামেরার চোখের চাইতে নিজের চোখদুটোকে বেশি বিশ্বাস করেন তিনি। হাত বাড়িয়ে সাবমেরিনের যিনন স্পটলাইট জ্বেলে দিলেন, আলোকিত করে তুললেন বরফ-পাহাড়ের কিনার। সাদা নয়, গাঢ় নীল আর কালোর মিশেল যেন পাহাড়টা—বয়সের ছাপ। সাবমেরিন একেবারে পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে ঘুরছে,

আইস-ম্যাপিং সোনারের প্রক্সিমিটি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে সে-কারণেই।

'অ্যালার্মটা বন্ধ করো কেউ,' গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

'আই, আই, স্যর!'

নীরবতা ফিরে এল সাবমেরিনের ভিতর। কথা বলছে না কেউ। অক্সিজেন জেনারেটরের মৃদু হিসহিস, আর ইঞ্জিনের হালকা গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। আর সব নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের মত পোলার সেন্টিনেলও এক নিঃশব্দ বাহন। আকারে অবশ্য অন্যান্যদের তুলনায় অর্ধেক, ঠাট্টা করে ট্যাডপোল-ক্লাস বলে ডাকা হয় এটাকে। তবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিঙের সর্বোচ্চ উৎকর্ষের সাহায্যে মিনিয়েচারাইজড করা হয়েছে একে। সমস্ত ইকুইপমেন্ট একেবারে অত্যাধুনিক, ক্রু লাগে অনেক কম, অটোমেটেড সিস্টেম চালায় জাহাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ। গবেষণা কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এই সাবমেরিন—কোনও আর্মামেন্ট নেই, যাতে বেশি করে সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট এবং পার্সোনেল বহন করা যায়। তবে ইচ্ছে করলে অস্ত্র-শস্ত্র বসিয়ে নেক্সট জেনারেশন অ্যাটাক সাবমেরিনেও পরিণত করা যাবে একে।

এখনও ইভ্যালুয়েশন পিরিয়ড চলছে নবীন এই সাবমেরিনের। আপাতত এটাকে যুক্ত করা হয়েছে ওমেগা ড্রিফট্ স্টেশন নামের একটি সায়েন্টিফিক রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সঙ্গে। পোলার আইস ক্যাপের উপর স্থাপন করা হয়েছে এই ফ্যাসিলিটি, যৌথভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটা গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান মেরু এলাকার রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছে স্টেশনটা থেকে।

গত এক সপ্তাহ ধরে আইস ক্যাপের বিভিন্ন জায়গায় মিটিয়োরোলজিক্যাল সেন্সর বসানোর কাজ করছে পোলার

সেন্টিনেল। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছে ডুবো-পাহাড়টার পাশে।

'এতবড় আইসবার্গ আগে কখনও দেখিনি আমি,' হঠাৎ বলে উঠল কমাণ্ডার ফিশার।

'সঠিক টার্মটা হলো, আইস-আইল্যাণ্ড।' শোনা গেল নতুন একটা কণ্ঠ।

পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে মাথা ঘোরালেন ক্যাপ্টেন গরডন। ধূসর চুল আর দাড়িঅলা একজন মানুষ উপস্থিত হয়েছেন ব্রিজে। ড. লার্স মিকেলসেন, সুইডিশ ওশনোগ্রাফার। ভিডিও মনিটরের দিকে একটা হাত তুললেন তিনি, তারপর ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বললেন, 'সাইক্লপস থেকে আরও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে ওটা। কিছু মনে করবেন না, ক্যাপ্টেন, ড. বেকেট চাইছেন আপনি ওখানে একটু আসুন। ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পেরিস্কোপের গ্রিপ ভাঁজ করলেন গরডন। হাইড্রোলিক কণ্ট্রোল রিঙে চাপ দিতেই অপটিক মডিউল-সহ পুরো পোলটা ঢুকে গেল হাউজিঙের ভিতরে। পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে নেমে এলেন তিনি। কমাণ্ডার ফিশারের উদ্দেশে বললেন, 'এক্স.ও., ইউ হ্যাভ দ্য কন্।'

ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ফিশার। বলল, 'আপনি সাইক্লপসে যাচ্ছেন? চারপাশে এত বরফ থাকা অবস্থায়? সাহস আছে বলতে হবে!'

'তোমার নেই?' বাঁকা সুরে বললেন গরডন। জবাবের প্রতীক্ষা না করে ড. মিকেলসেনের পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন ব্রিজ থেকে।

সুইডিশ ওশনোগ্রাফারের চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। 'আমার এত বছরের ক্যারিয়ারে এমন অসাধারণ আইস-আইল্যাণ্ড আর দেখিনি।'

'তা-ই?' হালকা গলায় বললেন গরডন। হাত বোলালেন

মাথার লাল চুলে।

মাথা ঝাঁকালেন মিকেলসেন। শুরু করলেন লেকচার, যেন স্টকহোমের ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেছেন। 'এ-ধরনের আইস-আইল্যাণ্ড অত্যন্ত বিরল। মেইনল্যাণ্ডের গ্লেসিয়ার ভেঙে উৎপত্তি হয় এর। সাগরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বরফের এসব পর্বত গিয়ে পোলার আইস-ক্যাপের গায়ে ভেড়ে, জমে গিয়ে আটকা পড়ে। ধীরে ধীরে আইস-ক্যাপেরই একটা অংশে পরিণত হয় কয়েক বছরের মধ্যে।' ফরওয়ার্ড হ্যাচ পেরুবার সময় এক পলক পিছনে তাকালেন তিনি। 'অনেকটা চকলেটের গায়ের বাদাম-কণার মত।'

ছ'ফুট লম্বা শরীরটা বাঁকিয়ে হ্যাচ পেরুলেন ক্যাপ্টেন গরডন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই আবিষ্কারের বিশেষত্ব কী? ড. বেকেট এই বাদাম-কণার ম্যাপিং করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন কেন?'

মেইন প্যাসেজ ধরে সেন্টিনেলের রিসার্চ সেকশন পেরুচ্ছেন মিকেলসেন। বললেন, 'কারণ এ-সব আইস আইল্যাণ্ডের ভিতরে আটকা পড়ে বহু পুরনো বরফ... কপাল ভাল হলে প্রাগৈতিহাসিক আমলের পাথর আর বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনও পাওয়া যেতে পারে। জমাট বাঁধা অতীত... যদি কাব্যের ভাষায় বলি আর কী।'

কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন, শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন।

'এ-সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না,' বলে চললেন মিকেলসেন। 'এমন একটা স্পেসিমেন আবার কবে পাওয়া যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পোলার আইস-ক্যাপের আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশি। এর ভিতর কোথায় কোন্ আইস-আইল্যাণ্ড আটকা পড়ে আছে, তা নাসা-র স্যাটেলাইট দিয়েও পিনপয়েন্ট করা সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছেন, ভাসমান অবস্থায় এমন একটা আইল্যাণ্ড পেয়ে যাওয়া স্রেফ কপাল, একটা মিরাকল।'

'মিরাকল কি না জানি না, তবে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং নিঃসন্দেহে,' বললেন গরডন। ব্যাকগ্রাউণ্ড এবং পোলার রিজিয়নের প্রতি আগ্রহের কারণে সেন্টিনেলের কমাণ্ড দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর পিতা ছিলেন *ইউ.এস.এস. নটিলাস*-এর ক্রু—১৯৫৮ সালে মার্কিন ওই সাবমেরিন ইতিহাসে প্রথমবারের মত আর্কটিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তর মেরুতে পাড়ি জমিয়েছিল। এবারের অভিযান তাই ক্যাপ্টেন গরডনের জন্য পারিবারিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার অভিযান।

করিডোরের শেষ মাথায় একটা বন্ধ হ্যাচের সামনে পৌঁছে থামলেন ড. মিকেলসেন। 'আসুন, ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখতে হবে আপনাকে।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

ভদ্রলোককে এগোবার ইশারা করে পিছনে চোখ বোলালেন ক্যাপ্টেন। পুরো সাবমেরিনটা দু'ভাগে বিভক্ত। আফট সেকশনে রয়েছে ক্রু-দের লিভিং কোয়ার্টার আর ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল। ঠিক মাঝখানটায় ব্রিজ। সামনের অংশটা পুরোপুরি গবেষণা এলাকা। তবে সাবমেরিনের নাকের ডগায়... যেখানে টর্পেডো রুম এবং সোনার ইকুইপমেন্ট থাকার কথা, সেখানে করা হয়েছে সবচেয়ে বড় মডিফিকেশন।

হ্যাচ খুলে সেন্টিনেলের নোজ সেকশনে ঢুকে পড়লেন মিকেলসেন, পিছু পিছু গরডন। ঢুকেই চোখ কুঁচকে ফেললেন প্রৌঢ় ক্যাপ্টেন। বরফ-পাহাড়ের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে যিনন স্পটলাইটের প্রখর আলো... চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। মেঝে বাদ দিলে সাবমেরিনের পুরো নাকটা পুরু লেক্সান পলিকার্বনেট দিয়ে তৈরি। স্বচ্ছ এই আবরণ ভেদ করে সম্মুখ এবং দু'পাশের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়। বাইরে থেকে দেখলে বিশাল এক চোখের মত লাগে জায়গাটাকে, তাই আদর করে নাম দেয়া হয়েছে—সাইক্লপস্... গ্রিক পুরাণের একচক্ষু দানবের

নামে।

আলো সয়ে আসার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন ক্যাপ্টেন, তারপর চোখ বোলালেন আশপাশে। অ্যাপ্রন পরা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট আর ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকে রয়েছে। কয়েকজন সিম্যান-ও আছে তাদের সঙ্গে, ক্যাপ্টেনকে সটান স্যালিউট ঠুকল। পাল্টা স্যালিউট করলেন গরডন। তারপর তাকালেন সামনের দিকে।

'ইম্প্রেসিভ, তাই না?' কিন্নর একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওদিক থেকে।

চোখ পিটপিট করলেন গরডন, স্বচ্ছ দেয়ালের মাঝখানে ছিপছিপে একটা দেহ ফুটে উঠেছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চিত হবার জন্য ডাকলেন, 'ড. বেকেট?'

'আর কে?' মিষ্টি একটা হাসি শোনা গেল। ড. শ্যারন বেকেটের কণ্ঠ এবার চিনতে পারলেন গরডন।

মেয়েটা ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের প্রধান। বয়স খুব বেশি না, টেনেটুনে ত্রিশ-বত্রিশের মত হতে পারে। এ-বয়সেই গোটা একটা গবেষণা-কেন্দ্রের টপ পজিশন বাগিয়ে নিয়েছে সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায়। এতে পারিবারিক প্রভাবের কোনও ভূমিকা নেই। পরিবারের প্রসঙ্গ তোলা হলো, কারণ ওর পিতা অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট হচ্ছেন প্যাসিফিক সাবমেরিন ফ্লিটের কমাণ্ডার... অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, ছোটবেলা থেকে নৌবাহিনীর পরিবেশে বড় হয়েছে শ্যারন; হাবভাব, কথাবার্তা... সবকিছুই সূক্ষ্ম নাবিকসুলভ। দু'বছর হলো শ্যারনের সঙ্গে পরিচয় ক্যাপ্টেন গরডনের, বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওঁদের মধ্যে।

গলা খাঁকারি দিলেন গরডন, নিশ্চিত হলেন শ্যারন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে কি না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে

সাইক্লপস্?' যদ্দূর সম্ভব স্পষ্টভাবে করলেন প্রশ্নটা, যাতে তাঁর ঠোঁট পড়তে পারে মেয়েটা। উনিশ বছর বয়সে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনায় শ্রবণশক্তি হারিয়েছে শ্যারন, এখন লিপ-রিডিঙের মাধ্যমে অন্যের কথা বুঝে নেয়।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্যারনের দৃষ্টি। বলল, 'যতটা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও কয়েক গুণ ভাল। ইটস্ আমেইজিং।' মুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকাল, স্বচ্ছ দেয়ালের কারণে মনে হচ্ছে যেন ভেসে চলেছে পানির ভিতর দিয়ে।

তরুণী বিজ্ঞানীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেন না ক্যাপ্টেন গরডন। জাত সাবমেরিনার তিনি, সাগরতলের বিপদ-আপদ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখেন। এক ফুট পুরু প্লাস্টিকের আবরণের উপর তাই আস্থা রাখতে পারছেন না, সাবমেরিনের নাকটা টাইটেনিয়াম আর কার্বন স্টিল দিয়ে মোড়া হলে অনেক বেশি স্বস্তি অনুভব করতেন।

'আমাকে ডেকেছেন কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখাব বলে,' ডুবোপাহাড়ের দিকে ইশারা করল শ্যারন, কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস। ভুরু কুঁচকে বাইরে তাকালেন গরডন। যিনন স্পটলাইটের আলোয় চকচক করছে পাহাড়ের গা—স্থির, নিষ্কম্প। কিন্তু এর ভিতরে অস্বাভাবিক কিছু নেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তরুণী বিজ্ঞানীর দিকে ফিরলেন তিনি।

'নতুন *ডিপআই* সোনার সিস্টেমটা টেস্ট করছিলাম আমরা,' বলল শ্যারন, 'পাহাড়ের ভিতরদিককার বরফের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য। অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছি।'

ইকুইপমেণ্টটা সম্পর্কে জানা আছে ক্যাপ্টেন গরডনের। গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেইডারের উন্নত সংস্করণ—বরফের আবরণ ভেদ করে দেখতে পারে, অনেকটা এক্স-রের মত। এখনও

এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে আছে জিনিসটা। শ্যারনেরই ডিজাইন—জিয়ো-সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে ওর।

'কী পেয়েছেন?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন গরডন।

ইকুইপমেন্ট প্যানেলের কাছে তাঁকে নিয়ে গেল শ্যারন। বলল, 'প্রথম দুটো চক্করে কিছুই পাইনি। তবে পেঁয়াজের খোসার মত একটা একটা করে বরফের স্তর ভেদ করে ডিপআই। এক ধরনের ভাইব্রেশন তৈরি করে টার্গেটে, বরফের টেম্পারেচার বাড়ে... উপরের স্তর পাতলা হয়ে যায়। যা হোক, এভাবেই দেখতে দেখতে...'

কথা শেষ হলো না ওর, আচমকা ঝট করে সোজা হলেন গরডন। ডিপআই-এর কাজের পরিণতি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন। সাবমেরিনের আশপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট-বড় নানা আকারের বরফের চাঁই—নিশ্চয়ই পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে ওগুলো। উপরদিকে তাকালেন, বিশাল একটা ক্লিফ ফেসের তলায় পৌঁছেছে সেন্টিনেল, তাঁর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে কেঁপে উঠল ওটা। পরক্ষণে ক্লিফের বিশাল একটা অংশ আলাদা হয়ে গেল পাহাড়ের গা থেকে। যেন স্লো-মোশনে নামতে শুরু করল সাবমেরিনের গায়ের উপরে।

ইন্টারকমের কাছে ছুটে গেলেন গরডন। 'ক্যাপ্টেন টু দ্য ব্রিজ!'

'সমস্যাটা আমরাও দেখেছি, স্যর,' ওপাশ থেকে ভেসে এল কমাণ্ডার ফিশারের কণ্ঠ, ক্যাপ্টেনের মনের কথা পড়তে পারছে। 'ফ্লাডিং নেগেটিভ।'

পরক্ষণে পায়ের তলায় পরিচিত ঝাঁকি অনুভব করলেন গরডন। ইমার্জেন্সি ট্যাঙ্কে ঢুকতে শুরু করেছে পানির প্রবাহ। চোখের পলকে নাক নামাল পোলার সেন্টিনেল, ডাইভ দিচ্ছে সাগরের গভীরে।

শঙ্কিত চোখে উপরদিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। বিশাল বরফখণ্ড যেন ধাওয়া করছে তাঁদেরকে। ওটার বয়ান্সি আর সাবমেরিনের ইমার্জেন্সি ব্যালাস্টের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে এখন। মরিয়া হয়ে ডুব দিচ্ছে জলযানটা, চেষ্টা করছে বরফের পথ থেকে সরে যাওয়ার। ঝুঁকে গেছে সামনের দিকে। আলগা জিনিসপত্র ছিটকে গেছে সামনের দিকে, আরোহীরা যে যা পারছে আঁকড়ে ধরেছে ব্যালান্স রক্ষার জন্য।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, কিন্তু তাতে কান দিলেন না গরডন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, মাথায় চিন্তার ঝড়। এখানে কলিশন হবার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। আশপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে সারফেস হবার মত কোনও জায়গা নেই। ছোটখাট আঘাত সহ্য করবার মত করে বানানো হয়েছে সেন্টিনেলকে, কিন্তু সে-সবেরও একটা সীমা আছে।

খুব শীঘ্রি চারপাশের পানি ঘোলা হয়ে এল, তার মাঝ দিয়ে নীচে নেমে চলেছে সাবমেরিন। প্রেশার বেড়ে যেতেই পুরো খোল মৃদু প্রতিবাদ করে উঠল। হঠাৎ সামনে দেখা গেল খোলা জায়গা, প্রবল বেগে সেদিকে ছুটে গেল পোলার সেন্টিনেল, পিছন দিয়ে... মাত্র কয়েক ফুট তফাতে নেমে গেল বরফখণ্ডটা। অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল জলযানটা।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়। ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম আর অক্সিজেন জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এরপর আটকে রাখা দমটা ছাড়লেন গরডন। তুলে নিলেন ইণ্টারকমের রিসিভার।

'দিস ইজ ক্যাপ্টেন। চমৎকার কাজ দেখিয়েছ তোমরা, এক্স.ও.।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' জবাব দিল কমাণ্ডার ফিশার। 'শাটিং দ্য ভালভ। ভেণ্টিং নেগেটিভ।' ধীরে ধীরে সিধে হতে শুরু করল

সাবমেরিন। 'এমনটা যেন আর না করতে হয়, স্যর। কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।'

'ঠিকই বলেছ,' হাসলেন গরডন। 'একটু দূর দিয়ে পুরো এলাকা একবার চক্কর দিয়ে এসো। পাহাড়ের ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, তা বোঝা দরকার। ছবিও তুলতে হবে।'

'আই, আই, স্যর।' ব্রিজ ক্রু-র উদ্দেশে নতুন নির্দেশ জারি করল কমাণ্ডার ফিশার, 'হেলমস্‌ম্যান, লেফট ফুল রাডার। অ্যাহেড স্লো। পাহাড়ের চারপাশে ঘুরিয়ে আনো আমাদেরকে।'

চক্রাকার পথে এগোতে শুরু করল সাবমেরিন।

সাইক্লপসের ভিডিও মনিটরের দিকে এগোলেন গরডন। 'ফ্র্যাকচার জোনের ক্লোজআপ শট দেখানো যাবে?'

'জী, স্যর,' মাথা ঝাঁকাল এক টেকনিশিয়ান।

'দেখান, প্লিজ।'

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল শ্যারন। উত্তেজনায় কাঁপছে মৃদু। ভয়ও পেয়েছে। বলল, 'আমাদের সোনার ওই ধস নামিয়েছে, তাই না, ক্যাপ্টেন? দুঃখিত, আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

'ইটস্‌ ওকে,' তরুণী বিজ্ঞানীর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন গরডন। 'ভুলত্রুটির মধ্য দিয়ে কাজ শেখে মানুষ। তা ছাড়া... শেকডাউন ক্রুজে এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা না দিলে চলবে কেমন করে? ইমার্জেন্সিতে সেন্টিনেলের পারফর্মেন্স তো পরীক্ষা হয়ে গেল!'

আশ্বাসে খুব একটা কাজ হলো না। শ্যারনের মুখ বিষণ্ন রয়ে গেল। অবশ্য ওর চেয়ে ভাল অবস্থায় ক্যাপ্টেন নিজেও নেই। এখনও বুক ধুকপুক করছে তাঁর। মনে পড়ে যাচ্ছে, কী ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিয়েছিল। ওঁরা সবাই মারাও যেতে পারতেন। চিন্তাটা দূর করার জন্য ভিডিও মনিটরের উপর ঝুঁকলেন।

ফ্র্যাকচার জোনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে ওতে।

ভ্রূকুটি করল শ্যারন। নীলচে একটা দাগের মত ফুটে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে। 'এটা আবার কী?' টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরল। 'জুম করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ডায়াল ঘোরাল টেকনিশিয়ান। কয়েক গুণ বড় হয়ে গেল ছবি। যিনন স্পটলাইট ঘোরানো হলো টার্গেটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। চমকে উঠল দর্শকরা।

দাগ নয়। ওটা একটা ফাটল। গুহা বললেও ভুল হবে না। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—গুহায় একটা কালচে আকৃতি দেখা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য-নির্মিত। অভিজ্ঞ চোখে জিনিসটা চিনতে পারছেন গরডন। সাবমেরিন... একটা সাবমেরিনের স্টার্ন সেকশনের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা। বরফে আটকা পড়ে আছে ওটা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দৃশ্যমান অংশটুকু দেখলেন ক্যাপ্টেন। সাবমেরিনটা অনেক পুরনো মডেলের। প্রাচীন।

'কী ওটা?' কয়েক পা এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ড. মিকেলসেন।

'সাবমেরিন,' গরডন বললেন। 'নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের। যদ্দূর বুঝতে পারছি—রাশান আই সিরিজ।'

মুখের পাংশু ভাব অনেকখানিই কেটে গেছে শ্যারনের। উত্তেজিত গলায় বলল, 'একটু আগে আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তা আরও দৃঢ় হচ্ছে এর ফলে।'

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ল গরডনের। 'কী যেন দেখাতে চাইছিলেন। এটাই?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শ্যারন। ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গেল আরেকটা মনিটরের সামনে। কিবোর্ডে কয়েকটা বাটন চাপল, পর্দায় ফুটে

উঠল বরফ-পাহাড়ের একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল ইমেজ। 'ডিপআই সোনারের সাহায্যে পুরো পাহাড়ের ম্যাপিং করছি আমরা। এটা তারই রেকর্ডিং।'

ভুরু কোঁচকালেন গরডন। 'আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য তো চোখে পড়ছে না।'

'একটু অপেক্ষা করুন।' আরও কয়েকটা কি চাপল শ্যারন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা কুয়াশার অবয়ব ধারণ করল বরফ-পাহাড়। সারফেস ভেদ করে ফুটে উঠল ভিতরের দৃশ্য। ধাপে ধাপে অনেকগুলো অলি-গলি আর কামরার মত দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন ক্যাপ্টেন। এলোমেলো নয়... জ্যামিতিক নকশা মেনে তৈরি করা হয়েছে সব। প্রাকৃতিক গুহা বা প্রকোষ্ঠ হতেই পারে না।

'কী এসব?' স্তম্ভিত গলায় জানতে চাইলেন গরডন।

'আমাদের ধারণা,' জবাব দিলেন ডা. মিকেলসেন, 'ওটা একটা পরিত্যক্ত আইস বেইস—পাহাড়ের ভিতরটা খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে।'

'সাবমেরিনের আইডেন্টিফিকেশন যদি ঠিকভাবে করে থাকেন, তা হলে বলব রাশান আইস বেইস,' যোগ করল শ্যারন। 'সাবমেরিনটা একেবারে লোয়ার লেভেল ডকিং করে রাখা হয়েছে।'

'আর এগুলো?' ছবিতে ফুটে থাকা অনেকগুলো বিন্দুর দিকে ইশারা করলেন গরডন।

একটা বিন্দুর উপর জুম করল শ্যারন। আকৃতিটা চিনতে ভুল হলো না।

'ডেডবডি, ক্যাপ্টেন,' বলল ও। 'অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে ওখানে।'

কী যেন নড়ে উঠল স্ক্রিনের কোনায়—আবছা একটা আকৃতি... চোখের পলকে আবার গায়েব হয়ে গেল। উত্তেজিত

ভঙ্গিতে আঙুল তুললেন ক্যাপ্টেন। 'কী নড়ল ওখানে?'

ঝট্ করে টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল শ্যারন। 'টেপটা রিওয়াইণ্ড করো!'

করা হলো। যেখানে নড়াচড়া দেখা গেছে, সেখানটা জুম করল টেকনিশিয়ান। স্লো-মোশনে ছাড়ল আবার টেপটা। এবার সবাই দেখল। আইস বেইসের একেবারে নীচের লেভেলে... অচেনা এক ঘোলা আকৃতি নড়াচড়া করছে। কয়েক ফ্রেম পরেই ওটা হারিয়ে গেল পাহাড়ের গভীরে—সোনারের আওতার বাইরে।

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল শ্যারনের। ফিসফিসিয়ে বলল, 'এ... এ অবিশ্বাস্য! কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে... জ্যান্ত!'

দুই

ব্রুকস্ রেঞ্জ, আলাস্কা।

প্রকৃতি মাতাকে সবসময় সম্মান কোরো... বিশেষ করে সেই মাতার ওজন যদি চারশো পাউণ্ড হয়, আর সে নিজের সন্তানকে রক্ষা করায় ব্যস্ত থাকে!

প্রকাণ্ড গ্রিজলি ভালুকটার পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। কুঁৎকুঁতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মা-ভালুক, নাক কুঁচকে শুঁকছে বাতাসে ভেসে আসা মানুষটার গন্ধ। বাচ্চাটা তার পায়ের কাছে, একটা ব্ল্যাকবেরির ঝোপ তছনছ করছে খাবারের খোঁজে। ব্যর্থ প্রচেষ্টা... এখনও ঝোপে বেরি ফল ধরবার

মৌসুম আসেনি। ওসব নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই বাচ্চাটার, মনোযোগ দিচ্ছে না অচেনা মানুষটার দিকেও। জানে, যতক্ষণ মা আশপাশে আছে, কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না। মাদী গ্রিজলির অমিতশক্তি, ধারালো দাঁত আর চার ইঞ্চি লম্বা নখগুলো যে-কোনও শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

রানার একটা হাত চলে গেছে কোমরে আটকানো পেপার-স্প্রে ক্যানের গায়ে। অন্যহাতে ধরে রেখেছে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের স্লিং। হামলা করিস না, মা-জননী... বিড়বিড় করল ও... আমাকে অপ্রিয় কোনও কাজ করতে বাধ্য করিস না।

কাজ হলো না অনুরোধে। মা-ভালুকের কানদুটো খুলির সঙ্গে সেঁটে যেতে দেখল ও। একটা পা সামনে বাড়িয়ে একটু কুঁজো হলো বিশাল শরীরটা। তেড়ে আসার পূর্ব-প্রস্তুতি। গলা শুকিয়ে এল রানার। ইচ্ছে হলো উল্টো ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দেয়, কিন্তু তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল ও... সাবধানে... যাতে শব্দ না হয়। নইলে রেগে গিয়ে ছুটে আসতে পারে ভালুক। কপাল ভাল, পায়ে স্থানীয় ইনুইট আদিবাসীদের চামড়ার জুতো পরেছে—বন্ধু রিচার্ড ম্যানিটকের দেয়া উপহার। নরম সোলের কারণে শব্দ হচ্ছে না।

সাধারণ পরিস্থিতিতে বুনো ভালুকের মুখোমুখি হলে আওয়াজ করাটাই নিয়ম। চিৎকার-চেঁচামেচি আর ফাঁকা গুলি করে ভড়কে দিতে হয়ে তাকে, ভেঙে দিতে হয় তার আগ্রাসী মনোবল। কিন্তু এখন সে-পদ্ধতি কাজে লাগবে না। সন্তানকে রক্ষা করতে চাইছে মা-ভালুক, আওয়াজ করলে সেটাকে বৈরি আচরণ বলে ধরে নেবে, আগ বাড়িয়ে নিজেই শুরু করবে হামলা। অতএব পিছিয়ে যাওয়াই ভাল।

হিংস্র ভালুক সম্পর্কে সবই জানা আছে রানার, আলাস্কায়

এদের উৎপাত সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখে। প্রতি বছর হাজারখানেক ভালুক হামলার ঘটনা ঘটে এখানে, তাতে প্রচুর মানুষও মারা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে-সব মানুষের লাশও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হাইকিঙে বেরুনোর সময় রাইফেল, বিয়ার-হুইসেল আর পেপার-স্প্রে নিয়েছে ও। তাই বলে ওগুলো ব্যবহারের মত পরিস্থিতি দেখা দেবে, এমনটা ভাবতে পারেনি। অবশ্য বিশাল বুনো আলাস্কার জঙ্গলে এমন অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি অপ্রত্যাশিতও বলা চলে না। বাইরের পৃথিবী যেখানে মানুষের হাতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে, তখন আলাস্কায় আজও রাজত্ব করছে রুক্ষ, নির্মম প্রকৃতি।

পায়ে পায়ে পিছিয়ে চলল রানা, ওর দিকে এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মা-ভালুক। হঠাৎ বেরি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চাটা। খেলা শেষ। কয়েক মুহূর্ত দেখল রানাকে, তারপর হাসিখুশি ভঙ্গিমায় ছুটে এল ওর দিকে। আক্রমণ করবার জন্য নয়, কৌতূহলে। প্রমাদ গুনল রানা, এমন আশঙ্কা করেনি। বাচ্চাটা খেলতে আসছে, কিন্তু মা নির্ঘাত ব্যাপারটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে। তা-ই ঘটল। বড় গ্রিজলির চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। ছুট লাগাল বাচ্চার পিছু পিছু... সন্তান পৌঁছুনোর আগেই বিপজ্জনক মানুষটাকে খতম করে দেবে।

স্থির হয়ে গেল রানা। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বাচ্চাটা সমস্যা নয়, ওটাকে পেপার-স্প্রে ছিটিয়েই ঠেকানো যাবে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক গ্রিজলি ভালুক অন্য চিজ। স্প্রে-তে কাজ হবার প্রশ্নই আসে না। গুলি চালাতে হবে... আর সেটা কলজে বরাবর। তারপরেও অন্তত দশ মিনিট টিকে থাকবে অসামান্য প্রাণশক্তির ভালুক। ততক্ষণ ধারালো নখের আঁচড়ে কিমা বানিয়ে ফেলবে ওকে। কার্যকর পদ্ধতি হলো, পায়ে গুলি করা। মাটিতে আছড়ে পড়বে তখন ভালুক, এগোতে পারবে না। তখন ঝাঁঝরা

করে দিতে হবে ওটাকে। কিন্তু নিরীহ একটা প্রাণীকে হত্যা করতে মনের সায় পাচ্ছে না কিছুতেই। উপায়ও নেই, অগত্যা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে তুলে নিল ও।

বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে ভালুকদুটো, রাইফেল উঁচু করল রানা। আর তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। কালচে একটা দেহ এক লাফে পেরিয়ে গেল ওকে। চার পায়ে ল্যাণ্ড করল কয়েক হাত সামনে। শরীর টান টান করে পিলে কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল আরেক দফা।

যেন ব্রেক কষে থামল দুই ভালুক। চমকে গেছে। সামনে দাঁড়ানো চতুষ্পদ প্রাণীটা একটা কালো কুকুর। পুরোপুরি কুকুরও নয়, কুকুর আর নেকড়ের সংকর। এ-মুহূর্তে নেকড়ে-সুলভ হিংস্রতাই ভর করেছে ওটার উপর। গরগর করছে দুই শত্রুর দিকে তাকিয়ে, খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের লোমগুলো।

ভালুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা করছিল কুকুরটা, কিন্তু চাবুকের মত সপাং করে উঠল রানার কণ্ঠ, 'লোবো! না!!'

থমকে গেল কুকুরটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন... যেন নিশ্চিত হতে চাইছে আদেশটার ব্যাপারে।

'চলে আয়,' বলল রানা। এরপর তাকাল মা-ভালুকের দিকে। সতর্ক ভঙ্গিতে ওদের কর্মকাণ্ড দেখছে প্রাণীটা। মুখে হালকা হাসি ফোটাল রানা, যেন অভয় দিতে চাইছে কোনও মানুষকে। কী বুঝল কে জানে, কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল গ্রিজলিটা। বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল চার হাত-পায়ে। একটু পরেই হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। বিরাট এক ফাঁড়া কেটেছে। কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল লোবোর দিকে, কুকুরটাই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। অথচ ওটাকে ক্যাম্পসাইটে রেখে এসেছিল ও, সঙ্গে আনার প্রয়োজন মনে করেনি। নিশ্চয়ই পিছু নিয়ে চলে এসেছে।

বন্ধুর কুকুর, মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরিচয়, কিন্তু এরই মাঝে প্রাণীটা ভীষণ ভক্ত হয়ে গেছে ওর। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, কুকুরটা ওর নিজেরই বুঝি! এগিয়ে গিয়ে ওটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল রানা। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, লোবো।'

গরগর করল লোবো। বুঝি বলতে চাইছে, 'ডোণ্ট মেনশন!'

কুকুরটাকে নিয়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে নিজের অস্থায়ী ক্যাম্পসাইটের দিকে ফিরে চলল রানা। প্রায় এক মাস হতে চলল আলাস্কায় আছে ও। ইজরায়েলের অ্যাশকেলন বন্দরে মার্ভেল অভ গ্রিস নিয়ে অপারেশন, আর ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলের সঙ্গে সংঘাতের পর কিছুদিনের জন্য সভ্য জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছিল। ঠিক ওই সময়েই আলাস্কা উপকূলে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চলছিল ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি... মানে, নুমার। মিশন শেষে ছুটি পেয়ে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অনুরোধে ওটায় যোগ দেয় রানা। প্রজেক্টের কাজ করতে গিয়েই পরিচয় হয় স্থানীয় এক ইনুইট বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ম্যানিটক আর তাঁর মেয়ে... এলাকার শেরিফ অ্যাবি-র সঙ্গে। অল্প সময়েই বাপ-মেয়ের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, যেন কতকালের পরিচয়। প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে দিনপাঁচেক আগে, কিন্তু নুমার স্টাফদের সঙ্গে ফিরে যায়নি রানা। রিচার্ড আর অ্যাবির অনুরোধে রয়ে গেছে ওদের অতিথি হয়ে। ছুটি শেষ হতে আর সপ্তাখানেক বাকি, এ ক'টা দিন ওদের সঙ্গেই কাটাচ্ছে। প্রজেক্টের কাজ করবার সময় জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখতে পারেনি, এখন সেটাই করে নিচ্ছে।

ক্যাম্পে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ছোট্ট একটা ঝর্ণার পাশে তাঁবু খাটিয়েছে ও, ওখানে পৌঁছুতেই হ্রেষারব করে ওকে অভ্যর্থনা জানাল আধা-অ্যারারিয়ান ঘোড়াটা। লোবোর মত ঘোড়াটাও রানা ধার নিয়েছে রিচার্ড ম্যানিটকের কাছ থেকে।

কাছে গিয়ে ঘোড়াটাকে আদর করল ও। তারপর ঝটপট আগুন জ্বেলে কফি চড়াল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে দু'হাত মেলে ধরল সামনে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত ওর পাশে বসল লোবো। লম্বা জিভ বের করে দিয়েছে।

কফি হয়ে গেলে ধূমায়িত মগে আয়েশ করে চুমুক দিল রানা। চোখ বোলাল আশপাশে। পরিবেশটা সত্যি চমৎকার। শীতঘুম শেষে বসন্ত শুরু হতে চলেছে আর্কটিক ন্যাশনাল পার্কে। গাছপালার মাথা থেকে গলতে শুরু করেছে বরফের মুকুট। সূর্যের কোমল রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ট্যুরিস্ট মৌসুম শুরু হয়নি এখনও। অবশ্য খুব বেশি মানুষ যে এই আট মিলিয়ন একরের বন্যভূমিতে বেড়াতে আসে, তা নয়; তারপরেও আপাতত পুরো এলাকা রানার নিজের... অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছে।

লোবোকে কয়েকটা বিস্কুট খেতে দিল, তারপর উঠে দাঁড়াল রানা। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই, ডিনারের আয়োজন করতে হবে। দিগন্তের কাছে ঢলে পড়েছে আর্কটিকের সূর্য। আকাশে ইতিমধ্যে মেঘ জমেছে, আঁধার নামার আগে তুষারপাত শুরু হবে বোধহয়।

গা থেকে পারকা খুলে ফেলল রানা, রইল শুধু উলের শার্ট আর হেভি ট্রাউজার। তাঁবু থেকে ছোট একটা বাকেট আর কুড়াল নিয়ে চলে গেল ঝর্ণার পারে। পানির স্রোত নেই, ঠাণ্ডায় জমে সব বরফ হয়ে আছে। কুড়াল দিয়ে বরফ ভাঙল ও, সংগ্রহ করল বাকেটে। এই বরফ গলিয়েই পানি তৈরি করবে। তাঁবুর সামনে ফিরে আগুনে চড়িয়ে দিল বাকেটটা। তারপর বেরুল তাজা লাকড়ির খোঁজে। লোবো সঙ্গে এল না, আগুনের পাশে বসে আরাম উপভোগ করছে।

আপনমনে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে জঙ্গলে ঢুকল রানা। মন প্রসন্ন। শুকনো ডালপালা কুড়াতে কুড়াতে নিজেকে মনে হচ্ছে আদিম মানুষ। আধুনিক পৃথিবীর কোনও

যন্ত্রণা যেন নেই... বেঁচে থাকার জন্য শুধু খাদ্য সংগ্রহই যেন একমাত্র কাজ। আহ্, জীবনটা যদি এত সহজ হতো! নিজের অজান্তেই উদাস হয়ে গেল রানা। ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, টুকরো টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

দ্বিধা আর সন্দেহে ভুগতে থাকে রানা। জীবনটাকে কি সে হেলায় নষ্ট করল? মনীষীরা বলে গেছেন, কর্মই জীবন, কর্মেই মুক্তি। কাজ নিয়েই তো আছে ও, নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছে দেশের সেবায়। তবু কেন মনে হয়, আরও অনেক কিছু করার ছিল ওর, আরও অনেক কিছু করতে পারত। আরও কম বয়সে যে-সব স্বপ্ন ছিল সে-সব কবেই হারিয়ে গেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছে দুনিয়ার সবচেয়ে উর্বরা ভূমি রয়েছে বাংলাদেশে, স্বপ্ন দেখত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে খেতে বিপুল ধান ফলাবে, গড়ে তুলবে হাঁস-মুরগীর বিশাল খামার, চাষ করে পুকুর-ডোবাগুলো ভরে তুলবে রূপালি মাছে। বাংলাদেশের কয়েক কোটি সুযোগবঞ্চিত সরল মানুষের বেশিরভাগই জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে। বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে এদের ডাকা হচ্ছে না বলেই আজ শুধু কাগজে মানচিত্র দিয়ে রুগ্ন বাংলাদেশের পরিচয় প্রকাশ করতে হয়। ঘুম ভাঙিয়ে এদেরকে যদি কাজে লাগিয়ে দেয়া যেত, এরাই গড়ে তুলত সম্পদের পাহাড়, এরাই সৃষ্টি করত মহৎ শিল্পকর্ম, অবদান রাখত বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, মানবকল্যাণ আর সভ্যতার বিকাশে দিত নেতৃত্ব। একটা সময়ে রানাও এই স্বপ্ন দেখেছিল। নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু পেরেছে করেছে—যেখানেই দেশের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে সেখানেই দুর্জয় সাহসের সাথে লড়েছে ও। প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে যখনই কোনও ম্যানিয়াক সভ্যতাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা কষেছে, তাকে বিনাশ করার জন্যে ছুটে গেছে রানা। কেউ বলতে পারবে না কাজে ফাঁকি

দিয়েছে ও, কেউ বলতে পারবে না অন্যায় বা অবৈধভাবে নিজের জন্যে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। ওর সম্পর্কে যেটা বলা যায়, বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মচারী সম্পর্কে সেটা বলা গেলে দেশের আজকের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। কী দুর্ভাগ্য, বারবার শুধু বাটপারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ল গোটা দেশ। কতকিছুই না ঘটে গেল চোখের সামনে। গায়ের জোরে বা জনতার ভোটে যেই নেতা বনল, ক্ষমতায় গিয়েই জনতার দিকে বন্দুক তাক করে ধরল সে। সমাজের উঁচু মহলে আনুগত্য কেনাবেচা শুরু হয়ে গেল। চোর আর খুনিকে করা হলো পুরস্কৃত, সৎ, বিদ্বান, চরিত্রবান আর জ্ঞানীকে হতে হলো লাঞ্ছনার শিকার। নানা কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হলো জ্ঞানের বিকাশ, নির্বাসিত হলো চিরন্তন মূল্যবোধ, পরিবেশ পরিস্থিতি ওলট পালট করে দিয়ে যে-যার আখের গোছাবার জন্যে লুটেপুটে খেতে লাগল।

দুঃখ, রাগ, আর প্রচণ্ড ক্ষোভ অনুভব করে, কিন্তু পুরোপুরি হতাশ হতে পারে না ও। চারদিকে এত অব্যবস্থা, অনিয়ম, লোভ, নীচতা আর স্বার্থপরতা দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, এখনও সময় আছে। চেষ্টা করলে এখনও হয়তো অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় দেশটাকে। সত্যিই কি সেটা অসম্ভব?

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল ও। চারপাশে তাকাল। না, উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সবকিছুই আগের মত শান্ত, নীরব। তারপরেও কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় এই অনুভূতি। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় কাটিয়ে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এখন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন, তীক্ষ্ণ। কী করে যেন আগেভাগেই বিপদের আভাস পায়। এখন ঠিক তেমনই আভাস পাচ্ছে মনের গহীন থেকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা কয়েক মুহূর্ত। একটু পরেই কানে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ... বিমানের ইঞ্জিন। আস্তে

আস্তে বাড়ছে আওয়াজটা। মুখ তুলল ও। একটু পরেই পাহাড়সারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক-ইঞ্জিনের সেসনা বিমানটা, মাতালের মত উড়ে গেল উপত্যকার উপর দিয়ে। বিমানটাকে দেখবার আগেই খটকার কারণ বুঝতে পেরেছে রানা। স্বাভাবিক, ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ করছে না ইঞ্জিনটা... কাশছে যক্ষ্মা রোগীর মত। সমস্যা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

দৌড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা। চোখ আঠার মত সেঁটে আছে আকাশের গায়ে। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে সেসনা, উচ্চতা কমছে দ্রুত, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মানসচোখে পাইলটকে দেখতে পেল—বিমানের কন্ট্রোল কলাম নিয়ে যুদ্ধ করছে... নিশ্চয়ই ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ড করবার উপযোগী জায়গা খুঁজছে। সমস্যা হলো, এই এলাকার অধিকাংশ বুশ-প্লেনের মত সেসনাটারও তলায় চাকার বদলে শোভা পাচ্ছে ফ্লোট। মাটি নয়, ল্যাণ্ড করার জন্য চওড়া জলধারা প্রয়োজন আকাশযানটার। কিন্তু তেমন কিছুই নেই আশপাশে। ঝর্ণার বুকে কিছুতেই নামতে পারবে না; নদী প্রয়োজন... কিন্তু এখান থেকে সবচেয়ে কাছের নদীটা অন্তত একশো মাইল দূরে।

এর মানে একটাই—ক্র্যাশ করতে চলেছে বিমানটা। মরিয়ার মত ওটাকে একটু উচ্চতা বাড়াতে দেখল রানা, কোনোমতে পেরিয়ে গেল আরেকটা পাহাড়সারি, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। খানিক পরেই ভেসে এল মাটিতে আছড়ে পড়ার গগনবিদারী আওয়াজ... পরমুহূর্তে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ! পাহাড়সারির ওপাশে পাক খেয়ে উড়তে শুরু করল কালো ধোঁয়া।

'এহ্!' গাল কুঁচকে উঠল রানার। 'আজ আর ডিনার নেই কপালে!'

এক ছুটে ক্যাম্পে ফিরে এল ও। পারকা পরে দ্রুত গুছিয়ে নিল জরুরি সরঞ্জাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপাল স্যাডল।

বিমানের আরোহী কে বা কারা, এ-নিয়ে ভাববার সময় নেই। দ্রুত উদ্ধার করতে হবে তাদেরকে। ভয়াবহ শীতল আবহাওয়ায় আহত মানুষ বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। ফার্স্ট এইড কিটটা স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে লোবোকে শিস দিয়ে ডাকল ও। তারপর একলাফে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। লাগামে ঝাঁকি দিয়ে বাহনকে সবেগে ছোটাল দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে।

তিন

সেভেরোমর্স্‌ক্‌ নেভাল কমপ্লেক্স। মুরমান্‌স্ক, রাশা।

বন্দরের চার নম্বর জেটিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভ্যালেরি নিকোলায়েভ। গায়ে খয়েরি গ্রেটকোট, মাথায় ভারী পশমি টুপি। কাঁধের অ্যাপিউলেটে আর টুপির সামনে দুটো সোনালি তারকা সগর্বে ঘোষণা করছে—তিনি রাশান নৌবাহিনীর একজন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

নিভু নিভু অবস্থায় একটা কিউবান চুরুট ঝুলছে রিয়ার অ্যাডমিরালের ঠোঁটে, টানতে ভুলে গেছেন। মন বিক্ষিপ্ত। তাঁর পিছনে নেভাল কমপ্লেক্সের তারকাঁটার বেড়ায় ঘেরা সীমানা—ওটাই নিকোলায়েভের আবাস এবং রাজ্য। ভিতরে রয়েছে বিশাল শিপইয়ার্ড, ড্রাই ডক, রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি, ওয়েপন ডিপো আর অপারেশন্স বিল্ডিং... সোজা কথায় রাশান নর্দার্ন ফ্লিটের কেন্দ্রবিন্দু। ছোটখাট এক শহরের সমান এই

নেভাল কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে আছে আর্কটিক মহাসাগরের পারে। ওখানে শক্তিশালী জাহাজই শুধু তৈরি হয় না, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়া হয় ইস্পাতকঠিন মানুষও।

রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের ধূসর দু'চোখ আটকে আছে পিয়ারের শেষ প্রান্তে—সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেখানে সাবমেরিন *ড্রাকন*। বার্থ থেকে রওনা দেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, ইতিমধ্যে খুলে নেয়া হয়েছে শোর-সাপ্লাইয়ের কেইবলগুলো, জলযানটা এখন চলছে নিজস্ব জেনারেটরের পাওয়ারে।

একটু পর ভারী ইউনিফর্ম পরা সাবমেরিনের তরুণ ক্যাপ্টেন এগিয়ে এল। স্যালিউট ঠুকে বলল, 'স্যর, আমরা তৈরি। আপনার নির্দেশ পেলেই রওনা হতে পারি।'

মাথা ঝাঁকালেন নিকোলায়েভ। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে বন্দর ছাড়ার আগে একটা ফোন করতে হবে আমাকে। ড্রাকনে সিকিউর ল্যাণ্ডলাইন আছে তো?'

'জী, স্যর। প্লিজ, আসুন।'

রিয়ার অ্যাডমিরালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। তার হাঁটার ভঙ্গিতে আশ্চর্য এক গর্বের ছাপ লক্ষ করলেন নিকোলায়েভ। স্বাভাবিক... বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি, এটাই রুশকিনের প্রথম কমাণ্ড এবং প্রথম মিশন। এই মিশনেই নর্দার্ন ফ্লিটের কমাণ্ডারকে চরম গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেয়েছে। গর্ব অনুভব করাই স্বাভাবিক।

নিজের ওই বয়সটার কথা অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না নিকোলায়েভ। রিটায়ারমেণ্টের আর মাত্র এক বছর বাকি, যৌবনটা ছিল যেন বহুকাল আগেকার কোনও সময়। কতকিছু ঘটে গেল এর মাঝে। চোখের সামনে টুকরো টুকরো

হয়ে যেতে দেখলেন মাতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে, কীভাবে যেন বদলে গেল পরিবেশ-পরিস্থিতি আর চেনাজানা মানুষগুলো! ভাবতেই বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাঁর।

গ্যাংওয়ে অতিক্রম করে সাবমেরিনে চড়লেন দু'জনে, তারপর ল্যাডার বেয়ে উঠে পড়লেন কোনিং টাওয়ারে। উঁচু গলায় রিয়ার অ্যাডমিরালের আগমনী ঘোষণা দিল ক্যাপ্টেন। আনুষ্ঠানিক কায়দায় তাঁকে সম্মান জানাল ডেকে উপস্থিত সবাই। স্মিত হেসে তার জবাব দিলেন নিকোলায়েভ।

'রওনা হবার অনুমতি চাইছি, স্যর,' বলল রুশকিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে চুরুটটা পানিতে ফেলে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল।

আদেশ-নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন। বুলহর্নের মাধ্যমে সেগুলো পিয়ার এবং ডেকের ক্রুদের মধ্যে রিলে করল এক অফিসার। দ্রুত খুলে নেয়া হলো কয়েকটা দড়ি। ক্রেনের সাহায্যে সরিয়ে নেয়া হলো ভারী গ্যাংওয়ে।

শেষ কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে নিকোলায়েভ-সহ খোলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন। পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলল অ্যাডমিরাল'স্ স্টেটরুমের দিকে। গত দু'বছরে কোনও সাবমেরিনে পা রাখেননি রিয়ার অ্যাডমিরাল, তবে জাহাজটার প্রতিটা নাটবল্টু চেনেন তিনি। নিজেও একজন সাবমেরিনার, তৈরি হবার আগে ড্রাকনের সমস্ত ডিজাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, তারপর অনুমোদন দিয়েছেন নির্মাণকাজের। পথ দেখিয়ে না দিলেও কোনও অসুবিধে ছিল না, তারপরেও ক্যাপ্টেনকে তার দায়িত্ব পালন করতে দিলেন তিনি।

প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় সসম্মানে রিয়ার অ্যাডমিরালকে পথ ছেড়ে দিল ব্যস্ত ক্রু-রা। তাদের চোখে ফুটে রয়েছে ভীতি ও সমীহ। শুধু কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব নন নিকোলায়েভ, তাঁর

অবয়বও ভয়-জাগানো। ঋজু দেহ, অ্যাথলিটের মত... আটষট্টি বছর বয়সেও সামান্যতম কুঁজো হননি। চেহারা আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুর ও শীতল। চোখদুটো নিষ্প্রাণ। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া সাদা চুল। আড়ালে-আবডালে লোকজন তাঁর নাম দিয়েছে সাদা ভূত। তাঁর সামনে দাঁড়ালেই ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় সবার।

খানিক পরে স্টেটরুমের দরজায় পৌঁছুলেন নিকোলায়েভ। উল্টো ঘুরে রুশকিন বলল, 'আপনার কথামত কমিউনিকেশন লাইন চালু রাখা হয়েছে। ফোনটা করে নিতে পারেন।'

'আর রিসার্চ ফ্যাসিলিটির ক্রেটগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন নিকোলায়েভ।

'স্টেটরুমের ভিতরেই রাখা হয়েছে, যেমনটা আপনি চেয়েছিলেন,' দরজা মেলে ধরল ক্যাপ্টেন।

ভিতরে উঁকি দিলেন নিকোলায়েভ। তারপর বললেন, 'খুব ভাল।' মাথা থেকে খুলে ফেললেন পশমি টুপি। 'তুমি এবার যেতে পারো, ক্যাপ্টেন।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' স্যালিউট ঠুকে বিদায় নিল রুশকিন।

স্টেটরুমে ঢুকে দরজা আটকে দিলেন নিকোলায়েভ। তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ইতিমধ্যে ক্লজিটে গুছিয়ে রেখেছে স্টুয়ার্ড। খালি ব্যাগগুলো ভাঁজ করে রেখেছে বিছানার গোড়ায়। কামরার একপ্রান্তে সাজিয়ে রাখা হয়েছে টাইটেনিয়ামের তৈরি ছ'টা বাক্স... এগুলোর কথাই ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি। বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। একে একে সবক'টাই পরীক্ষা করলেন আঙুল ঘষে। না, খোলা হয়নি কোনোটাই—ট্যাম্পারিঙের কোনও লক্ষণ নেই।

বাক্সগুলোর সঙ্গে একটা খামও আছে, ওটার উপরে স্টেনসিল করে লেখা একটিমাত্র শব্দ—*গ্রেণ্ডেল*... নরওয়েইজিয়ান পুরাণের সেই দানব, যাকে বধ করেছিল বেউলফ। কিন্তু নামটা আরও

গভীর একটা অর্থ বহন করছে নিকোলায়েভের জন্য।

নিজের অজান্তেই দু'হাত মুঠো হয়ে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেছে। বহু বছর আগে... যখন তিনি নিতান্ত শিশু... তাঁর বাবাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাড়ি থেকে। আর কখনও তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি।

বাক্সগুলোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নিকোলায়েভ... মন্ত্রমুগ্ধের মত। একটু পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরলেন। স্টেটরুমের ভিতরটা সবুজ রঙ করা। সিঙ্গেল বাঙ্ক আছে একটা, সেইসঙ্গে বুকশেলফ, ডেস্ক, ওঅশবেসিন আর একটা ছোট কমিউনিকেশন স্টেশন—ওতে আছে ব্রিজ স্পিকার বক্স, একটা ভিডিও মনিটর আর একটা টেলিফোন।

ফোনের রিসিভার তুললেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটা চাইলেন অপারেটরের কাছে। এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল, কলটা কয়েকটা স্টেশন ঘুরে এনক্রিপ্ট হয়ে পৌঁছুচ্ছে নির্ধারিত লক্ষ্যে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর ভেসে এল পরিচিত গলা।

'লেপার্ড কমাণ্ড।'

'স্ট্যাটাস?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'টার্গেটিকে সফলভাবে এনগেজ করা হয়েছে।'

'কনফার্মেশন?'

'খুব শীঘ্রি পাওয়া যাবে।'

'কী করতে হবে, তা মনে আছে তো? কোনও সার্ভাইভার থাকা চলবে না।'

'জী, অ্যাডমিরাল।'

আর কিছু বললেন না নিকোলায়েভ। ক্র্যাডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। শুরু হলো তা হলে!

চার

পাহাড়ি ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে রানা। অবলা প্রাণীটার জন্য সহজ হচ্ছে না কাজটা। সমুদ্রসমতল থেকে ওপাশের উপত্যকার উচ্চতা এক হাজার ফুট। যত উপরে উঠছে ওরা, ততই পুরু হচ্ছে তুষার; গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ঘনত্বও বাড়ছে। এসব ভেদ করে পাহাড়ি ঢাল বাওয়া যথেষ্ট কঠিন কাজ। লোবোকে অবশ্য স্পর্শ করছে না এসব। দামাল হাওয়ার মত আগে আগে ছুটছে ও। রানাকে বরং কয়েকবার শিস দিয়ে থামাতে হয়েছে ওকে—খুব বেশি এগিয়ে যাচ্ছিল।

রিজলাইনে পৌঁছে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিল ও। চোখ বোলাল সামনের উপত্যকায়। পাতলা হয়ে আসা ধোঁয়ার মেঘ দেখে সহজেই বোঝা গেল ক্র্যাশসাইটটা কোথায়। কিন্তু স্প্রুস আর অল্ডার গাছের ঘন জঙ্গলের কারণে বিধ্বস্ত বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে না। কান পাতল ও। না, কারও কণ্ঠ বা আর্তনাদ ভাসছে না বাতাসে। খারাপ লক্ষণ।

ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে মৃদু খোঁচা দিল রানা, দুলকি চালে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। এবার আর জোরে ছোটা সম্ভব নয়। পা হড়কে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঢালের গোড়ায় পৌঁছে একটা খরস্রোতা ঝর্ণা পাওয়া গেল। ওটার তীর ঘেঁষে এগিয়ে চলল ও। সামনে হালকা কুয়াশার চাদর ঝুলছে।

অস্বস্তিকর নীরবতা সবখানে। তুষারে ঘোড়ার পা ফেলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। এমনকী লোবোও চুপ মেরে গেছে।

একটু পরেই নাক টানতে শুরু করল কুকুরটা, গন্ধ শুঁকছে। কিছুদূর এগোনোর পর রানাও পেল গন্ধটা—পোড়া তেলের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। গাছপালা ভেদ করে গন্ধের উৎসের দিকে এগোল রানা—যতটা সম্ভব সরাসরি পথে। তারপরেও পুরো বিশ মিনিট লেগে গেল। এরপর জঙ্গল থেকে খোলা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা।

আশপাশটা দ্রুত দেখে নিল রানা। সন্দেহ নেই, ফাঁকা দেখে এখানে ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করেছিল পাইলট। তুষারের উপর ফুটে আছে চওড়া এক ট্র্যাক—ল্যাণ্ডিং ফ্লোটগুলোর ঘষা খাবার দাগ। জায়গাটা আরেকটু বড় হলে হয়তো বা সফলও হতে পারত পাইলট। কিন্তু মন্দ কপাল তার, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে সোজা গাছপালার গায়ে আছড়ে পড়েছে বিমান।

ওটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা—সেসনা ওয়ান-এইট-ফাইভ স্কাইওয়্যাগন, দলামোচা হয়ে পড়ে আছে বিশাল কতগুলো স্প্রুস গাছের গোড়ায়। নাকটা প্রথমে গুঁতো খেয়েছে গাছের গায়ে, ডানাগুলোও ভেঙে গেছে কাণ্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে। লেজটা উঠে গেছে অনেকখানি। বিধ্বস্ত ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। ফিউয়েল লাইনে লিক দেখা দিয়েছে নিঃসন্দেহে, তেলের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে যেতে পারে।

বিধ্বস্ত বিমানের দিকে এগোতে এগোতে আকাশ দেখে নিল রানা। কালো মেঘ আরও নীচে নেমে এসেছে। এখুনি বৃষ্টি বা তুষারপাত শুরু হয়ে গেলে মন্দ হয় না। অগ্নিকাণ্ড ঘটবে না তা হলে।

কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কী দেখতে পাবে, জানে। জীবনে বহু মৃত্যু দেখেছে ও, দেখেছে বহু মৃতদেহ। কোনোটাই সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। মৃত্যুর সেই বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করবার আগে শক্ত করে নিচ্ছে মনকে। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস ফেলল ও। তারপর পা বাড়াল সামনে। কেউ বেঁচেও থাকতে পারে ওখানে।

'হ্যালো!' গলা চড়িয়ে ডাকল ও। 'কেউ আছেন ওখানে?'

জবাব পাওয়া গেল না। পাবে বলে আশাও করেনি।

ভাঙা ডানার তলা দিয়ে কুঁজো হয়ে এগোল রানা। ফিউজেলাজ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, দরজা-জানালার সমস্ত কাঁচ ভেঙে চুরমার। ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরুনো ধোঁয়া নাকে-মুখে ঝাপটা মারল। কাশতে শুরু করল ও, চোখও জ্বলছে। থামল না তারপরও, এগিয়ে গেল ফিউজেলাজের দিকে।

দরজা খোলার চেষ্টা করল রানা। লাভ হলো না, বেঁকেচুরে ফ্রেমের গায়ে আটকে গেছে পাল্লা। ভাঙা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ও। সিটের উপরে এলিয়ে পড়ে আছে পাইলট, বেল্ট বাঁধা থাকায় ছিটকে যায়নি। তবে বেকায়দা ভঙ্গিতে হেলে থাকা মাথা দেখেই বোঝা গেল, ঘাড় মটকে গেছে। একটু সরল রানা, এবার উঁকি দিল ব্যাকসিটে। আছে... আরেকজন যাত্রী আছে ওখানে। কাত হয়ে পড়ে আছে শ্বেতাঙ্গ এক যুবক, নড়ছে না।

ভালমত দেখার জন্য জানালার ফোকর দিয়ে মাথা ঢোকাল রানা, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার দেহে। ঝট্ করে মাথা তুলল সে, উঠে এল হাত, দুহাতের মুঠোয় স্থিরভাবে ধরে রেখেছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

'খবরদার! নড়বে না!!' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

চমকে গেল রানা। জানালার ফ্রেমে ঠুকে গেল মাথা। 'উফ্!' ককিয়ে উঠল ও।

'নড়তে মানা করেছি তোমাকে!' আবার চেঁচাল লোকটা। 'আমি সিরিয়াস!' উঠে বসল সিটে। এবার ভালমত দৃষ্টিগোচর হলো চেহারা। নিখুঁত শেভ করা সুদর্শন একটা মুখ, দৃষ্টিতে বন্যতা। সম্ভবত অ্যাকসিডেন্টের ফলেই। মাথার সোনালি চুলের একটা পাশ রক্তে ভেজা... লেপ্টে আছে কপালে। জানালায় বাড়ি খেয়েছিল নিশ্চয়ই। বয়স বেশি না, রানার চেয়ে বড়জোর দু'এক বছরের বড় হতে পারে। 'আমি কিন্তু গুলি করব!' হুমকি দিল সে।

নির্বিকার রইল রানা। সাবধানে জানালা থেকে বের করে আনল মাথা। শীতল গলায় বলল, 'তা হলে গুলিই করুন। দেখা যাক, আমি ছাড়া আর কে উদ্ধার করে আপনাকে।'

বিমূঢ় হয়ে পড়ল যুবক। অস্ত্রের মুখে কেউ এমন শান্ত থাকতে পারে, তা ভাবতেই পারেনি। এই সুযোগে তাকে ভালমত দেখে নিল রানা। একেবারে নতুন একটা পারকা পরেছে, পায়ের বুটজোড়াও চকচকে; বোঝা যাচ্ছে এই এলাকায় সে নবাগত। তারপরেও যেভাবে স্থিরহাতে অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে, তা প্রশংসার দাবিদার। ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্টের পর এভাবে অস্ত্র ধরা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটুও কাঁপছে না যুবকের হাত।

'আ... আপনি ভয় পাচ্ছেন না কেন?' বলে উঠল যুবক। সম্বোধন পাল্টে গেছে।

'আপনার হাতে ওটা ফ্লেয়ার গান,' হাসল রানা। 'বড়জোর কিছুক্ষণের জন্য চোখ ঝলসে দিতে পারবেন আমার, আর কিছু না। নামাবেন ওটা? তা হলে রেসকিউ মিশনটা শেষ করতে পারি।'

একটু যেন বিব্রত হলো যুবক। 'দুঃখিত,' মিনমিন করে বলল সে। নামিয়ে রাখল ফ্লেয়ার গান।

'দুঃখিত হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন... এ-ধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ভদ্রতা আশা করা যায় না, আমি জানি।'

এবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল যুবকের ঠোঁটে।

'ব্যথা পেয়েছেন কোথাও?' জানতে চাইল রানা।

'মাথায় বাড়ি খেয়েছি। একটা পা-ও আটকা পড়েছে।'

জানালা দিয়ে আবার মাথা গলাল রানা। দুমড়ে-মুচড়ে পিছনে চেপে এসেছে সেসনার ফ্রন্টসিটদুটো। ওগুলোর চাপে দুই সিটের মাঝখানে আটকা পড়েছে যুবকের ডান পা। মুক্ত থাকলে জানালা দিয়ে বের করে আনা যেত তাকে, কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়।

'পাইলট...' বিড়বিড় করল যুবক, 'ও কি...'

'সরি, ওর ব্যাপারে কিছু করার নেই আমাদের। ক্র্যাশের সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছে বেচারা।'

দরজা ধরে টানাটানি শুরু করল রানা। কিন্তু একচুল নড়াতে পারল না পাল্লা। ঠোঁট কামড়ে ভাবল একটু। যুবককে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি এখুনি।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ও। লাগাম ধরে ওটাকে নিয়ে এল বিমানের কাছে। হ্রেষারব করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল আধা-অ্যারাবিয়ান। পোড়া গন্ধে অস্থির হয়ে উঠেছে প্রাণীটা। ঘাড়ে চাপড় দিয়ে ওটাকে শান্ত করল রানা, বাধ্য করল ধ্বংসস্তূপের কাছে আসতে। স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ির গোছা বের করল এরপর, একপ্রান্তে বাঁধল পমেলে, অন্যপ্রান্তটা নিয়ে ফিরে এল দরজার কাছে। ভাল করে বাঁধল হাতলের সাথে। বাঁধা শেষ হলে ঘোড়াটার পাছায় থাপ্পড় দিল ও।

চেঁচিয়ে উঠল আধা-অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। চেষ্টা করল ছুট লাগাতে। রাইফেলের একটা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ওটাকে আরও ভড়কে দিল রানা। পাগলের মত সামনে এগোল শক্তিশালী ঘোড়া,

ওটার টানে মড়মড় করে উঠল বিমানের দরজা, যেন একটা সোডা ক্যানের সিল ভাঙা হচ্ছে। বেশিক্ষণ আটকে থাকতে পারল না, হঠাৎ ভোঁতা শব্দ করে খুলে এল ফ্রেম থেকে। ভাঙা পাল্লা নিয়ে বেশ কিছুদূর চলে গেল ঘোড়াটা, তারপর থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে।

'দারুণ দেখিয়েছিস!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'আজ বাড়তি দানা পাবি, প্রমিজ।'

কী বুঝল কে জানে, চিঁ হিঁ হিঁ করে উঠল ঘোড়া। পায়ে পায়ে ফিরে আসতে শুরু করল। বিমানের কাছে ফিরে এল রানা। ভাঙা দরজা গলে ঢুকে পড়ল ফিউজেলাজে। ফ্রন্টসিটের পিছনে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলতে শুরু করল সর্বশক্তিতে। চাপ একটু কমতেই ডান পা তুলে নিল যুবক। মুক্ত এখন সে।

'কী অবস্থা পায়ের?' জানতে চাইল রানা।

'ব্যথা করছে খুব,' যুবক জানাল। 'হাড় ভেঙেছে কি না বুঝতে পারছি না।'

'দাঁড়ান, দেখছি আমি।' প্যান্টের পা গুটিয়ে আঘাত পরীক্ষা করল রানা। 'নাহ্, সিরিয়াস কিছু না। কালসিটে পড়েছে, তবে সেরে যাবে খুব শীঘ্রি। হাড় ভাঙেনি।'

'থ্যাঙ্ক গড!'

'আসুন। নামতে হবে আমাদেরকে। প্লেনে আগুন ধরে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।'

ধরাধরি করে লোকটাকে নামিয়ে আনল রানা। ধ্বংসস্তূপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসাল। 'এবার আপনি নিরাপদ,' বলল ও।

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যুবক। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আপনার পরিচয় তো জানা হলো না।'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' রানা বলল। 'শৌখিন

এক্সপ্লোরার।'

'গ্যারি ম্যাসন,' হাত বাড়িয়ে দিল যুবক।

বিমানের ধ্বংসস্তূপের দিকে ইশারা করল রানা। 'কী ঘটেছিল?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল ম্যাসন। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আ... আমি জানি না। ডেডহর্সে যাচ্ছিলাম আমরা...'

'প্রুডো-র ডেডহর্স?'

'প্রুডো বে... হ্যাঁ,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বোলাল ম্যাসন। জায়গাটা চেনে রানা। আলাস্কার একেবারে উত্তরে, ছোট্ট এক শহর প্রুডো বে, এয়ারপোর্টের নাম ডেডহর্স। নর্থ স্লোপের অয়েলফিল্ডগুলো ওখানেই মিশেছে আর্কটিক সাগরে। 'ফেয়ারব্যাঙ্কস্ থেকে রওনা হবার দু'ঘণ্টা পরে পাইলট জানাল, ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিয়েছে। ফিউয়েল নাকি ফুরিয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার সেটা, কারণ ফেয়ারব্যাঙ্কসে ফিউয়েলিং করেই রওনা হয়েছিলাম আমরা।'

কোনও ধরনের লিক দেখা দিয়েছিল, আন্দাজ করল রানা। বাতাসে এখনও ভাসছে তেলের গন্ধ। না, শুধু ধ্বংসস্তূপ থেকে আসছে না ওই গন্ধ। ল্যাণ্ড করার আগ থেকেই তেল ঝরছিল পুরো উপত্যকার উপরে। অস্বাভাবিক, এমন একটা লিক নিয়ে ফ্লাই করার কথা নয় কোনও পাইলটের। ফিউয়েলিঙের সময়ই সব চেক করে নেয়ার কথা।

'ইঞ্জিন কাশতে শুরু করায় ল্যাণ্ড করবার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। কিন্তু কপাল খারাপ, ততক্ষণে এসে পড়েছি পার্বত্য এলাকায়। আশপাশে ল্যাণ্ড করার মত কোনও জায়গা নেই। পাইলট... ও চেষ্টা করল রেডিওতে সাহায্য চাইতে। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারল না কারও সঙ্গে...'

রেডিও ম্যালফাংশনের কথা শুনে অবাক হলো না রানা। গত

এক সপ্তাহ থেকে সোলার ফ্লেয়ারের কারণে পুরো আলাস্কাতেই বেতার যোগাযোগ বিপর্যস্ত। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বোধহয় একেই বলে।

ঘন ঘন কয়েকটা ঢোক গিলল ম্যাসন। তারপর বলল, 'বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পেয়ে এখানেই ল্যাণ্ড করতে চেয়েছে পাইলট। কিন্তু... তার ফলাফল তো নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছেন...'

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। বলল, 'যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না। অত্যন্ত ভাগ্যবান আপনি। দাঁড়ান, মাথার ক্ষতটার একটা গতি করি, তারপর আপনাকে নিয়ে যাব কোনও হাসপাতালে।'

স্যাডলব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এল ও। পার-অক্সাইডে তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে শুরু করল ম্যাসনের মাথার ক্ষত। কাজ করতে করতে অচেনা মানুষটাকে আরেকদফা দেখল ও। চেহারাসুরতে অয়েল রিগার বলে মনে হচ্ছে না। ওরা অনেক রুক্ষ হয়। 'গ্যারি, প্রুডো-তে কেন যাচ্ছিলেন আপনি?'

'প্রুডো না, আসলে আমি যাচ্ছিলাম আরেক জায়গায়। ডেডহর্সে নেমে স্রেফ রিফিউয়েলিং করবার কথা ছিল।'

'তা হলে যাচ্ছিলেন কোথায়?'

'আইস ক্যাপের একটা রিসার্চ বেইসে। ওটার নাম ওমেগা ড্রিফট স্টেশন। সাইসেক্স রিসার্চ গ্রুপের অংশ বেইসটা।'

'সাইসেক্স?' ক্ষততে অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ঘষতে ঘষতে ভুরু কোঁচকাল রানা।

'সায়েন্টিফিক আইস এক্সপিডিশন্স,' ব্যাখ্যা করল ম্যাসন। 'পাঁচ বছরের একটা প্রজেক্ট ওটা। মার্কিন নৌবাহিনী আর সিভিলিয়ান বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগ।'

'মনে পড়েছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুনেছি আমি ওই প্রজেক্টের কথা।' গ্রুপটা মার্কিন সাবমেরিনের সাহায্যে বিশাল আর্কটিক এলাকার ডেটা সংগ্রহ করে। এমন সব জায়গায় যায়, যেখানে স্বাভাবিকভাবে কোনও বিজ্ঞানীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, প্রজেক্টটা বেশ ক'বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল ম্যাসন। সাইসেক্স প্রজেক্ট কবে শেষ হয়েছে না হয়েছে, তা সামান্য এক এক্সপ্লোরার জানল কেমন করে?

'দুঃখিত, আপনাকে বলা হয়নি, আমি নুমার সঙ্গেও জড়িত। অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর।' রানা হাসল। 'ওখানেই শুনেছি সাইসেক্স প্রজেক্ট সম্পর্কে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'আপনার কথাই ঠিক। অফিশিয়ালি সাইসেক্স প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে বটে, তবে একটা স্টেশন... মানে ওমেগার কথা বলছি... ড্রিফট করে চলে গেছে যি.সি.আই.-তে। গবেষণার জন্য চমৎকার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে...'

যি.সি.আই. মানে জোন অভ কম্প্যারেটিভ ইন-অ্যাক্সেসিবিলিটি। পোলার আইস ক্যাপের সবচেয়ে দুর্গম এলাকা। স্বাভাবিকভাবে ওখানে কোনও আইস স্টেশন তৈরি করা প্রায় অসম্ভব কাজ। ভাসমান বরফে চেপে একটা স্টেশন যদি ওখানে পৌঁছে গিয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে মস্তবড় একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে গবেষণা চালাবার জন্যে।

'দুর্গম ওই জায়গার ডেটা কালেকশনের জন্য সাইসেক্সের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বলে চলল ম্যাসন, 'মানে ওই স্টেশনটার জন্য আর কী।'

'আপনি তা হলে সায়েন্টিস্ট?' গজ-তুলো আর অ্যাডহেসিভ

টেপ দিয়ে ক্ষতটা ঢেকে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

একটু হাসল ম্যাসন। 'না, না। বিজ্ঞানী নই আমি। সাংবাদিক... পলিটিকাল রিপোর্টার। *সিয়াটল টাইমস*-এ কাজ করি।'

'পলিটিক্যাল রিপোর্টার?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

সায় দিল ম্যাসন।

'আপনাকে কেন...'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না রানা। বাধা পেল ইঞ্জিনের আওয়াজে। বিমানের ইঞ্জিন। উপর থেকে আসছে শব্দটা। গাছের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ও। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে।

গাছের কাণ্ড ধরে উঠে দাঁড়াল ম্যাসন। 'আরেকটা বিমান!' বলল সে। 'পাইলটের ডিসট্রেস কল হয়তো শুনতে পেয়েছে কেউ।'

এবার মেঘের আড়াল থেকে ছোট একটা বিন্দু উদয় হতে দেখল রানা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, একই সঙ্গে উচ্চতা কমিয়ে নেমে আসছে উপত্যকার দিকে। বোঁ বোঁ করে ওদের উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। মডেলটা চিনতে পারল ও। এটাও সেসনা, তবে ম্যাসনের বিমানের চেয়ে বড়। ২০৬ বা ২০৭ স্কাইওয়্যাগন, আট সিটের।

ঘোড়াটাকে কাছে ডাকল রানা। স্যাডলব্যাগ থেকে বের করল বিনকিউলার। চোখে ঠেকিয়ে তাকাল বিমানটার দিকে। একেবারে নতুন দেখাচ্ছে। আলাস্কায় সচরাচর যে-সব বিমান চলাচল করে, সেগুলো এত ঝকঝকে হয় না।

'দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'পাওয়া উচিত,' বলল রানা, 'আর কিছু না হোক, আপনার বিমানের ধোঁয়া তো দেখবে।'

কথাটা সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্যই যেন কাত হলো সেসনা, বাঁক নিয়ে ফিরতে শুরু করল উপত্যকার দিকে। কেন যেন মন খুঁতখুঁত করে উঠল রানার। গত এক সপ্তাহে একটা বিমানও উড়তে দেখেনি ও এই এলাকায়, অথচ আজ দু'দুটোকে দেখছে! কো-ইনসিডেন্স, নাকি আর কিছু? বিশেষ করে এই দ্বিতীয় বিমানটা বড্ড পরিষ্কার... বড্ড ঝকঝকে। আলাস্কার আকাশে একেবারেই মানাচ্ছে না।

হঠাৎ সেসনার রিয়ার কার্গো ডোর খুলে যেতে দেখল রানা। স্কাইওয়্যাগনের এই মডেলটার বিশেষত্ব ওটা। আলাস্কার মত দুর্গম অঞ্চলের জন্য উপযোগীও বটে। পিছনে কার্গো ডোর থাকায় এই বিমানে স্ট্রেচার-সহ রোগী, এমনকী ছোটখাট মালামালও লোড করা যায়। আরও একটা ব্যবহার আছে... এ-মুহূর্তে সেটাই দেখল ও।

কার্গো ডোরের ফাঁক গলে দু'জন মানুষকে লাফ দিতে দেখা গেল। স্কাই ডাইভার। বিনকিউলারে ওদেরকে ফলো করা কঠিন হলো, খুব দ্রুত নামছে ওরা। অনেকদূর নেমে আসার পর প্যারাশুট খুলল দু'জনে। তাও সাধারণ প্যারাশুট নয়, বিশেষ ধরনের... প্রিসিশান প্যারাশুটিঙে ব্যবহার হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে নামা যায় এই প্যারাশুটের সাহায্যে। নামার অ্যাঙ্গেল দেখে বোঝা গেল, এই দু'জন উপত্যকার খোলা জায়গাটায় নামতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি দুই স্কাই ডাইভারের উপর বিনকিউলার ফোকাস করল রানা। বিমানের মত এরাও দুধসাদা রঙের পোশাক পরেছে। কোনও ইনসিগনিয়া নেই। দু'জনেরই পিঠে ঝুলছে স্ট্র্যাপে বাঁধা রাইফেল।

শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। রাইফেল দেখে নয়... ওর শঙ্কা জাগিয়েছে স্কাই-ডাইভারদের বাহন। দু'জনেই দুটো মোটরসাইকেলে বসে নামছে। সিটের উপর নিজেদের বেঁধে

নিয়েছে তারা। মোটরসাইকেলদুটোর চাকায় লাগানো আছে লোহার স্পাইক। স্নো-চপার বলে ওগুলোকে। বরফে ছাওয়া কঠিন রাস্তায় অনায়াসে ছুটতে পারে... তাড়া করতে পারে যে-কোনও শিকারকে। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, রাইফেল আর মোটরসাইকেল... দুটোই আনছে ওরা নীচের মানুষদু'জনকে শিকার করার জন্য।

থমথমে চেহারা নিয়ে বিনকিউলার নামাল রানা। ম্যাসন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'বিপদ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'আশা করি ঘোড়ায় চড়তে জানেন আপনি?'

পাঁচ

পুরু বরফ মাড়িয়ে, কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের দিকে হাঁটছেন ক্যাপ্টেন গরডন। চারপাশে শিস তুলছে হিমশীতল বাতাস, অবিরাম ঝরছে তুষার। শোঁ শোঁ আওয়াজে কান ঝালাপালা। দুনিয়ার এই প্রান্তে বাতাসও এক জীবন্ত দানব, চরম আক্রোশ নিয়ে হামলা চালায় প্রকৃতি আর মানুষের উপর... কেড়ে নেয় জীবন। প্রাচীন এক ইনুইট প্রবাদ বলে—ঠাণ্ডায় মরে না মানুষ, মরে আসলে হাওয়ায়!

হিমবায়ু ভেদ করে হাঁটতে হাটতে পুরনো সেই প্রবাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন গরডনের। তাঁর পিছনে আবছাভাবে

দেখা যাচ্ছে পোলার সেন্টিনেলকে—বরফের মাঝখানে বিশাল এক হ্রদে ভেসে উঠেছে সাবমেরিনটা। এ-ধরনের হ্রদকে *পলিনিয়া* বলে। হ্রদটার কাছাকাছি তৈরি করা হয়েছে ড্রিফট স্টেশন, সাবমেরিন যাতে ওটার নাগালের মধ্যে ডক করা যায়। হ্রদের কিনারটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু, পানির তলায় রয়েছে আরও চার গুণ অংশ—রীতিমত একটা রিজলাইন বলা চলে। পুরু এই কিনারটাই তীব্র চাপের মুখেও হ্রদটাকে টিকিয়ে রাখছে, বুজে যেতে দিচ্ছে না। এবড়ো-খেবড়ো তীর এড়িয়ে সমতল বরফ রয়েছে সিকি মাইল দূরে, ড্রিফট স্টেশনটা ওখানেই। বিরূপ আবহাওয়ায় দূরত্বটা বড্ড বেশি বলে মনে হচ্ছে প্রৌঢ় ক্যাপ্টেনের কাছে।

নাবিকদের ছোট একটা দল নিয়ে এগোচ্ছেন তিনি। অবকাশ যাপনের জন্য চারভাগ করা হয়েছে সাবমেরিনের ক্রু-দের, প্রথম দলটা যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে নাবিকরা, কিন্তু ক্যাপ্টেন নিশ্চুপ। নেভি ব্লু কালারের পারকা জড়িয়ে দ্রুত পা ফেলছেন তিনি। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছেন উত্তর-পূর্ব দিকে—ওখানেই দু'সপ্তাহ আগে রাশান আইস বেইসটার সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। সোনারে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়ার পর শুরু করা হয়েছিল সারফেস-সার্চ। ব্যবহার করা হয়েছিল নানা ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। শেষ পর্যন্ত ড্রিফট স্টেশনের ত্রিশ মাইল উত্তর-পুবে বেইসটার প্রবেশপথ আবিষ্কার করেন তাঁরা।

একটু কেঁপে উঠলেন গরডন। তবে ঠাণ্ডায় নয়। মানসচোখে ভেসে উঠেছে আইস বেইসের ভিতরে দেখা মৃতদেহগুলোর ছবি। বীভৎস দৃশ্য! ওগুলো তুলে আনতে অনেক সময় লেগেছে। বত্রিশজন পুরুষ, আর বারোজন নারীর লাশ ছিল ওখানে। কেউ কেউ ক্ষুৎপিপাসায় মরেছে, কেউ বা মরেছে নৃশংসভাবে... রহস্যজনক অবস্থায়। এখন পর্যন্ত মানুষগুলোর মৃত্যু-রহস্যের

কিনারা করা যায়নি।

জোর করে ভাবনাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে সামনে নজর দিলেন ক্যাপ্টেন। ড্রিফট স্টেশনটাকে দেখতে পাচ্ছেন এখন। বৃত্তাকার একটা ফরমেশনে মোট পনেরোটা লাল রঙের জেমসওয়ে হাট। সবগুলো হাট থেকে বাষ্প আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কুয়াশার মত ভাসছে বেইসের উপরে। ভিতরে চলতে থাকা শক্তিশালী জেনারেটরের আওয়াজে কাঁপছে সেই কুয়াশা। মৃদু গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে ডিজেল আর কেরোসিনের। মাঝখানের আঙিনার মত জায়গাটায় রয়েছে লম্বা এক পোল, তার ডগায় জমে বরফ হয়ে আছে আমেরিকান পতাকা।

সেমি-পার্মানেণ্ট এই সেটেলমেণ্টের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পার্ক করা হয়েছে বেশ ক'টা *স্কি-ডু* আর *স্নো-ক্যাট।* বাহনগুলো মুহূর্তের নোটিশে বিজ্ঞানী আর রিসার্চ পার্সোনেলদের যে-কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে তৈরি। বাড়তি বাহন হিসেবে রয়েছে একটা *আইসবোট*—স্টেইনলেস স্টিলের রানার লাগানো এক ধরনের নৌকা... বরফের উপর দিয়ে মানুষ ও মালামাল পরিবহনে অত্যন্ত কার্যকর।

দিগন্তের দিকে এক পলকের জন্য তাকালেন গরডন। অদৃশ্য একটা যানের ধোঁয়া উড়ছে আকাশে—ড্রিফট স্টেশন থেকে আইস বেইসে যাচ্ছে ওটা। বিস্মিত হলেন না, গত দু'সপ্তাহ ধরে সারাদিনই ওখানে আসা-যাওয়া করছে বিজ্ঞানীরা। ড্রিফট স্টেশনের এক-চতুর্থাংশ জনবলকেও শিফট করা হয়েছে আইস বেইসে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্য। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির মানুষ, তাদের আগ্রহের কারণটা বুঝতে পারেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাশান বেইসের সবচেয়ে বড় গোমরটা কখনোই তারা জানতে পারবে না।

প্রবেশপথ খুঁজে পাবার পর সবার আগে বেইসে ঢুকেছিলেন

ক্যাপ্টেন গরডন... ছোট একটা দল নিয়ে। ভিতরে যা আবিষ্কার করেছেন, তা একই সঙ্গে রোমহর্ষক এবং ভয়াবহ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য সঙ্গীদের নির্দেশ দেন তিনি। বেইসের একটা অংশ অফ-লিমিট ঘোষণা করে বসিয়ে দেন সশস্ত্র প্রহরী। কেউ যেন ওখানে ঢুকতে না পারে। সিভিলিয়ান বলতে শুধু একজনই জানে কী লুকানো আছে রাশান বেইসের চার নম্বর লেভেলে। ড. শ্যারন বেকেট—ক্যাপ্টেনের দলটার সঙ্গে সে-ও ঢুকেছিল ওখানে। ওর মত দৃঢ় চরিত্রের মেয়েও কেঁপে উঠেছে ভিতরের দৃশ্য দেখে।

উল্লেখযোগ্য আরেকটা বিষয় হলো, ডিপআই সোনারে যে ঘোলা আকৃতিটা দেখা গিয়েছিল, সেটার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি আইস স্টেশনের ভিতরে। হতে পারে ওটা ছিল সোনার ওয়েভের স্রেফ একটা প্রতিবিম্ব। খাবারের খোঁজে ঘুরতে থাকা মেরু-ভালুক হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না... যদিও বেইসে বুনো প্রাণী ঢোকা বা বেরুবার কোনও রাস্তা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তল্লাশি অবশ্য অব্যাহত আছে। বিশাল একটা ঘাঁটি ওটা—পুরো পাঁচটা লেভেল আছে ওতে। সেইসঙ্গে আছে ঘাঁটির কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক টানেলের জটিল এক নেটওয়ার্ক। দু'সপ্তাহে এতবড় এলাকা কাভার করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। মূল প্রবেশপথ ছাড়াও ওখানে আসা-যাওয়ার আরও পথ থাকতে পারে। ইতিমধ্যে হিট চার্জ এবং সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে বেইসের পাশে একটা কৃত্রিম পলিনিয়া তৈরি করা হয়েছে--পোলার সেন্টিনেল যাতে বেইসটাকে সার্ভিস দিতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন গরডন, রাশান স্টেশনটাকে ধ্বংস করে দেয়া গেলে সবচেয়ে ভাল হতো। ওটাকে টিকিয়ে রেখে কারও কোনও মঙ্গল হবে না, এ-বিষয়ে তিনি ষোলআনা নিশ্চিত।

সমস্যা হলো, ওপরঅলা-রা তা ভাবছেন না। কড়া নির্দেশ দেয়া আছে তাঁর উপরে, যে-কোনও মূল্যে দখলে রাখতে হবে স্টেশনটা। বিজ্ঞানীদের সুযোগ করে দিতে হবে ভিতরে তল্লাশি চালাবার জন্য।

ড্রিফট স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন ক্যাপ্টেন। মৃদু চিৎকার শুনে চোখ তুলে তাকালেন। কালো পারকা পরা একজন মানুষ হাত নাড়ছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। দ্রুত পা চালালেন গরডন। কাছে যেতেই এগিয়ে এল লোকটা। ড. মরিস রেনার্ড—কানাডিয়ান আবহাওয়াবিদ, ওমেগা টিমের সদস্য।

'ক্যাপ্টেন,' হড়বড় করে বলল সে, 'একটা কল আছে আপনার জন্য। তাড়াতাড়ি আসুন।'

'কে...'

'অ্যাডমিরাল বেকেট,' বলল আবহাওয়াবিদ। চকিতে তাকাল আকাশের দিকে। 'ঝড় আসছে। সোলার ফ্লেয়ারের কারণে এমনিতেই সমস্ত সিস্টেম গোলমাল করছে... চলুন, চলুন, হাতে সময় নেই।'

একটু থেমে পিছনে ফিরলেন ক্যাপ্টেন গরডন। সঙ্গে আসা অফিসারকে বললেন, 'সবাইকে ছেড়ে দাও। রাত আটটা পর্যন্ত ঘুরতে পারে ওরা, এরপর পরবর্তী গ্রুপকে রিলিভ করবে।'

ড্রিফট স্টেশনের মেস হল আর রিক্রিয়েশন হাটের দিকে ছুট লাগাল নাবিকরা. ড. রেনার্ডের সঙ্গে স্টেশনের অপারেশনস্ সেন্টারের দিকে এগোলেন গরডন।

'আপনাকে খবর দেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন ড. বেকেট,' রেনার্ড জানাল। 'এ-মুহূর্তে উনিই কথা বলছেন অ্যাডমিরালের সঙ্গে। একটু দ্রুত হাঁটুন, প্লিজ। কমিউনিকেশন কতক্ষণ টিকবে, তার কোনও গ্যারাণ্টি নেই।'

অপারেশন্স হাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দু'জনে। ছোট্ট

প্রবেশপথ গলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। সেণ্ট্রাল হিটারের কারণে আরামদায়ক উষ্ণতা বিরাজ করছে, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডার পর উত্তাপটা রীতিমত অত্যাচার মনে হলো ক্যাপ্টেনের কাছে। বুট থেকে তুষার ঝাড়লেন তিনি, হাত থেকে খুললেন গ্লাভস, তারপর চেইন টানলেন পরনের পারকার। দু'হাত একত্র করে ঘষলেন তালুদুটো, হালকা ম্যাসাজ করলেন নাকের দু'পাশেও।

'আমি আসি, ক্যাপ্টেন,' উল্টো ঘুরতে ঘুরতে বলল রেনার্ড। 'কাজ আছে। ন্যাভস্যাট স্টেশন তো চেনেন, সোজা চলে যান ওখানে।'

'ঠিক আছে।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল আবহাওয়াবিদ। গা থেকে পারকা খুললেন গরডন, ঝুলিয়ে রাখলেন দেয়ালের হুকে। তারপর পা বাড়ালেন ন্যাভস্যাট স্টেশনের দিকে। ছোট একটা অ্যান্টিরুম পেরিয়ে একটু পরেই অপারেশন্স সেন্টারের মূল অংশে পৌঁছুলেন তিনি। জায়গাটা ছোট ছোট বেশ কয়েকটা ভেস্টিবিউল আর ল্যাবে ভাগ করা হয়েছে। এখান থেকে পরিচালনা করা হয় ড্রিফট স্টেশনের গবেষণা—মাপা হয় আইস প্যাকের বাৎসরিক ক্ষয়ের পরিমাণ ও মতিগতি। বরফের গভীর থেকে মাইনিঙের মাধ্যমে তুলে আনা স্যাম্পল বিশ্লেষণ করা হয় ল্যাবগুলোতে—সংগ্রহ করা হয় ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন ও জুয়ো-প্ল্যাঙ্কটনের বংশবিস্তার সংক্রান্ত ডেটা। এ-ছাড়াও আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক অন্তত ডজনখানেক গবেষণা চালাচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডের বিজ্ঞানীরা—ওসবও পরিচালনা করা হচ্ছে এখান থেকেই।

ডেস্ক এবং কম্পিউটার মনিটরের উপর ঝুঁকে থাকা পরিচিত মুখগুলোর দিকে ক্ষণে ক্ষণে মাথা ঝোঁকালেন ক্যাপ্টেন, তারপর কয়েকটা এয়ারলক ডোর পেরিয়ে পা রাখলেন অপারেশন্স সেন্টারের পরের অংশে। এটাই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ওমেগার

যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু—কমিউনিকেশন্স সেন্টার। দেয়ালগুলোয় রয়েছে বাড়তি ইনসুলেশন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বসানো হয়েছে দুটো ব্যাকআপ জেনারেটর। পুরো কামরা জুড়ে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভিএলএফ ও ইউএলএফ রেডিও সেট। এ-ছাড়া আছে ন্যাভস্যাট—মিলিটারি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম।

চারপাশে দ্রুত চোখ বোলালেন গরডন, শ্যারন ছাড়া আর কেউ নেই কমিউনিকেশন্স সেন্টারে। ওর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। গায়ে ছায়া পড়তে চোখ তুলে তাকাল তরুণী বিজ্ঞানী, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিতার সঙ্গে আলাপচারিতায়। একটা *টিটিওয়াই...* মানে *টেক্সট-টেলিফোন* ইউনিটের মাধ্যমে কথা বলছে ও। হাতের সামনে রয়েছে একটা পোর্টেবল কিবোর্ড, মুখের সামনে মাইক্রোফোন, সামনে এলসিডি মনিটর। নিজের বক্তব্য টাইপ করে পাঠানো যায় যন্ত্রটাতে, কিংবা মাইক্রোফোনে বললেও সেটা লিখিত অক্ষরে ভেসে ওঠে মনিটরে। একই পদ্ধতি অন্যপ্রান্তের জন্যও প্রযোজ্য।

'আমি জানি, বাবা,' বলল শ্যারন, 'তুমি চাওনি আমি এখানে আসি...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, বাধা পেল অ্যাডমিরালের তরফ থেকে। স্পিকারে ভেসে এল তাঁর গলা, কিন্তু সেটা শোনা সম্ভব নয় বধির বিজ্ঞানীর পক্ষে। তাই মনিটরের উপর ঝুঁকল লেখাটা পড়তে। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন গরডন। পিতা-কন্যার ঝগড়ায় নাক গলানোর কোনও মানে হয় না। এই গোলমালের কথা এমনিতেই জানা আছে তাঁর। অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট চাননি তাঁর মেয়ে এই ড্রিফট স্টেশনের দায়িত্ব নিক, কিন্তু বরাবরের মত তাঁর ইচ্ছের অবাধ্য হয়েছে শ্যারন। কানের সমস্যার কারণে সবসময়ই ওকে দুর্বল

ভাবেন অ্যাডমিরাল, আগলে রাখতে চান... এটা ওর অত্যন্ত অপছন্দের। সারাজীবন তাই ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের।

শ্যারনের চেহারায় ক্লান্তি লক্ষ করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। চোখের নীচে কালি, বয়সও যেন কয়েক বছর বেড়ে গেছে গত দু'সপ্তাহে। স্নায়বিক চাপ... আর কিছু না। মেজাজও একটু খিটমিটে হয়ে উঠেছে।

'...এসব নিয়ে পরে কথা বলব, বাবা,' মাইক্রোফোনে রূঢ় গলায় বলল শ্যারন। 'ক্যাপ্টেন গরডন এসেছেন।'

অ্যাডমিরালের জবাবটা পড়ে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। 'বেশ, যা খুশি করো!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, মাথা থেকে হেডসেট খুলে বাড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'এই নিন, আপনার বস্ কথা বলবে!'

হাত কাঁপছে ওর। রাগে, হতাশায়... নাকি দুটোই? মাইক্রোফোনের উপর হাত রাখলেন গরডন, ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এখনও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন?'

'সন্দেহ আছে?' বাঁকা সুরে বলল শ্যারন।

একটু হাসলেন গরডন। 'ওঁর দিকটাও তো বুঝতে হবে আপনাকে। চারদিকে খেয়াল রেখে পা ফেলতে হয় অ্যাডমিরালকে। এমন একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার ফাঁস করার আগে অনেককিছু সামলে নেয়া দরকার।'

'আমি বুঝতে পারছি না এ-সব নিয়ে এত ঢাক গুড় গুড় করবার দরকার কী! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে ঘটেছে সবকিছু। এরপরে অনেক বদলে গেছে পৃথিবী।'

'ষাট বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, আর ক'টা দিনে কী এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে, বলুন? আমেরিকা আর রাশার মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক এমনিতেই নাজুক। এখানকার বিচ্ছিরি ঘটনা

বন নোটিশে ফাঁস করে দিয়ে সেটাকে আরও দুর্বল করার কোনও মানে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আপনি ঠিক আমার বাবার মত কথা বলছেন।'

'তা হলে বলব, উনি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না।'

পাল্টা কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না শ্যারন। 'আপনারা সব এক গোয়ালের গরু!' বিরক্ত গলায় বলল ও। তারপর উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে চ ল গেল।

হেডসেট পরে চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন। মাইক্রোফোনে বললেন. 'ক্যাপ্টেন গরডন, স্যর।'

'হ্যালো ক্যাপ্টেন,' ওপাশ থেকে ভেসে এল অ্যাডমিরাল বেকেটের খসখসে কণ্ঠ। সোলার ফ্লেয়ারের কারণে ট্রান্সমিশন অত্যন্ত দুর্বল। 'আশা করি আমার মেয়েকে দেখেশুনে রাখছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই, স্যর। আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'বেশ, তা হলে কাজের কথায় আসি। সংক্ষেপেই জানাচ্ছি ঘটনা। গতকাল রাশান অ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা, তোমার রিপোর্টের একটা কপি তুলে দিয়েছি তাঁর হাতে।'

চমকে উঠলেন গরডন। 'কী! এত তাড়াতাড়ি? আমি তো ভেবেছিলাম...'

'কোনও উপায় ছিল না,' তাঁকে থামিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'আইস স্টেশনটা যে খুঁজে পেয়েছি আমরা... সে-খবর কীভাবে যেন পৌঁছে গেছে মস্কোতে। অস্বীকার করতে গেলে গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে যেতাম।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর। কিন্তু... এখন কী হবে? এখানে আমরা কী করব?'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন অ্যাডমিরাল বেকেট।

তারপর শীতল গলায় বললেন, 'ম্যাথিউ...'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেন গরডনের। ফার্স্ট নেমে ডাকা হচ্ছে তাঁকে, এর অর্থ ঘটনা গুরুতর।

'ম্যাথিউ, তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া দরকার,' বললেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'এ-মুহূর্তে আমি ওয়েস্ট কোস্টে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে, ওয়াশিংটনে জল ঘোলা হলে তা টের পাব না। কিছু একটা ঘটছে ওখানে। আইস স্টেশনের ব্যাপারে মাঝরাতে মিটিং করে বেড়াচ্ছে এনএসএ আর সিআইএ। মিডল ইস্টের একটা কেস থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে নেভাল সেক্রেটারিকে। কেবিনেটের যত সদস্য এদিক-ওদিক ছিল, সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছে ডিসি-তে।'

'কিন্তু কেন?'

'দুঃখিত, সেটা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, তোমার ওই আইস স্টেশন নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটনে। খুব শীঘ্রি এর একটা পরিণতি দেখতে পাব বলে আশঙ্কা করছি। আমার মনে হয় না সেটা ভাল কিছু হবে।'

থমথমে হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন গরডনের চেহারা। 'আমাকে তা হলে কী করতে বলেন?'

'কিছুই না। আসলে... দেবার মত কোনও পরামর্শ নেই আমার কাছে। আপাতত শুধু সতর্ক করে দিলাম। চোখ-কান খোলা রেখো, এ-ই আর কী।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন গরডন। 'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল,' বললেন তিনি। আর তো কিছু বলার নেই।

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন অ্যাডমিরাল বেকেট, 'ছোট্ট একটা সূত্র দিতে পারি তোমাকে। সূত্র না বলে ধাঁধাও বলা চলে। একটা মাত্র শব্দ... জনৈক আণ্ডারসেক্রেটারির এইডের মাধ্যমে কানে এসেছে আমার। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি,

পুরো ঝামেলার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে...'

'কী শব্দ, স্যর?'

'গ্রেণ্ডেল।'

দম আটকে এল ক্যাপ্টেনের।

'কোড নেম জাতীয় কিছু একটা হতে পারে... অথবা জাহাজ-টাহাজের নামও হতে পারে ওটা,' বলে চললেন অ্যাডমিরাল বেকেট। 'তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

ঠোঁট কামড়ালেন ক্যাপ্টেন গরডন। আজই আবিষ্কৃত হয়েছে ওটা। আইস স্টেশনের প্রবেশপথের কাছে লাগানো একটা নামফলক... বরফে ঢাকা পড়ে থাকায় এতদিন ওটা দেখতে পায়নি কেউ। ওমেগার ট্রানস্লেটর আর সেন্টিনেলের লিঙ্গুইস্টিক এক্সপার্ট মিলে রাশান হরফে লেখা ফলকটার মর্মোদ্ধার করেছে। ওটায় লেখা আছে হতভাগ্য ঘাঁটিটার নাম...

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

দুশ্চিন্তা অনুভব করলেন গরডন। যে-নাম আজই তাঁরা জানতে পেরেছেন, সেটা ওয়াশিংটন আরও আগে জানল কী করে? তবে কী...

'ম্যাথিউ! শুনতে পাচ্ছ?'

হেডফোনে অ্যাডমিরাল বেকেটের ডাক শুনে সংবিৎ ফিরল ক্যাপ্টেনের। তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, 'জী, স্যর!'

'চুপ হয়ে গেলে কেন? তুমি জানো গ্রেণ্ডেলের অর্থ?'

'হ্যাঁ, স্যর। আইস স্টেশনটার নাম ওটা... আজই আমরা নামফলক খুঁজে পেয়েছি।'

'গ্রেণ্ডেল? অদ্ভুত নাম... স্বীকার করতেই হবে। যাক গে, যা বলার তা বলে দিয়েছি। সতর্ক থেকো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই রিপোর্ট করবে আমাকে। ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, অ্যাডমিরাল।'

'বেস্ট অভ লাক, ম্যাথিউ।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অ্যাডমিরাল বেকেট।

ছয়

প্রায় খাড়া ঢাল ধরে পদব্রজে এগিয়ে চলেছে রানা, রাশ ধরে পিছু পিছু টেনে আনছে আধা-অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটাকে। ওটার পিঠে বসেছে গ্যারি ম্যাসন। ঘোড়ার পিঠে দু'জনে ওঠার সাহস হয়নি রানার, বরফে ঢাকা ঢালে ঘোড়ার পা হড়কালে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া এখুনি ঘোড়াটাকে ক্লান্ত করতে চাইছে না। কখন প্রাণ হাতে নিয়ে ছুট লাগাতে হয়, কে জানে! লোবো ওর পাশে পাশে হাঁটছে। বুদ্ধিমান কুকুরটা বোধহয় আঁচ করতে পারছে মনিবের মনোভাব, বিপদের আশঙ্কায় দু'কান লেপ্টে আছে খুলির সঙ্গে। মাঝে মাঝেই গরগর করে চাপা ডাক ছাড়ছে, থেমে তাকাচ্ছে পিছনে।

ইতিমধ্যে ছ'টা বেজে গেছে। স্কাই-ডাইভাররা ল্যাণ্ড করেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু ওদের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ধাওয়া যদি শুরুও করে থাকে ওরা, বোঝার উপায় নেই। স্প্রুস আর অ্যাসপেনের ঘন অরণ্য ভেদ করে ওপাশে দৃষ্টি চলে না।

গোধূলির আবছায়া পরিবেশ জেঁকে বসেছে উপত্যকার বুকে, সূর্য হারিয়ে গেছে উঁচু পাহাড়সারির আড়ালে। কালো মেঘের

কারণে তার আভাও ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না ওদের আশপাশে। চোখ পিটপিট করে পিছনে এক দফা নজর বোলাল রানা। প্রকৃতি এখনও আগের মতই নিথর। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ ভর করল মনে—ভুল করছে না তো? হয়তো ওদের ক্ষতি করতে আসেনি স্কাই-ডাইভাররা। পরক্ষণে মত পাল্টাল। না, এতবড় ভুল হবার কথা নয় ওর। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ পর্যন্ত বেঈমানী করেনি ওর সঙ্গে।

ওর দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা লক্ষ করল ম্যাসন। বলল, 'ওরা রেসকিউ পার্টি হতে পারে না? খামোকাই হয়তো পালাচ্ছি আমরা।'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না রানা, তার আগে বিকট এক বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। একযোগে ঘাড় ফেরাল ওরা। বনের মাঝখানে দেখতে পেল আগুনের একটা গোলা।

'মাই গড!' বিড় বিড় করল ম্যাসন। 'বিমানটা...'

'ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ক্... কিন্তু কেন?'

'সম্ভবত এভিডেন্স রাখতে চাইছে না নিজেদের কোনও অপরাধের,' অনুমান করল রানা। 'হয়তো স্যাবোটাজ করেছিল ইঞ্জিনে, তার কোনও চিহ্ন রাখছে না। সাক্ষীদের বেলাতেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করবে।'

'কী!'

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। বিমানের চারপাশে ঘোড়া, কুকুর আর মানুষের পায়ের ছাপ দেখবে লোকগুলো; বুঝে ফেলবে কী ঘটেছে... কোন্‌দিকেই বা এসেছে ওরা। ট্র্যাক লুকানোর কোনও চেষ্টা করেনি ও, সময় বা সুযোগ ছিল না।

মৃদু গুঞ্জনের মত আওয়াজ শুনে আবার পিছনে তাকাল রানা।

হ্যাঁ, এতক্ষণে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে দুই মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গরগর করে উঠল লোবো।

ম্লান আলোয় পরিবেশ-পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। তুষারপাতের খুব বেশি দেরি নেই। ওদের ট্র্যাক ঢাকা পড়ে যাবে তাতে। অন্ধকার নেমে এলেও ওদেরকে ধাওয়া করতে পারবে না শত্রুরা, কিছু দেখতেই পাবে না। তারমানে খুব শীঘ্রি আঘাত হানবে ওরা।

ম্যাসনের চেহারায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কাঁপা গলায় বলল, 'এখন কী করবেন, মি. রানা?'

জবাব না দিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। রাশ টেনে ঘোড়াটাকেও বাধ্য করল দ্রুত পা ফেলতে। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে—যে-ভাবে হোক, প্রতিপক্ষকে দেরি করিয়ে দিতে হবে। অন্তত তুষারপাতের আগ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওদেরকে।

'লুকানোর কোনও জায়গা আছে আশপাশে?' জানতে চাইল ম্যাসন।

'না,' সংক্ষেপে বলল রানা। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। সন্দেহ নেই, বড্ড নাজুক অবস্থায় রয়েছে ওরা। একটা ঘোড়া, অথচ মানুষ দু'জন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে আছে দ্রুতগামী স্নো-চপার। দৌড় লাগিয়ে পিছে ফেলা যাবে না তাদেরকে। অন্য কোনও কৌশল খাটানো প্রয়োজন।

রিজলাইনে পৌঁছুতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা অনুভব করল ওরা। সারা দেহ কেঁপে উঠল ঠকঠক করে। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বইছে বাতাসটা, ওদিকে সম্ভবত তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। একটু আশাবাদী হয়ে উঠল রানা। দ্রুত ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। নিজের ক্যাম্পের দিকে এগোচ্ছে। ওখানে গিয়ে লাভ হবে না, তাই বিকল্প ভাবল। কয়েকটা গুহা দেখেছে হাইকিঙে আসার

সময়, কিন্তু ওগুলো বেশ দূরে। পৌঁছুনো যাবে না। একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে—রুখে দাঁড়াতে হবে।

'একা রাইড করতে পারবেন?' ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'কিন্তু কেন?'

ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল রানা, কাছে গিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে মুক্ত করল রাইফেল, স্যাডলব্যাগ থেকে কার্তুজের একটা বাক্স নিয়ে ভরল পকেটে।

'কী করতে চাইছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'ভয়ের কিছু নেই,' একটু হেসে বলল রানা। 'আপনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব।' কুকুরটার দিকে ফিরল। 'লোবো!'

জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে তাকাল প্রাণীটা।

'ক্যাম্পে চলে যা!' নির্দেশ দিল রানা।

ঘেউ ঘেউ করে সম্মতি জানাল লোবো। ছুটতে শুরু করল ক্যাম্পের উদ্দেশে।

'ওর পিছু পিছু যান, আমার ক্যাম্পে পৌঁছে যাবেন তা হলে,' ম্যাসনকে বলল রানা। 'ঝটপট লুকিয়ে পড়বেন, ঠিক আছে? অস্ত্র যদি চান... লাকড়ির স্তূপের পাশে একটা কুড়াল পাবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ম্যাসন। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল রানা, তারপর উল্টো ঘুরল। পুরনো ট্র্যাকের উপর পা ফেলে এগিয়ে চলল রিজলাইনের দিকে। পঞ্চাশ গজের মত যেতেই বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা কিছু গ্র্যানিট পাথরের সারি দেখতে পেল, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ওগুলোতে। ব্যস, এবার আর পায়ের ছাপ পড়বে না। পাথরে পাথরে পা রেখে একগুচ্ছ স্প্রুস গাছের তলায় পৌঁছুল। ওখানেই ওঁত পাতল শত্রুদের জন্য। লোকদুটো যদি ওদের ট্রেইল ফলো করে আসে, তা হলে ওর সামনে দিয়েই যেতে হবে। আকাশের পটভূমিতে

পরিষ্কার ফুটে উঠবে তাদের দেহ—রাইফেলের সহজ নিশানা।

ছায়ার ভিতরে, দু'হাঁটুর মাঝে রাইফেলটা খাড়া করে রেখে একটা গাছের গায়ে হেলান দিল রানা, দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে রাখল রিজলাইনে। শীতটা উলের কাপড় ভেদ করে ফেলেছে, শীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। দাঁতে ঠোকাঠুকি ঠেকাতে কসরত করতে হলো ওকে। কোমরের কাছে একটা পুরনো ব্যথা খোঁচাতে শুরু করেছে, জোর করে সেটাকে অগ্রাহ্য করল ও। কৌশলটা কতখানি কাজে লাগবে, তা ভাবতে শুরু করল। এই দূরত্বে টার্গেটে গুলি লাগানো কঠিন নয়, কথা হলো দু'জনকেই ঘায়েল করতে পারবে কি না।

ওপাশের উপত্যকা থেকে এখনও ভেসে আসছে ইঞ্জিনের আওয়াজ... ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। খানিক পরে রাইফেলটা উঁচু করল রানা, চামড়ার স্লিং বাম হাতের কবজিতে পেঁচিয়ে নিয়ে ওয়ালনাটের স্টকটা ঠেকাল ডান কাঁধে, ব্যারেল তাক করল রিজলাইনের উপরে। আস্তে... সময় নিয়ে শ্বাস ফেলছে ও। শিথিল করে রাখছে দেহকে। টেনশন করা যাবে না, শুধু টেনশনের কারণেই ভাল ভাল অনেক শুটার লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়। হাঁটুর তলায় একটা স্প্রুসের কাঁটার খোঁচা খেল হঠাৎ, তাও নড়ল না। খোঁচা খাওয়ায় ভালই হয়েছে, আরও সজাগ হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়।

মোটরসাইকেলের আওয়াজ একেবারে কাছে চলে এসেছে। দম আটকাল রানা, সেফটি ক্যাচ অফ করে ট্রিগারের উপর রাখল আঙুল। পরক্ষণেই দৃষ্টিসীমায় বেরিয়ে এল প্রথম বাহনটা। চমকে উঠল ও। ভেবেছিল ধীরে-সুস্থে রিজ পেরুবে শত্রুরা, যথেষ্ট সময় পাবে নিশানা স্থির করার, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ডার্ট বাইক কম্পিটিশনের প্রতিযোগীর মত ফুল স্পিডে ছুটে এসেছে লোকটা, ঢাল পেরিয়ে শূন্যে লাফ দিয়েছে তার মোটর-সাইকেল। দ্রুত

নিশানা অ্যাডজাস্ট করল রানা, টিপে দিল ট্রিগার, টিপ দিয়েই বুঝল, কারেকশনটা ঠিক হয়নি।

ধাতব আওয়াজ শুনল ও, ফুলকি দেখল রাইডারের পিছনে... মোটরসাইকেলের রিয়ার টায়ার-গার্ডে আঘাত হেনেছে বুলেট। ক্ষতি তাতেও অবশ্য একেবারে কম হলো না—শূন্যেই একটা পাক খেল বাহনটা, ধড়াম করে আছড়ে পড়ল পাহাড়ি ঢালে। আরোহী লোকটা ছিটকে গেল একদিকে, তারপর মোটরসাইকেল আর মানুষ... দু'জনেই গড়াতে শুরু করল ঢালু পথে। ঢুকে গেল ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

'ধ্যাত্তেরি!' খেদোক্তি বেরুল রানার মুখ দিয়ে। বোঝার উপায় নেই, প্রথম রাইডার অক্ষত, আহত নাকি নিহত হয়েছে। কিন্তু সে-নিয়ে মাতম করবার সময় নেই। দ্রুত আবার রিজলাইনের দিকে মনোযোগ দিল ও। দ্বিতীয় শত্রু রয়ে গেছে, তাকে ঘায়েল করতেই হবে। খালি কার্তুজটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ভরল রাইফেলে। আফসোস করল, রাইফেলের বদলে একটা এম-সিক্সটিন কারবাইন থাকলে বেশি ভাল হতো!

মাজল ফ্ল্যাশের কারণে চোখ ঝলসে গেছে রানার, রাইফেলের বিকট আওয়াজ তালা লাগিয়ে দিয়েছে কানে। এই দুটোর কুফল কয়েক সেকেণ্ড পরেই টের পেল ও। আচমকা রিজলাইন পেরুল দ্বিতীয় মোটরসাইকেল—প্রথমটার মত এটাও সর্বোচ্চ বেগে ছুটে এসে ঝাঁপ দিয়েছে... কিন্তু একই পথে নয়, বেশ খানিকটা দূর দিয়ে। ব্যাপারটা একেবারেই আশা করেনি রানা, অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

দ্রুত রাইফেল ঘোরাল ও, নিশানা ঠিক করার সময় পেল না, আন্দাজের উপর টিপে দিল ট্রিগার। বিকট আওয়াজ করে আবারও ছুটে গেল ঘাতক বুলেট, কিন্তু এই দফায় কোনও কিছুতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো। রানার চোখের সামনে নিরাপদে ঢালে

নেমে গেল দ্বিতীয় রাইডার, নিপুণ দক্ষতায় মোটরসাইকেলের ব্যালান্স ঠিক রাখল, তারপর তীব্র বেগে হারিয়ে গেল একসারি উঁচু পাথরের আড়ালে।

স্প্রুস গাছের পিছনে চলে এল রানা, ত্রস্ত হাতে নতুন কার্তুজ ভরছে রাইফেলে। লোকগুলোকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে মস্ত ভুল করেছে ও। এরা অ্যামেচার নয়, পুরোদস্তুর ট্রেইণ্ড প্রফেশনাল। অ্যামবুশের ব্যাপারটা আঁচ করেছে আগেই; সেজন্যে দু'জনে আলাদাভাবে, আলাদা জায়গা দিয়ে পেরিয়েছে রিজলাইন... পেরিয়েছে বিপজ্জনক গতিতে। বোকা বানিয়েছে ওকে।

কানে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছাল উড়ল স্প্রুস গাছের। ঝট্ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছাল একটু। রাইফেলের গুলি... যেদিকে প্রথম রাইডারকে পড়তে দেখেছে, সেদিক থেকে এসেছে। তারমানে ব্যাটা মরেনি!

ঝেড়ে দৌড় দেবার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল রানা। পড়ে রইল নিঃসাড়ে। ওকে দেখতে পাচ্ছে না আততায়ী, পেলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত। গুলিটা করা হয়েছে ভয় দেখানোর জন্য। পালাবার চেষ্টা করলেই ওকে বাগে পাবে ওরা।

ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। ফাঁদে পড়ার দশা হয়েছে ওর। বাঁ দিকের ঝোপের ভিতর রয়েছে এক শত্রু, অন্যজন ডানদিকের পাথরসারির আড়ালে। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন এখন আর হাঁক ছাড়ছে না, ধীর লয়ে চলছে। হচ্ছেটা কী? লোকটা কি অপেক্ষা করছে ওখানে? নাকি ইঞ্জিনটা আইডলে রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে? বোঝার উপায় নেই। তবে এটা পরিষ্কার, বুঝতে পারছে রানা, এখানে ঘাপটি মেরে থেকে কোনও লাভ হবে না। বরং আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা। ঢাল ধরে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে নীচে। শব্দ না করে একটা ফাটলের কাছে পৌঁছুল—বরফ

গলে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ওটার; ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পানির ধারা। দ্বিধা না করে নেমে পড়ল ওটায়। জামাকাপড় ভিজে গেল মুহূর্তের মধ্যে, কাপড়ের পরত পেরিয়ে চামড়া আর অস্থিমজ্জায় হামলা চালাল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মনে হলো কেউ ছুরি চালাতে শুরু করেছে সারা দেহে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা সহ্য করার চেষ্টা করল রানা।

নিঃশব্দে পানির মাঝখানে শুয়ে রইল ও কিছুক্ষণ। কান পাতল। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আবছা আওয়াজটা ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। হামলাকারীরা অভিজ্ঞ, নিজেদের অবস্থান ফাঁস করছে না। লোকদুটো মিলিটারির, নাকি ভাড়াটে মার্সেনারি, জানার উপায় নেই। তবে ওদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বিপন্ন রিপোর্টারের জন্য সেটা আপাতত সুখবর। সশস্ত্র একজন প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে ম্যাসনের দিকে যাবে না এরা। আগে এদিককার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নেবে।

ফাটলের মেঝে ধরে নীচের দিকে নামতে থাকল রানা। শরীর প্রায় মিশিয়ে দিয়েছে, বাইরে থেকে যাতে না দেখা যায় ওকে। অন্ধকারে সামনেটা দেখা যায় না, ত্রিশ গজ যেতেই ঘটল বিপত্তি। ওখানে ঝপ করে নেমে গেছে পাহাড়ি ঢাল, প্রায় সাত ফুট উঁচু দেয়ালটা একেবারে খাড়া। জানা ছিল না রানার, দেখতেও পায়নি, ওখানে পৌঁছুতেই তাল হারাল, পিছলে পড়ে গেল নীচে। নিজের অজান্তেই অস্ফুট আওয়াজ বেরুল মুখ দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল।

ঠক্ করে একটা আওয়াজ হলো, রানার রাইফেলটা কেঁপে উঠল ভীষণভাবে, হাত থেকে ছিটকে চলে গেল ওটা। খাড়া দেয়ালের নীচে, বরফগলা পানিতে ভরা ছোট একটা গর্তে ঝপাস করে আছড়ে পড়ল ও।

হাত-পা ছুঁড়ে দ্রুত ভেসে উঠল রানা। চঞ্চল চোখে চারদিকে

তাকাতেই দেখতে পেল নিজের রাইফেলটা। গর্তের কিনারে পড়ে আছে, বুলেটের আঘাতে ভেঙে গেছে কাঠের স্টক। তাড়াতাড়ি পানি থেকে উঠে এল ও, কুড়িয়ে নিল রাইফেলটা। গুলি ছোঁড়া যাবে এখনও, তবে নিশানায় লাগানো যাবে কি না বলা মুশকিল।

ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে, এখন আর হামাগুড়ি দেয়ার কোনও মানে হয় না। রাইফেলটা হাতে নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল, ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। থামল না... ডালপাতা মাড়িয়ে, খানা-খন্দ পেরিয়ে ছুটে চলল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে না, ওদিকে নিঃসন্দেহে ফাঁদ পাতবে শত্রুরা। অচেনা একটা পথে ছুটে চলল ও।

পিছনে একটা চোখ রাখছে রানা, কিন্তু ওকে ধাওয়া করার কোনও লক্ষণ দেখল না। লোকগুলো মানুষ, নাকি ভূত? দেখা না দিয়ে, অথবা কোনও ধরনের শব্দ না করে পিছু পিছু আসছে কীভাবে? তাড়া করেনি, এমনটা হতেই পারে না। ঝুঁকি নিয়ে একবার থামল ও, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল পিছনে। গাছপালার অভাব নেই, সম্ভবত ছায়ার আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে ব্যাটারা।

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের পাথুরে একটা অংশে পৌঁছুল রানা। তুষার ভেদ করে মাথা বের করে রেখেছে নুড়িপাথর আর ছোট-বড় নানা আকারের বোল্ডার। বড় একটা বোল্ডারের পিছনে আশ্রয় নিল ও, ওখান থেকে নজর বোলাল ফেলে আসা পথের উপরে। ইতিমধ্যে রাত নেমে এসেছে, গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যেতে শুরু করেছে চারদিক। ছায়ার মধ্যে মৃদু একটা নড়াচড়া লক্ষ করল। তাড়াতাড়ি রাইফেল তুলল সেদিকে, কিন্তু মুহূর্তে হারিয়ে গেছে শত্রু।

রাইফেলের ব্যারেল নড়াল না রানা, তাক করে রাখল ছায়ার দিকে। স্টকটা ভেঙে যাওয়ায় কাঁধে ঠেকিয়ে স্থির রাখতে পারছে না অস্ত্রটা—গুলি যদি ছোঁড়েও, প্রতিপক্ষের গায়ে লাগানোর

সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবুও হতাশ হলো না। হাজার হোক, অস্ত্র তো আছে একটা হাতে!

ঢালের ওপাশে আচমকা গর্জে উঠল মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। একজন আসছে ওদিক দিয়ে। কান পাতল, শুকনো পাতার খসখসানি শুনে মনে হলো দ্বিতীয়জন বামদিক দিয়ে ঘুরে ওকে ওভারটেক করতে চাইছে। দ্বিমুখী হামলা চালাবার পাঁয়তারা কষছে খুনিরা। বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা। পাথুরে ঢালের এখানে-ওখানে রয়েছে অল্প কিছু গাছ, আর নিচু ঝোপঝাড়। খরস্রোতা একটা ঝর্ণা বইছে ঢালের মাঝখান দিয়ে, সিঁড়ির মত কয়েকটা ধাপ আছে ওটার, ধাপ পেরুনোর সময় জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে পানির ধারা। মিহি জলকণা কুয়াশার মত ভাসছে বাতাসে। এই ঝর্ণাটাই সম্ভবত চলে গেছে ওর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে।

বড় করে একটা শ্বাস নিল রানা, তারপর এক ছুট লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝর্ণায়। পানির গভীরতা বেশি নয়, হাঁটু সমান হবে, কিন্তু স্রোত অত্যন্ত শক্তিশালী। পায়ের তলার পাথরগুলোও পিচ্ছিল। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে কিনারে একটা হাত রেখে ঠেকাল পতন। সাবধানে উল্টো ঘুরল রানা, পানি ভেঙে স্রোতের বিপরীতে... ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই পৌঁছে গেল একটা জলপ্রপাতের কাছে। মোটা পর্দার মত নেমে আসছে পানি, পিছনে খোঁড়ল থাকার কথা। পানি ভেদ করে ওখানে ঢুকে পড়ল ও। গা ঢাকা দিল।

সারা শরীর ভিজে চুপচুপে, ওই অবস্থায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে শুরু করল রানা। হাইপোথারমিয়া ধরল বুঝি! কোনোমতে কিছুটা সামলে নিয়ে রাইফেল উঁচু করল ও, পানির পর্দা ভেদ করে সামান্য বের করে রাখল ব্যারেলটা, লক্ষ্যস্থির করেছে ঝর্ণার কিনারে... যেখান দিয়ে ও পানিতে নেমেছে। দৌড়ানোর সময়

মাটিতে পরিষ্কার পায়ের ছাপ ফেলে এসেছে, সঙ্গে নাইট ভিশন থাকলে ওগুলো খুনিদের চোখে পড়তে বাধ্য।

ওর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো খানিক পরে। বোল্ডারের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ট্র্যাক অনুসরণ করে অতি সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ঝর্ণার দিকে। রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে কাঁধে, হাতে শোভা পাচ্ছে পিস্তল। ভারী পোশাক খুলে ফেলেছে সে, পরনে এখন শুধু ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম আর কালো টুপি—ছায়ায় অদৃশ্য থাকার আদর্শ সাজ।

রাইফেলের ব্যারেল ঘোরাল রানা। ভাঙাচোরা অস্ত্রটা দিয়ে চলন্ত কারও গায়ে গুলি লাগানোর চেষ্টা বৃথা, তাই লক্ষ্যস্থির করল ঝর্ণার পারে, যেখান দিয়ে ও পানিতে নেমেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওখানে পৌঁছুল খুনি। ইতিউতি চাইল ভাটার দিকে, বোধহয় ভাবছে উপরের ফাটলটার মত এখান দিয়েও নীচে নেমেছে শিকার। ভালমত দেখার জন্য একটু উপরে উঠে এল। জলপ্রপাত থেকে এখন বড়জোর ত্রিশ ফুট দূরত্ব তার। এবার তাকে ভালমত দেখতে পাচ্ছে রানা। বেশ লম্বা, অ্যাথলিটের মত ছিপছিপে দেহ।

রাইফেলটা ভাল করে আঁকড়ে ধরল রানা। ট্রিগার টিপতে যাবে, এমন সময় কীভাবে যেন বিপদ আঁচ করল খুনি। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল, দৃষ্টি বিস্ফারিত। নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল রানা। ছোট্ট খোঁড়লের ভিতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, হাতের মুঠোয় ভীষণভাবে কেঁপে উঠল অস্ত্রটা, তবে কাজ করল ঠিকমতই।

হাতুড়ির মত খুনির বুকে আঘাত হানল বুলেট। হাত-পা ছড়িয়ে পিছনদিকে ছিটকে গেল লোকটা, মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। চিৎ হয়ে ঝর্ণার পারে আছড়ে পড়ল সে। বিদ্যুৎ খেলে

গেল রানার শরীরে। খোঁড়ল থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত বেরিয়ে এল, ছুটল শত্রুর দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে চেষ্টা করল খালি কার্তুজটা ফেলে দিতে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। জ্যাম হয়ে গেছে রাইফেল। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও খারাপ অবস্থা অস্ত্রটার। ট্রিগার চাপার সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর যে বিস্ফোরিত হয়নি তা-ই ঢের!

ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পাওয়া গেল না। মাটিতে পড়েই নড়তে শুরু করেছে খুনি। চেষ্টা করছে পিঠে ঝোলানো নিজের রাইফেলটা হাতে পেতে। কয়েক লাফে তার কাছে পৌঁছে গেল রানা, তারপরেও দেরি হয়ে গেল।

খুনির হাতে উঁচু হলো রাইফেল, তাক হলো সোজা ওর বুক বরাবর। একপাশে ঝাঁপ দিল রানা, শূন্য থেকেই মুগুরের মত চালাল নিজের রাইফেলটাকে। দুটো ব্যারেল বাড়ি খেলো, খুনির হাত থেকে ফসকে গেল রাইফেল, কিন্তু তার আগেই আগুন ঝরিয়েছে ওটা। কাঁধের কাছে একটা টান অনুভব করল রানা, চিনচিনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওখান থেকে। হাত থেকে নিজের রাইফেলটাও পড়ে গেল, গুঙিয়ে উঠল ও।

মাটিতে পড়েই একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা। পরক্ষণে বাঘের মত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল খুনি। হুঁক করে একটা শব্দ বেরুল রানার মুখ দিয়ে, শরীরের পুরো ওজন দিয়ে ওর বুকের উপরে পড়েছে লোকটা। ঝটকা দিয়ে তাকে গা থেকে ফেলে দিল ও। পাগলের মত মাটি হাতড়াল খুনি, নিজের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিতে চাইছে। অন্ধের মত লাথি চালাল রানা, তবে কাজ হলো। গোড়ালির আঘাতে রাইফেলটা পিছলে চলে গেল কয়েক হাত, সোজা আছড়ে পড়ল ঝর্ণার পানিতে।

একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দুই প্রতিপক্ষ, মুখোমুখি হলো পরস্পরের। বিস্ময়ের ব্যাপার, অচেনা খুনির বুক থেকে এক

ফোঁটা রক্ত বেরুচ্ছে না! মনেই হচ্ছে না গুলি খেয়েছে। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট... বুঝতে পারল রানা... ব্যাটা বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরেছে পোশাকের তলায়। আবছা আলোয় লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও। ইয়োরোপিয়ান ধাঁচের চেহারা... রাশান? এ-মুহূর্তে তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশে বিকৃত হয়ে আছে চেহারাটা। কেভলার তার জীবন বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু বুলেটের ধাক্কায় নিঃসন্দেহে চিড় ধরেছে পাঁজরের দু'চারটে হাড়ে। ব্যথায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

হঠাৎ নড়ে উঠল লোকটা, হাতে বেরিয়ে এল একটা ধারালো ছুরি। প্রমাদ গুনল রানা, আড়চোখে তাকাল মাটির দিকে, ওর রাইফেলটা কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে, তুলে নেবার উপায় নেই। খালিহাতে এই অভিজ্ঞ খুনিকে মোকাবেলা করতে হবে।

ধীর ভঙ্গিতে এগোল লোকটা, ফণা তোলা সাপের মত এদিক-ওদিক দুলছে শরীরটা, হঠাৎ করে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে। আচমকা রানার পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে। অভিজ্ঞতা, ট্রেইনিং আর নিখুঁত রিফ্লেক্সের কল্যাণে বেঁচে গেল রানা। নীচ থেকে আসতে দেখল ছুরিটাকে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওকে ছুঁতে পারল না ছুরির ফলা, নিষ্ফল আঁচড় কাটল বাতাসে।

হাত ছুঁড়ল রানা, ধরার চেষ্টা করল হাতটাকে, কিন্তু তার আগেই একটা দ্রুতগতি ঘূর্ণির মতো পিছিয়ে গেল খুনি, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আবার এগিয়ে এল ওর দিকে। মুঠো করা হাতে এখনও ধরে আছে ছুরিটা। তৈরি ছিল রানা, বাম হাত তুলে আলতোভাবে ঠেকাল আঘাত, পরমুহূর্তে ছোবল দিয়ে প্রতিপক্ষের কবজিটা শক্ত করে ধরে ফেলল।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করল রানা, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল নীচের দিকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল খুনি, শিরদাঁড়া বাঁকা করে

কুঁজো হয়ে গেল। কবজির নার্ভ-সেন্টারে কায়দামত একটা খোঁচা দিতেই হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। হঠাৎ একটা হাঁটু উঠে এল রানার দুই উরুর সন্ধিস্থলে।

আঘাতটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, শুনতে পেল আহত পশুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল নিজের গলা থেকে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, দু' হাতে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি। দেখল, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেল লোকটার একটা হাত, ছুরিটা খুঁজছে মাটিতে।

সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে প্যাণ্টের সাইড-পকেটে হাত চলে গেল রানার; বের করে আনল ভালুক তাড়ানোর পেপার স্প্রে। ছুরি কুড়িয়ে খুনি ওর দিকে ফিরতেই নির্দ্বিধায় চেপে দিল ভালভের বোতাম। লোকটার মুখের উপর তীব্রবেগে আঘাত করল স্প্রে।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল খুনি। ছুরি ফেলে দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরল মুখ, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক আর মুখের গহ্বরে ঢুকে গেছে ওষুধটা, পুড়িয়ে দিচ্ছে গলা আর শ্বাসনালী।

দু'পা পিছিয়ে গেল রানা। সাধারণ স্প্রে-র চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী ওষুটা। মরিচের গুঁড়ো আর টিয়ার গ্যাসের সংমিশ্রণ—শক্তিশালী গ্রিজলি ভালুককে ঘায়েল করার জন্য তৈরি, মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়। আবছা আলোয় দেখতে পেল, ফোস্কা পড়ে গেছে লোকটার উন্মুক্ত চামড়া আর চোখের পাতায়। ডাঙায় তোলা মাছের মত তড়পাতে শুরু করল। তারই মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে ঝর্ণা লক্ষ্য করে। পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু কয়েক ফুট যেতেই শুরু হলো বমি। আর এগোতে পারল না, হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটির উপর। দেহ কাঁপছে থরথর করে।

শান্ত ভঙ্গিতে মাটি থেকে খুনির ছুরিটা কুড়িয়ে নিল রানা। কুড়িয়ে নিল নিজের রাইফেলটাও। দোটানায় ভুগল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যাবার আগে লোকটার গলা দু'ফাঁক করে দেয়া উচিত, যাতে আর জ্বালাতে না পারে কাউকে। কিন্তু মনের সায় পাচ্ছে না আহত মানুষটাকে খুন করতে। একটু ভেবে ওকে রেহাই দেবে বলে ঠিক করল। এমনিতেও মরবে সম্ভবত লোকটা, বাঁচলেও সেটা হবে বিকলাঙ্গের জীবন। খামোকা ওর রক্তে হাত রাঙানোর কোনও মানে হয় না। অন্তত ওর জন্যে আর থ্রেট নয় এ-লোক। এভাবে ফেলে গেলেই যথেষ্ট শাস্তি হবে।

নিজের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। সিরিয়াস কিছু নয়। কাঁধের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। দূর থেকে মোটরসাইকেলের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল ও। দ্বিতীয় খুনি কি ওর সঙ্গীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে?

তাড়াতাড়ি ঝর্ণার কিনারে গিয়ে পানি হাতড়াল রানা—ভাল রাইফেলটার খোঁজে। কিন্তু পেল না। স্রোতের ধাক্কায় ভাটির দিকে চলে গেছে নিশ্চয়ই। খালি হাতে আরেকজন খুনিকে মোকাবেলার কোনও মানে হয় না। এখুনি কেটে পড়া ভাল। খুব শীঘ্রি পার্টনারকে খুঁজতে চলে আসবে লোকটা। তার আগেই গ্যারি ম্যাসনকে নিয়ে সরে যেতে হবে। মাথার ভিতরে হাজারটা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে, সেগুলোর জবাবও খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণ একজন রিপোর্টারের পিছনে দু'জন প্রফেশনাল খুনিকে কে পাঠাল? কেন পাঠাল? ম্যাসন নিজেই কিছু লুকাচ্ছে না তো?

পাহাড়ি ঢাল ধরে ক্যাম্পের উদ্দেশে ছুটতে শুরু করল রানা। খানিকক্ষণ দৌড়াতেই গরম হয়ে উঠল শরীর। পানি ঝরে গিয়ে ভেজা কাপড়ও হালকা হয়ে গেল। হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকি কমল এর ফলে। ক্যাম্পে গিয়ে শুকনো পোশাক পরে

নিলেই নিশ্চিন্ত।

মাইলখানেক যেতেই শুরু হলো তুষারপাত। হালকা নয়, ভারী! কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারপাশ ঢেকে গেল তুষারের নতুন প্রলেপে, দৃষ্টিসীমাও হয়ে এল সংকুচিত। খুশি হলো রানা, ওর পায়ের ছাপ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পথ হারাবার ভয়ও নেই। উপত্যকার পরিচিত অংশে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, ক্যাম্প পর্যন্ত বাকি পথটুকু চোখ বন্ধ করেও চলে যেতে পারবে।

দশ মিনিটের মধ্যে ঝর্ণার পারে পৌঁছে গেল রানা। পানির কিনার ধরে ক্যাম্পে পৌঁছুতে লাগল আর মাত্র দু'মিনিট। কাছাকাছি যেতেই লোবোর ডাক শুনল। লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানাল কুকুরটা। ওটাকে আদর করে তাঁবুর সামনে গেল রানা। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মি. ম্যাসন!'

ক্যাম্পের পাশের বড় একটা ঝোপ নড়ে উঠল, পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিল সাংবাদিক। রানাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তি ফুটল চেহারায়, বেরিয়ে এল ঝোপের পিছন থেকে। হাত থেকে নামিয়ে রাখল কুঠার।

'আ... আপনি ঠিক আছেন তো?' বলল সে। 'গুলির আওয়াজ শুনেছি আমরা...'

'সামান্য ফায়ারফাইট,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই।'

'তারমানে বিপদ কেটে গেছে?'

ম্যাসনের প্রশ্ন শেষ হতেই দূর থেকে আবছাভাবে ভেসে এল মোটরসাইকেলের আওয়াজ। হাল ছাড়েনি দ্বিতীয় খুনি।

চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠল রানার। বলল, 'না, বিপদ কাটেনি। এখনও আরেকজন রয়ে গেছে উপরে।'

রানার কাঁধে ঝুলতে থাকা ভাঙা রাইফেলের উপর দৃষ্টি আটকে গেল ম্যাসনের। 'আপনার রাইফেলের কী হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, অস্ত্রটা ফেলে দিল একপাশে। 'ওটার কথা ভুলে যান। অচল হয়ে গেছে।'

'তা হলে কী করব আমরা? আত্মরক্ষা করব কীভাবে?'

'এখান থেকে সরে গিয়ে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

তাঁবুতে ঢুকে পড়ল ও। দ্রুত পোশাক বদলাল। তারপর একটা হ্যাভারস্যাকে ভরতে শুরু করল দরকারি জিনিসপত্র। বাকি সবকিছু এখানেই ফেলে যাবে।

'আর কোনও বন্দুক-পিস্তল আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইল ম্যাসন, পিছু পিছু সে-ও ঢুকেছে তাঁবুতে।

'উঁহুঁ।'

'ঘোড়া নিয়ে পিছে ফেলা যাবে মোটরসাইকেলকে?'

এবারও নেতিবাচক জবাব দিল রানা।

'হায় যিশু!' আঁতকে উঠল ম্যাসন। 'তা হলে কীভাবে...'

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে রানার। ওটা পিঠে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার উপর আস্থা রাখুন। লড়াইয়ে যার পাল্লা ভারী হয়, সে সবসময় জেতে না।'

চেহারা দেখে মনে হলো না ম্যাসন কথাটা বিশ্বাস করেছে।

সাত

প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে স্তেফান মিরিশেঙ্কো। চোখে নাইটভিশন গগলস্ লাগিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে সে, হেডলাইট না জ্বেলেই যাতে স্বচ্ছন্দে এগোতে পারে... আলো দেখে যেন সতর্ক না হতে পারে শিকার। কিন্তু ভারী তুষারপাতের কারণে দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে গেছে তার, দশ ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না, সামনে সারাক্ষণ ঝুলছে যেন সবুজ কুয়াশার পর্দা।

সাবধানে এগোচ্ছে রাশান খুনি। ট্র্যাক অনুসরণ করতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। পরিত্যক্ত ক্যাম্প থেকে দক্ষিণদিকে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ। দু'জন মানুষ, একটা ঘোড়া আর একটা কুকুর—তুষারে ফুটে আছে ওদের পায়ের ছাপ। মানুষদু'জন ঘোড়ার পিঠে চেপেছে, তবে জমিনের অবস্থা খারাপ হলে একজন নেমে যায়, পায়ে হেঁটে পেরোয় জায়গাটা, তারপর আবার ঘোড়ায় ওঠে। এখন পর্যন্ত কোনও সাইড ট্রেইল চোখে পড়েনি, তারমানে একসঙ্গেই আছে লোকদুটো। ভাল, দু'জনকে একসঙ্গেই পেতে চায় সে।

চেহারা থমথমে হয়ে আছে স্তেফানের। এক ঘণ্টা আগে ওর ভাই মিখায়েলের দেহটা খুঁজে পেয়েছে সে—মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা অবস্থায়। এক দেখাতেই যা বোঝার বুঝে গেছে—ওকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। মন শক্ত করে

মিখায়েলকে মুক্তি দিয়েছে সে, গুলি করে খুন করেছে আপন ভাইকে! তারপর ভাইয়ের রক্ত ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে প্রতিশোধের। স্রেফ একটা মিশন নয়, এখন এটা প্রতিজ্ঞাপূরণের অভিযান। অচেনা শত্রুকে হত্যা করবে সে, তার নাক-কান কেটে নিয়ে যাবে ভ্লাদিভস্তকে, পিতার হাতে সমর্পণ করবে সেগুলো মিখায়েলের মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে।

ধাওয়া করার সময় রাইফেলের স্কোপে পলকের জন্য শত্রুর চেহারা দেখেছে স্তেফান। রুক্ষ, তামাটে চামড়ার এক যুবক... আমেরিকান, বা স্থানীয় ইনুইট বলে মনে হয়নি। এখানে কোত্থেকে উদয় হলো কে জানে, কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে লোকটা। অবশ্য মিখায়েল ছিল লেপার্ড অপস্ টিমের নতুন সদস্য, বড় ভাইয়ের চেয়ে দশ বছরের জুনিয়র। স্তেফানের মত অভিজ্ঞ ছিল না ও, আণ্ডার-এস্টিমেট করে বসেছিল অচেনা ওই যুবককে। কিন্তু সেই একই ভুল করবে না স্তেফান। সবদিক গুছিয়ে তবেই চালাবে আক্রমণ, জ্যান্ত আটকাবে শয়তানটাকে। এমন কষ্ট দেবে, যাতে তার চিৎকার সুদূর রাশা থেকেও শুনতে পায় ওর বাবা।

ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে এখন স্তেফান। লক্ষ করল, শিকারের ট্রেইল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষ ট্র্যাকার সে, ট্রেইল বিশ্লেষণ করতে জানে। অনুমান করল, দূরত্ব কমে এসেছে ওদের মধ্যে। বড়জোর একশো মিটার দূরে আছে অশ্বারোহী লোকদুটো।

ঢাল বেয়ে ছোট একটা টিলার উপরে উঠে এল রাশান খুনি। নেমে পড়ল মোটরসাইকেল থেকে। রাইফেল পিঠে ঝোলানোই আছে, বাহনটার পাশে বাঁধা আরেকটা অস্ত্রও তুলে নিল হাতে। মোটরসাইকেলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবার পায়ে হেঁটে ধাওয়া করবে সে। সাইবেরিয়ার উপকূলে বড় হয়েছে স্তেফান; জানে, কোন্ কৌশলে হামলা চালালে বরফে ছাওয়া এই পরিবেশে

ঘায়েল করা যাবে শিকারকে।

সবার আগে ভয় পাওয়াতে হবে ওদেরকে, ছড়িয়ে দিতে হবে তীব্র আতঙ্ক। আতঙ্কিত মানুষ ভুল করতে বাধ্য। নাইটভিশন গগলস খুলে ফেলল সে, ভারী অস্ত্রটা উঁচু করল। স্কোপে চোখ রেখে দেখল দূরত্ব আর এলিভেশন ইণ্ডিকেটর।

সন্তুষ্ট হয়ে ট্রিগার চাপল সে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে গ্যারি ম্যাসন, পিছন থেকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে রানাকে...একটুখানি উত্তাপ পাবার আশায়। খুব একটা কাজ হচ্ছে না তাতে, তবে রানার চওড়া পিঠ তাকে বর্মের মত বাঁচাচ্ছে হিমেল বায়ুপ্রবাহের আক্রমণ থেকে।

'একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না,' হঠাৎ বলল রানা, 'এ-সবের পিছনে কারণটা কী? আপনি যে-কাজে যাচ্ছেন, সেটা ঠেকাতে চাইছে ওরা? নাকি আরও কিছু আছে এর মধ্যে?'

'আ... আমি সত্যিই জানি না,' কাঁপা গলায় বলল ম্যাসন। উলের স্কার্ফে মুখ ঢাকা থাকায় কথাটা অস্পষ্ট শোনাল।

'একটু ভেবে-চিন্তে দেখুন,' রানা বলল। 'হতে পারে আপনার কোনও পুরনো অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে...'

'আমার তা মনে হয় না। খুব সাধারণ একজন রিপোর্টার আমি, ডেস্ক জব করি সিয়াটলে। নির্বাচনের ফলাফল, কিংবা বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক বক্তব্যের উপর বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট তৈরি করাটাই আমার একমাত্র দায়িত্ব। মনে হয় না ওসবের কারণে কেউ খুন করতে চাইবে আমাকে।'

'ডেস্ক রিপোর্টার হলে আপনি ফিল্ডে কী করছেন?' প্রশ্ন করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'সম্পাদক প্রতিশোধ নিচ্ছে। ক'মাস আগে ওঁর ভাইঝির সঙ্গে ডেটিঙে গিয়েছিলাম... বারণ শুনিনি।

তাই বরফের রাজ্যে পাঠিয়ে একটা শিক্ষা দিতে চাইছেন আর কী। পাচ্ছিও... কোনও সন্দেহ নেই!'

'তারপরেও আপনি একজন পলিটিক্যাল রিপোর্টার, বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই! একটা সায়েণ্টিফিক রিসার্চ স্টেশনের খবর কাভার করার জন্য আপনার মত একজন অনভিজ্ঞ লোককে পাঠালেন ভদ্রলোক? প্রতিশোধস্পৃহায়? এতটাই আন-প্রফেশনাল উনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাসন। এই লোক দেখি নাছোড়বান্দা! কী আর করা, ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'এটা আসলে আন-অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট। রিসার্চ স্টেশনের এক মেরিন বায়োলজিস্টের আত্মীয় কাজ করে আমাদের কাগজে। তাকে ওই বায়োলজিস্ট জানিয়েছে, বরফের গভীরে কী নাকি পেয়েছে ওরা। খুবই অদ্ভুত... এবং ইন্টারেস্টিং জিনিস! ডিটেইলস্ দিতে পারেনি, কারণ রিসার্চ স্টেশনে নিয়োজিত নেভির লোকেরা নাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, ইনফরমেশন যাতে লিক না হয়...'

'কিন্তু ওই বায়োলজিস্ট তো ঠিকই লিক করল!'

'হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কতটা অথেনটিক, তা বোঝা যাচ্ছে না। আমাকে পাঠানো হয়েছে প্রাথমিক তদন্তের জন্য। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ নিউজ ক্রু আসবে... তবে সেটা আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে।'

'মনে হচ্ছে সেই রিপোর্টটাই ঠেকাতে চাইছে কেউ,' গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল রানা। তারপর চুপ হয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাসন। যাক, আর আলাপ চালাতে হবে না। ঠাণ্ডায় যখন দাঁতের ঠোকাঠুকি চলছে, তখন কথা চালানো খুব মুশকিল... কষ্ট হয় খুব। চকিতের জন্য পিছনে তাকাল সে, তুষারপাতের কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না মোটরসাইকেলটারও আওয়াজ—হয়তো বা

বাতাসের শনশনানির কারণেই। তবে এ-ও হতে পারে, হাল ছেড়ে দিয়েছে খুনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো দমিয়ে দিয়েছে তাকে। ভাবতে অসুবিধে কী?

রানাও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। রাশ টেনে ঘোড়াকে থামাল ও, রেকাবে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, ঘাড় ফিরিয়ে নজর বোলাল পিছনে। তুষারপাত আর অন্ধকার ভেদ করে কী যেন দেখতে চাইছে।

'কী হয়েছে...' কিছু বলতে যাচ্ছিল ম্যাসন, ঠিক তখুনি বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছে ও দূরে—মাজল ফ্ল্যাশ!

এক ধাক্কায় সাংবাদিককে জিন থেকে ফেলে দিল ও, একই সঙ্গে নিজেও ঝাঁপ দিল মাটিতে। নীচে পড়েই মুখ গুঁজে ফেলল তুষারে, হাত দিয়ে চেপে ধরল সঙ্গীকে।

'মাথা নামান!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

পরমুহূর্তেই ধপ্ করে কী যেন একটা পড়ল ওদের থেকে খানিকটা দূরে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। দেখা গেল চোখ ধাঁধানো আলো, কানে তালা লেগে গেল বিকট আওয়াজে। ছিন্নভিন্ন ঝোপঝাড় আর মাটি ছিটকে গেল আকাশের দিকে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে গর্জন শুরু করল লোবো, ঘোড়াটাও হতভম্ব, হ্রেষারব করে উঠল আতঙ্কে। ছুটে পালাতে চাইছিল, কিন্তু এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ওটার লাগাম ধরে ফেলল রানা। ম্যাসন উঠে বসতে শুরু করেছে, টান দিয়ে তাকে দাঁড় করাল।

'উঠুন... কুইক!' ধমকে উঠল রানা।

'ক্... কী ছিল ওটা?' তোতলাচ্ছে ম্যাসন।

'গ্রেনেড... ব্যাটার কাছে গ্রেনেড লঞ্চার আছে!' এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল রানা। টান দিয়ে তুলে নিল

সাংবাদিককেও। নির্দয়ের মত গোড়ালি দিয়ে খোঁচা দিল বাহনের পিঠে। চিঁ হিঁ হিঁ করে ডাক ছেড়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া। লোবোও ছুটল পাশাপাশি।

মাথা এখনও ঝনঝন করছে ম্যাসনের, কোনোমতে আঁকড়ে ধরল রানাকে। বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল, 'হচ্ছেটা কী?'

'আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে লোকটা,' রানা বলল। 'অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল... ওকে সে-সুযোগ আর দেয়া যাবে না।'

'অতর্কিত হামলা! তা হলে গ্রেনেড ছুঁড়ল কেন?'

'ভয় দেখানোর জন্য। ভেবেছে ভয় পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে যাব আমরা, আশ্রয়ের জন্য দু'জন দু'দিকে ছুটব। একে একে আমাদেরকে ঘায়েল করতে সুবিধে হবে সেক্ষেত্রে।'

'ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!' শুকনো গলায় বলল ম্যাসন। 'আমি সত্যিই ছুট লাগাব ভাবছিলাম।'

রানা কিছু বলল না। ঘন জঙ্গলে পৌঁছে গেছে ওরা। পথটা দুর্গম। ঝোপঝাড় আর গায়ে গা লাগানো গাছপালার মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে পাবার জন্য সামনের দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে ওকে। এগোনোর গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে এল। কিন্তু হাল ছাড়ল না ও, নির্দিষ্ট একটা দিক লক্ষ্য করে এগোচ্ছে।

'বিশেষ কোথাও যাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পুরনো এক বন্ধুর খোঁজে।'

ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে স্তেফান। সর্বাঙ্গ সাদা রঙের পোশাকে ঢাকা—পোলার এরিয়ার আদর্শ ক্যামোফ্লাজ। অবশ্য এ-মুহূর্তে নাইট-ভিশন গগলসের কারণে সবকিছু সবুজ দেখাচ্ছে তার চোখে। একটু থেমে হাঁটু গেড়ে বসল, দেখল ঘোড়ার ট্র্যাক। বাঁয়ে মোড় নিয়েছে শিকার—সম্ভবত গ্রেনেড বিস্ফোরণে ভয়

পেয়েছে, সোজা পথে এগোবার সাহস পায়নি। দু'জন দু'দিকে যায়নি দেখে একটু হতাশ হলো, তবে এটাও একেবারে মন্দ না। অচেনা পথে, ঘন জঙ্গলে ঘুরপাক খাবে শত্রু; আড়াল থেকে কায়দামত হামলা চালালে পালাবার উপায় থাকবে না তাদের।

দিক পাল্টে দ্রুত এবং নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল স্তেফান। মাতৃভূমির পাহাড়ি এলাকায় নেকড়ে শিকারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে কীভাবে শব্দ না করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করা যায়, কীভাবে ন্যাচারাল কাভার ব্যবহার করে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলা যায়। এর সঙ্গে স্পেশাল ফোর্সের ট্রেইনিং মিলিয়ে ভয়ঙ্কর এক খুনিতে পরিণত হয়েছে সে।

গ্রেনেড লঞ্চারটা রেখে এসেছে স্তেফান, ওটার আর দরকার নেই কোনও। সঙ্গে রাইফেল আছে... আর আছে নিজের প্রিয় হান্টিং নাইফ। দুই শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য এগুলোই যথেষ্ট। ছুরিটা নির্দিষ্ট করে রেখেছে ভাইয়ের খুনি বেয়াড়া যুবকটির জন্য। ওর জন্য নিজেকেও কম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না। দেখতে দেখতে জটিল হয়ে উঠেছে সাধারণ একটা অপারেশন। লোকটাকে হাতে পেলে জ্যান্ত তার চামড়া ছাড়াবে বলে পণ করেছে স্তেফান।

পদব্রজে রওনা হবার আগে নিজের কণ্ট্রোলারের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলে এসেছে রাশান খুনি, পরিস্থিতির খবর দিয়েছে। তুষারঝড়ের মধ্যে রি-এনফোর্সমেন্ট পাঠানো সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে তাকে, সে-ও বলেছে তার দরকার নেই। এখন এটা তার একার যুদ্ধ... প্রতিশোধ নেবার যুদ্ধ। আজ রাতের মধ্যেই দুই শিকারকে ঘায়েল করবে সে। আগামীকাল সকালের জন্য ইভ্যাকুয়েশন প্ল্যান ঠিক করে এসেছে।

সাইড ট্রেইল ধরে সতর্কভাবে এগিয়ে চলল স্তেফান। পায়ের ছাপ বলছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে ঘোড়াটা। তারমানে ভালমতই ভয়

দেখানো গেছে শত্রুদেরকে। খুশি হয়ে উঠল সে। সিকি মাইল যেতেই দেখা গেল একটা এবড়ো-খেবড়ো জমি, কয়েক জায়গায় বরফ সরে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে পাথরের গা। ঘোড়াটা নিঃসন্দেহে পিছল খেয়েছে এ-জায়গা পাড়ি দিতে গিয়ে। জখম হলে, বা পা ভাঙলে তো কথাই নেই! আরেকটা সুসংবাদ!

কিছুদূর সামনে যেতেই চোখে পড়ল পায়ের ছাপ। এবড়ো-খেবড়ো ভূমির কারণে একজন আরোহী নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে ঘোড়ার পিঠ থেকে, হেঁটে এগিয়েছে সামনে। ছাপগুলো একেবারে তাজা—বড়জোর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের পুরনো। হাঁটতে হাঁটতে শব্দ করে নাক টানল স্তেফান। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ পাচ্ছে, মনে হচ্ছে বড় কোনও জানোয়ার মরে পচে আছে ধারেকাছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে, জঙ্গলে পশুপাখির মৃত্যু নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা এখন সামনের দুই শিকারকে ঘিরে।

গগলসের লেন্সের পাশের একটা সুইচ টিপল স্তেফান—নাইটভিশন থেকে ইনফ্রারেড মোডে নিয়ে এল ওটাকে। আশা করছে হিট সিগনেচার দেখতে পাবে দুই শত্রুর। সবুজ আভা সরে গিয়ে ঘনঘোর কালোয় নিমজ্জিত হলো চোখের সামনের পৃথিবী। কালো এই পটভূমিতে কমলা এবং হলুদ রঙে ফুটে ওঠার কথা মানুষ বা যে-কোনও প্রাণীর অবয়ব—শরীরের ভিতরের তাপের কারণে। চারদিকে দৃষ্টি বোলাল রাশান খুনি। ভাল আবহাওয়ায় ওর ইনফ্রারেড ভিশনের রেঞ্জ একশো গজ। তুষারপাত এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে রেঞ্জ এখন অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে ধরে নিল। ছোট ছোট কয়েকটা ফুটকি চোখে পড়ল তার, সম্ভবত রেঞ্জের একেবারে শেষ সীমায় রয়েছে তাপের ওই উৎস।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার নাইটভিশনে সুইচ করল স্তেফান। ট্র্যাক

অনুসরণ করবার আর দরকার নেই, যেদিকে হিট সোর্স দেখেছে, সরাসরি সেদিকে এগোল। প্রায় ছুটে চলেছে, শিকারকে আর সময় দিতে চায় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই ভুলটা করল। পথের মাঝখানে টান টান করে বাঁধা ছিল একটা সাদা রঙের সরু সুতো, ওটা দেখতে পেল না সে। পায়ে বেধে যখন টান খেলো ওটা, টের পেল তখন।

বুবি ট্র্যাপ!

ডাইভ দিল স্তেফান, কিন্তু রিফ্লেক্সটা যথেষ্ট দ্রুত হলো না... মাথার উপর থেকে সোজা ওর দিকে নেমে এল একটা প্লাস্টিকের পাত্র, বাড়ি খেয়ে উল্টে গেল, সারা গায়ে ছড়িয়ে দিল ভিতরের তরল পদার্থ। একটা ঝোপের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। মাটিতে মুখ গুঁজে অপেক্ষা করল বিস্ফোরণের... কিংবা ছুটে আসা ছুরি-বর্শার।

কয়েকটা সেকেণ্ড কেটে গেল নিথরভাবে, ঘটল না কিছু। বিস্মিত হয়ে উঠে বসল স্তেফান। আর তখুনি নাকে ভেসে এল বিদঘুটে গন্ধটা। একটু আগে আবছাভাবে পেয়েছিল... এখন ওটা ভীষণ তীব্র। কোত্থেকে আসছে, তা বুঝতেও অসুবিধে হলো না। ওর গায়ে ছড়িয়ে পড়া তরলটা থেকে। আঙুল ছোঁয়াল স্তেফান, গগলস্ খুলে চোখের সামনে আনল হাত।

চটচটে রক্ত লেগে আছে আঙুলে—না, ওর নিজের রক্ত নয়। শুধু রক্তও না ওটা, সঙ্গে পচা-গলা মাংসও মেশানো হয়েছে বোধহয়, উৎকট দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি পাক খেয়ে উঠল তার। কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, কুঁজো হয়ে বমি করে ফেলল। পেট খালি হয়ে যেতেই ভাল বোধ করল, দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করে নিল গন্ধটা।

বোকার দল, মনে মনে ভাবল রাশান খুনি, ভেবেছে এই গন্ধ দিয়ে ঠেকাতে পারবে তাকে? মানব বর্জ্য, পচা আবর্জনা, এমনকী

টিয়ার গ্যাস সহ্য করে যুদ্ধ চালাবার ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে তাকে। আক্রোশ বরং আরও বাড়ল তার। এর ফলাফল হাতেনাতে টের পাবে দুই শত্রু। দলা করে থুতু ফেলল স্তেফান। আবার পরে নিল গগলস্। ইনফ্রারেড অন করে খুঁজল শিকারদেরকে।

হঠাৎ থমকে গেল সে। লালচে একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। অনেক বড় এবং উজ্জ্বল। আন্দাজ করল, বুবি ট্র্যাপ পেতে দু'দিকে চলে গেছে শত্রুরা। ভেবেছে ওকে বোকা বানাতে পারবে। এত সহজ নয়। রাইফেল বাগিয়ে লালচে অবয়বটার দিকে এগোতে শুরু করল সে।

কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল স্তেফান। অবয়বটা বড় হতে শুরু করেছে... তারমানে এগিয়ে আসছে ওর-ই দিকে। দেখতে দেখতে স্কোপের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এখন ওর চোখে শুধুই কমলা আর হলুদ আভা খেলা করছে। অনেক বড় একটা আকৃতি, একজন মাত্র মানুষ হতেই পারে না। বিভ্রান্ত বোধ করল সে, কী ওটা? দু'জন মানুষ? ঘোড়ার পিঠে বসা? হতে পারে ওকে বুবি ট্র্যাপে ঘায়েল ভেবে বন্দি করতে আসছে।

ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই মাথার ভিতরে বেজে উঠল বিপদঘণ্টা। পাঁই করে ঘুরল স্তেফান। পিছন থেকে আরেকটা আকৃতি এগিয়ে আসছে! বাঁয়ে তাকাল... ওদিকেও দেখা যাচ্ছে দুটো আকৃতি।

হতভম্ব হয়ে গেল খুনি। মানে কী এর?

গায়ে উৎকট দুর্গন্ধ নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে বাড়ছে আকৃতিগুলোর সংখ্যা, এখন দাঁড়িয়েছে সাতটায়! হিট সিগনেচার বড্ড বিশাল, মানুষ বা ঘোড়ার হতে পারে না। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলছে ওগুলো। আচমকা মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল স্তেফানের, বুঝতে পারল কী দেখছে।

ভালুক... বিশালদেহী গ্রিজলি ভালুক ওগুলো!

গোঙানির মত বেরিয়ে এল রাশান খুনির গলা দিয়ে। ফাঁদের স্বরূপ বুঝতে পারছে। টোপ বানানো হয়েছে তাকে... ভালুকের টোপ! গায়ের গন্ধঅলা তরলটাই টেনে আনছে ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোকে। রক্ত আর পচা দেহাবশেষ মিলিয়ে এ-ধরনের টোপ তৈরি করে ইনুইট ভালুক-শিকারিরা, শিকারকে টেনে আনে সুবিধেজনক জায়গায়... অনেকদিন আগে পড়েছিল সে। এই প্রথমবারের মত দেখতে পাচ্ছে জিনিসটার কার্যকারিতা। সম্ভবত এটা শেষবারও হতে চলেছে।

ঝটপট রাইফেল নামিয়ে রেখে গগলস্ খুলে ফেলল স্তেফান। তারপর ত্রস্ত হাতে খুলতে শুরু করল গায়ের ইউনিফর্ম। জানে, শীতবস্ত্র ছাড়া হাইপোথারমিয়ায় জমে মরবে... কিন্তু খুব শীঘ্রি যা ঘটতে চলেছে, তারচেয়ে অনেক ভাল পরিণতি ওটা।

বেচারা তার মনের খায়েশ মেটাতে পারল না। পারকা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিমেল বাতাস, হাড়সুদ্ধ কেঁপে উঠল তাতে। আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইল ঊর্ধ্বাঙ্গের সবক'টা জয়েন্ট। কাঁপতে থাকা হাতে বাকি পোশাক খোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। পারকা খুলেও খুব লাভ হয়নি, হাতে মাখামাখি হয়ে গেছে রক্তের মিশ্রণটা।

প্যান্টের যিপারে মাত্র হাত দিয়েছে, এমন সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এল চাপা গরগরানি। চমকে উঠল স্তেফান, আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে মুখ। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারাল, মাটি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল রাইফেল, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি চালাল।

মৌমাছির চাকে যেন ঢিল পড়ল। চারপাশ থেকে একযোগে হুঙ্কার ছাড়ল হিংস্র ভালুকের দল। ঝোপঝাড় আর গাছের ডালপালা ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করল শিকারের দিকে। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ঘুরল স্তেফান, অন্ধের মত গুলি

ছুঁড়ল সবদিকে। অযথাই।

হঠাৎ ছায়া থেকে কালো একটা আকৃতি ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তে আরও কয়েকটা ভালুক বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। পড়ে থাকা মানুষটার উপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণীগুলো।

আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল স্তেফানের মরণ-চিৎকারে!

ঘোড়ার লাগাম ধরে ছোট একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে রানা, রাশান খুনির আর্তনাদ শুনছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। পাথরের মত মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাসনও, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। বিস্মিত চোখে দেখছে রানাকে—এমন পরিস্থিতিতে কাউকে এত শান্ত থাকতে দেখেনি সে আগে।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল রাশান খুনির কণ্ঠ। পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পরেও মনে হলো বাতাসে ভাসছে তার রেশ। এবার রানার চেহারায় কী যেন ফুটল। অনুশোচনা? ভুরু কোঁচকাল ম্যাসন। যেন নৃশংস ওই খুনির মৃত্যুর জন্য দগ্ধ হচ্ছে অদ্ভুত যুবকটি।

গলা খাঁকারি দিল সাংবাদিক। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে ওই রক্তের টোপ এল কোত্থেকে?'

নড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ইনুইট এক ভদ্রলোক দিয়েছেন। এই এলাকা গ্রিজলি ভালুকের রাজত্ব, বিপদে পড়লে যাতে জানোয়ারগুলোর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে পারি, সেজন্যে হাইকিঙে আসার সময় একটা বোতল দিয়েছিলেন আমাকে। এভাবে কাজে লাগাতে হবে, তা অবশ্য ভাবিনি।'

'ভা... ভালুকের রাজত্ব?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ম্যাসনের। 'আপনি জেনে-শুনে এদিকে এসেছেন? যদি আমাদেরকেই

আক্রমণ করে বসত?'

'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া... তার ওপর রাতের বেলা,' বলল রানা। 'অযথা আমাদের উপর হামলা করার কোনও কারণ দেখতে পাইনি। টোপটা ব্যবহার না করলে আড়াল থেকেই বেরুত না ভালুকগুলো।'

'সত্যি করে বলুন তো, আপনি কে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল ম্যাসন। 'যেভাবে সামাল দিলেন বিপদটা... যেভাবে ফাঁদ পাতলেন... মনে তো হচ্ছে মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে আপনার!'

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা, 'আমি বাংলাদেশ আর্মির রিটায়ার্ড মেজর।'

'বাংলাদেশি! এখানে কী করছেন?'

'বেড়াতে এসেছি। বলেছি তো আপনাকে!' ঘুরল রানা। 'আর কথা নয়, চলুন কেটে পড়ি এখান থেকে। নতুন কোনও বিপদ দেখা দেবার আগেই।'

ঘোড়ার পিঠে আর চড়ল না ওরা, ঢাল ধরে হাঁটতে শুরু করল। আলাপ জমানোর চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিল ম্যাসন, রানা থম মেরে গেছে। মাথায় চিন্তার ঝড়। বোঝার চেষ্টা করছে, দুই খুনি কে ছিল... কেনই বা খুন করতে চাইছিল ওদেরকে। ইন্টারোগেট করা গেলে ভাল হতো, কিন্তু তেমন কোনও সুযোগই তো পাওয়া গেল না! একটা ব্যাপার শুধু পরিষ্কার, উঁচুমানের প্রফেশনাল লোক ছিল ওরা—মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের। নিয়মিত সৈনিক, নাকি ভাড়াটে মার্সেনারি?

প্রথম খুনির ছুরিটা বের করল রানা, পেনলাইট জ্বেলে হাঁটতে হাঁটতে পরখ করল অস্ত্রটা। কোনও ইনসিগনিয়া বা প্রস্তুতকারকের নাম নেই। ডিজাইনটাও ইউনিক বলা যাবে না। মনে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে ছুরিটা কোত্থেকে এসেছে সেটা বের করতে না পারে কেউ। খুনিদের আগ্নেয়াস্ত্র

পরীক্ষা করলেও হয়তো একই জিনিস দেখত। এর অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না ওর। শুধু এক ধরনের মানুষই বিশেষত্বহীন এ-সব অস্ত্র ব্যবহার করে।

ব্ল্যাক অপসের লোক!

ম্যাসনের গন্তব্যের কথা ভাবল রানা। নেভির লোকজন ওখানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কোনও খবর পাচার হতে দিচ্ছে না। এর সঙ্গে ব্ল্যাক অপসের যোগাযোগ একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তা ধামাচাপা দিতে চাইছে কেউ। আমেরিকান সরকার? সেটাও অবিশ্বাস্য নয়। গোপন আবিষ্কারের খবর লুকানোর জন্য দু'চারজন নিরীহ মানুষ খুন করা আমেরিকানদের জন্য নতুন কিছু নয়। রানা নিজেই বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে এ-ধরনের ঘটনা।

ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠছে ও। ব্যাপারটায় নাক গলাবে কি না ভাবছে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ম্যাসনের প্রশ্ন শুনে সংবিৎ ফিরে পেল রানা।

ঘাড় ফেরাল ও। হাসিমুখে বলল, 'ইনুইট সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে। ওঁকে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন, কী বলেন?'

আট

অপরূপা সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা বলা যাবে না অ্যাবি ম্যানিটক-কে। ইনুইট মেয়েরা অত সুন্দরী হয় না। অ্যাবি অবশ্য

পুরোপুরি ইনুইট নয়, আমেরিকান রক্তও বইছে তার শরীরে... মায়ের দিক থেকে। বিশ্বসুন্দরী হবার মত রূপ না থাকলেও অদ্ভুত এক মাধুর্য আছে তার চেহারায়, যার কারণে যে-কোনও পুরুষের দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে যায় ওর দিকে। বেশ লম্বা মেয়ে ও, এবং মেয়েই বটে। তার চুল কালো মখমল। ব্রোঞ্জ রঙা মসৃণ ত্বক। চামড়ায় কোনও ভাঁজ বা দাগ নেই, রোদ লেগে কোনও ছাপ পড়েনি। লম্বা আর একহারা হলেও, তার ব্লাউজের সামনের দিক ও জিন্স প্যান্টের পিছন দিক বেশ ভারী ও ভরাট। তবে ওসব জায়গায় তাকাবার সাহস হবে না কারও, হাত দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, নির্ঘাত মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। রীতিমত মারকুটে ও দুঃসাহসী স্বভাবের মেয়ে এই অ্যাবি। এ-কারণেই পুরুষশাসিত সমাজে বাস করেও এলাকার শেরিফ হতে পেরেছে সে নিজ যোগ্যতায়।

আজ রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অফিসে যায়নি অ্যাবি, ঘুম থেকে উঠেছে বেশ দেরিতে—সাড়ে দশটায়। হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করেছে, তারপর একটা কফির মগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বারান্দায়। আয়েশ করে ওতে চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলাচ্ছে বাইরে। বাড়ির চারপাশে অবারিত প্রকৃতি—তুষারে ঢাকা প্রান্তর আর গাছপালার সারি। জমির সীমানা বলতে কিছু নেই... এই এলাকায় সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে না। সীমা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেটা বাড়ির একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া চওড়া নদী। ছোট একটা ডক আছে নদীতীরে, সেটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা টুইন অটার ফ্লোটপ্লেন—বরফ বা পানি, দু'জায়গাতেই ল্যাণ্ড করতে পারে। শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি।

আপন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল অ্যাবি, হঠাৎ চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ায় মাথা তুলে তাকাল। বনের ভিতর থেকে

বেরিয়ে এসেছে একটা চতুষ্পদ প্রাণী। অভ্যাসবশত কোমরের হোলস্টারে হাত চলে গেল, আঁকড়ে ধরল পিস্তলের বাট—আশপাশে নেকড়ের উৎপাত আছে, খাবারের সন্ধানে যখন-তখন হাজির হয় জানোয়ারগুলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই অবশ্য ঢিল দিল মুঠোয়, প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে।

'লোবো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

ছুটে এল কুকুরটা, ওর পায়ে গা ঘষল। অ্যাবিও হাত বুলিয়ে দিল লোবোর মাথায়, তারপর তাকাল আবার বনের সীমানায়। হ্যাঁ, ঘোড়ার লাগাম ধরে বেরিয়ে আসছে রানা। একটু অবাক হলো সঙ্গে আরেকজনকে দেখতে পেয়ে।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো, লোবোর ডাক শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন এক পক্বকেশ বৃদ্ধ—রিচার্ড ম্যানিটক, অ্যাবির পিতা। খাঁটি ইনুইট, ষাটের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্য এখনও টনটনে।

'রানা এল নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' অ্যাবি বলল। 'সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে এসেছে।'

'কে?'

'জানি না। আসুক, জানা যাবে।'

কয়েক মিনিট পরেই পৌঁছুল রানা, সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্ত পায়ে উঠে এল বারান্দায়।

'হাই, অ্যাবি!'

'এ কী অবস্থা তোমার!' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি। দ্রুত চোখ বোলাল ওর উপরে। 'চেহারা-সুরত দেখে তো মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে তোমাদের উপর দিয়ে! ইনিই বা কে?'

'গ্যারি ম্যাসন, ম্যা'ম,' নিজেই মুখ খুলল ম্যাসন। 'সিয়াটল টাইমসের রিপোর্টার। ডেডহর্সে যাচ্ছিলাম, পথে প্লেন ক্র্যাশ করেছে আমার। পাইলট সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। আমিও

মরতাম... যদি না মি. রানা উদ্ধার করতেন।'

'দুঃখজনক,' সহানুভূতির সুরে বলল অ্যাবি। 'আমি অ্যাবি ম্যানিটক, এই এলাকার শেরিফ।' ইশারায় পিতাকে দেখাল। 'ইনি আমার বাবা... রিচার্ড ম্যানিটক। প্লিজ, আসুন।'

'ক্র্যাশ তো করেছেন উনি! তোমার এ-অবস্থা কেন?' ভুরু কুঁচকে রানাকে জিজ্ঞেস করলেন রিচার্ড।

'বলব সবই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আগে একটু জিরিয়ে নিই? শরীর আর চলছে না। রাতভর হেঁটেছি আমরা, একটুও বিশ্রাম নিইনি।'

'ওদেরকে ভিতরে নিয়ে যা, অ্যাবি,' রিচার্ড বললেন। 'আমি ঘোড়াটা কোরালে রেখে আসছি। দানাপানিও দিতে হবে ওকে।' বারান্দা থেকে নেমে গেলেন রিচার্ড। লোবোও গেল তাঁর পিছু পিছু।

বাড়ির ভিতরে রানা আর ম্যাসনকে নিয়ে গেল অ্যাবি, বসতে দিল লিভিং রুমে। কৌতূহল নিয়ে চারপাশে চোখ বোলাল সাংবাদিক। স্থানীয় ইনুইট পরিবারের আবাস এমন হবে, আশা করেনি। লিভিংরুমটাই বলে দিচ্ছে, ম্যানিটকরা কুঁড়েঘরে থাকা আদিবাসী নয়, রীতিমত শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। রুচিশীলও বটে, পুরনো ঐতিহ্য পুরোপুরি ত্যাগ করেনি।

পুরো বাড়ি কাঠের ভারী গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে মোটা বিম। সেখান থেকে ঝুলছে ইনুইটদের স্থানীয় তেলের বাতি। ইলেকট্রিসিটি আছে বাড়িতে, তবে তার জন্য জেনারেটর চালাতে হয়। আপাতত ওটা বন্ধ, তাই তেলের বাতি জ্বেলেই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কামরার একপ্রান্তে রয়েছে রিভারস্টোন দিয়ে বানানো একটা ফায়ারপ্লেস, আরামদায়ক তাপ ছড়াচ্ছে। ক্যারিবু হাইড আর স্প্রুসের তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে সবক'টা আসবাবপত্র। পায়ের তলায়

ভালুকের চামড়ার কার্পেট। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কিছু নেটিভ আর্টওয়ার্ক ও আর্টিফ্যাক্ট। ছোট একটা টোটেম পোল আছে, সেইসঙ্গে কাঠ খোদাই করে বানানো এক ইনুইট দেবতার মূর্তি; স্থানীয় মুখোশও আছে। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে পেইণ্টিং আর ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কিছু ফটোগ্রাফ।

অ্যাবি জিজ্ঞেস করল, 'ব্রেকফাস্ট দেব তোমাদেরকে? নিশ্চয়ই কিছু খাওনি?'

'আগে কফি দাও,' জ্যাকেট খুলতে খুলতে বলল রানা। 'ঠাণ্ডায় শরীর জমে বরফ হয়ে গেছে।'

'সবই দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করো।'

ফায়ারপ্লেসের আগুন একটু উসকে দিল অ্যাবি। তারপর চলে গেল কিচেনে। ম্যাসনের দিকে ফিরে রানা বলল, 'আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বেশ অবাক হয়েছেন।'

'কী! না, না!' তাড়াতাড়ি বলল ম্যাসন। 'আপনি ইনুইট-ইনুইট করছিলেন তো, ভেবেছিলাম স্থানীয় কোনও গ্রাম-ট্রামে নিয়ে যাবেন। এ-রকম একটা বাড়িতে নিয়ে আসবেন, তা আশা করিনি।'

'রিচার্ড ম্যানিটক গ্রাম ছেড়েছেন বহুদিন আগে,' রানা বলল। 'পরিবেশবিদ হিসেবে কাজ করেছেন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়। রিটায়ার করার পর আবার ফিরে এসেছেন নিজের এলাকায়।'

'মেয়েকেও নিয়ে এসেছেন?'

সঙ্গত কৌতূহল। আলাস্কার নির্জন এলাকায় অ্যাবির মত মেয়ে শেরিফ হয়েছে কেন, এ-প্রশ্ন জাগতেই পারে যে-কারও মনে। একটু ইতস্তত করল রানা। পুরো ইতিহাস জানা আছে ওর, রিচার্ডের মুখেই শুনেছে। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল অ্যাবি, একটা ছেলেও হয়েছিল ওর। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায়

সড়ক-দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারায় বেচারি, এর কিছুদিন পরেই বাচ্চার শরীরে পাওয়া যায় লিউকেমিয়া। ছয় বছর বয়সে সে-ও মারা গেছে। জগৎ-সংসারের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়েছে অ্যাবি সেই থেকে, ফিরে এসেছে বাবার কাছে। এখন ওর স্বভাব-চরিত্রে যে-রুক্ষতা দেখা যায়, তা জীবনের কষাঘাত থেকেই এসেছে।

এ-সব কথা ম্যাসনকে শোনাবার ইচ্ছে হলো না, তাই রানা বলল, 'লম্বা ইতিহাস। পরে কখনও নাহয় শুনবেন।'

কফির মগ নিয়ে ফিরে এল অ্যাবি, তুলে দিল রানা আর ম্যাসনের হাতে। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মি. ম্যাসন। শেরিফ হিসেবে প্লেন-ক্র্যাশের ব্যাপারটা তদন্ত করতে হবে আমাকে। আপনার পাইলটের লাশও উদ্ধার করতে হবে। কী ঘটেছিল, একটু খুলে বলবেন? কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?'

'ওটা দুর্ঘটনা ছিল না,' ম্যাসন মুখ খোলার আগেই বলল রানা। 'আমার ধারণা, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্র্যাশ করানো হয়েছে বিমানটা। সম্ভবত স্যাবোটাজ।'

'স্যাবোটাজ!' অ্যাবির কপালে ভাঁজ দেখা দিল। 'এ-কথা বলছ কেন?'

'কারণ মি. ম্যাসনের বিমান ক্র্যাশ করার একটু পরেই আরেকটা বিমান এসে হাজির হয় আকাশে। প্যারাজাম্প করে দু'জন কমাণ্ডো নামে ওটা থেকে। বোমা মেরে বিমানের ধ্বংসাবশেষ উড়িয়ে দিয়েছে ওরা, এরপর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে খুন করতে। কোনও প্রমাণ রাখতে চাইছিল না। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।'

'কমাণ্ডো?' অবাক হয়ে গেল অ্যাবি। 'কোথায় ওরা এখন?'

'দুঃখিত, বেঁচে নেই একজনও। জঙ্গলে গেলে ওদের লাশ

দেখতে পাবে।'

'সব খুলে বলো আমাকে।' থমথমে হয়ে উঠল অ্যাবির কণ্ঠ।

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা খুলে বলল রানা, মাঝে মাঝে কথা জোগাল ম্যাসন। নোটবুকে সব টুকে নিল অ্যাবি। ওদের কাহিনি শেষ হলে একটা ম্যাপ নিয়ে এল—দাগ দিয়ে ক্র্যাশসাইট আর দুই খুনির লাশের অবস্থান ওটায় দেখিয়ে দিল রানা।

'ঘটনা খুব সিরিয়াস,' অ্যাবি বলল। 'এ-কেস তদন্ত করার মত যথেষ্ট রিসোর্স নেই আমার হাতে। ফেয়ারব্যাঙ্কসে রিপোর্ট করতে হবে।'

'অফিসেও যোগাযোগ করা দরকার আমার,' ম্যাসন বলল। 'ওরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। প্রুডো বে-তে পৌঁছেই ফোন করার কথা ছিল।'

নোটবুক বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল অ্যাবি। জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল একটা স্যাটেলাইট ফোন। সাংবাদিকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন। তাড়াতাড়ি কথা সারবেন, অফিসে ফোন করতে হবে আমাকে। ফেয়ারব্যাঙ্কসের পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও।'

কফির মগ নামিয়ে রেখে ফোনটা নিল ম্যাসন। 'কীভাবে ডায়াল করব?'

'সাধারণ ফোনের মতই। প্রথমে কাণ্ট্রি আর এরিয়া কোড, তারপর লোকাল নাম্বার। ট্রান্সমিশন একটু দুর্বল শোনাতে পারে, তবে ওটা স্বাভাবিক। সোলার স্টর্মের কারণে গত ক'দিন থেকে এমনিতেই সমস্যা হচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।' জানালার কাছে চলে গেল ম্যাসন।

রানাকে ইশারা করল অ্যাবি, নিয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের কাছে। তারপর ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'এসব হচ্ছেটা কী, রানা?'

'আমি শিয়োর না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে মনে হচ্ছে ওই ড্রিফট স্টেশন থেকে খবরের কাগজগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে কেউ।'

'কাভার আপ?'

'হতে পারে। কিন্তু বললাম তো, আমি শিয়োর না।'

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাসনের দিকে তাকাল অ্যাবি। লাইন পেয়েছে সাংবাদিক, উত্তেজিত গলায় বলছে, 'স্যাণ্ড্রা, গ্যারি বলছি। বসের সঙ্গে কথা বলব...' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। 'ধ্যাত্তেরি! যত ইম্পরট্যান্ট মিটিঙেই থাকুক, আমি পরোয়া করি না। আমার ব্যাপারটা আরও জরুরি। তুমি লাইন দাও বলছি!'

'কী মনে হয় তোমার?' বলল অ্যাবি। 'কিছু লুকাচ্ছে লোকটা?'

'ওকে এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারছি না আমি,' রানা স্বীকার করল। 'হতে পারে গভীর জলের মাছ... আবার যদি স্রেফ দুর্ভাগা হয়, তা হলেও অবাক হব না।'

'আর ওই কমাণ্ডোদের ব্যাপারটা... তুমি শিয়োর, ওরা মিলিটারির লোক?'

'মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের, কোনও সন্দেহ নেই। হামলার সময় ব্যাটলগ্রাউণ্ডের ট্যাকটিক্স ব্যবহার করেছে—সাধারণ কোনও খুনির কাছে অমন কৌশল আশা করা যায় না।'

'আর কিছু বলতে পারো ওদের সম্পর্কে?'

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি।' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'হ্যাঁ, ওরা সম্ভবত বিদেশি লোক ছিল।'

'তুমি শিয়োর?'

'হাবভাবে তা-ই মনে হয়েছে। একবারও কথা বলতে শুনিনি ওদেরকে। মনে হচ্ছিল ইচ্ছে করেই কথা বন্ধ রেখেছে, যাতে ভাষা বা উচ্চারণ শুনে ওদের পরিচয় আঁচ করতে না পারি।

ওদের অস্ত্রগুলো থেকেও সব ধরনের আইডেণ্টিফিকেশন সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমেরিকান হলে এত ঝামেলায় যাবার প্রয়োজন ছিল না।'

শ্রাগ করল অ্যাবি। 'এগোবার মত কোনও সূত্রই তো দেখছি নেই। ফরেনসিক এক্সপার্ট পাঠাতে হবে মনে হচ্ছে। হয়তো ওরা কিছু আবিষ্কার করতে পারবে।'

'এখানে যত খুশি খোঁজাখুঁজি চালাও,' রানা বলল, 'কিন্তু আমার ধারণা, রহস্যটার জড় লুকিয়ে আছে ওই ড্রিফট স্টেশনে।'

'ওটা আমার এখতিয়ারের বাইরে। ওখানে তদন্ত চালাতে হলে এফবিআইকে খবর দিতে হবে। ব্যাপারটার সঙ্গে যদি নেভির কোনও সম্পর্ক থাকে, তা হলে ডাকতে হবে মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্সকেও। ভালই যন্ত্রণায় পড়লাম মনে হচ্ছে।'

'তা তো বটেই...'

কথা শেষ হলো না রানার, ম্যাসনের চিৎকার শুনে ঘাড় ফেরাতে বাধ্য হলো।

'প্রুডো বে!' খ্যাপাটে গলায় বলল সাংবাদিক। 'কেন?'

তার প্রশ্নের জবাবে কিছু বলা হলো অপরপ্রান্ত থেকে।

'আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে...' প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল ম্যাসন। সম্ভবত কড়া কিছু শোনানো হলো তাকে। মুখ লাল হয়ে গেল তার। বলল, 'আপনার হুকুমে এখানে কাজ হবে না, স্যর। এ-মুহূর্তে আমি একজন শেরিফের সামনে আছি। কতক্ষণ আমাকে আটকে রাখবে জানি না। কাজেই বলতে পারছি না আদৌ প্রুডো বে-তে যেতে পারব কি না।' একটু নীরবতা। শেষে হার মেনে নিল সাংবাদিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ, আপনার কথা মানলাম, স্যর। কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হলে মোটাসোটা একটা বোনাস চাই আমি।'

আর কিছু না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ম্যাসন। ফোন ফিরিয়ে দিল অ্যাবির হাতে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

সাংবাদিকের চেহারায় তিক্ততা ভর করল। বলল, 'একটা পাষাণের আণ্ডারে চাকরি করছি, বুঝলেন? এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল... কোথায় সমবেদনা জানাবে, তাড়াতাড়ি ফিরতে বলবে... তা না, অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করা চাই! প্রুডো বে-তে গিয়ে পত্রিকার কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার হুকুম দিচ্ছে। বলছে দরকার হলে ভেলায় চেপে ওমেগা স্টেশনে যেতে!'

তার বলার ভঙ্গিটা শুনে হেসে ফেলল রানা আর অ্যাবি।

'আপনারা হাসছেন?' আহত গলায় বলল ম্যাসন।

'সরি, কিছু মনে করবেন না,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যাবি। 'অবশ্য সম্পাদক বললেও ফিরতে পারতেন না আপনি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

নিচু গলায় খেদোক্তি করল ম্যাসন।

একটু দূরে সরে এল অ্যাবি। স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল—ফেয়ারব্যাঙ্কসে কথা বলবে। কিন্তু ডায়াল শেষ করার আগেই ঝট করে খুলে গেল সামনের দরজা। দেখা গেল রিচার্ড ম্যানিটকের মুখ।

'এক্সকিউজ মি, তোমরা কি ব্যস্ত?' বললেন তিনি। 'মনে হচ্ছে আরও অতিথি পেতে যাচ্ছি আমরা। একটা বিমান ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করছে সামনের মাঠে।'

খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। বাইরে থেকে চাপা গর্জন শোনা গেল লোবোর।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। বারান্দায় বেরিয়ে এল ও। চোখ বোলাল আকাশে। চক্কর দিতে থাকা একটা সাদা রঙের সেসনা বিমান দেখতে পেল—ধীরে ধীরে নদীর ধারের ফাঁকা জমির সঙ্গে

অ্যালাইন করে আনছে নিজেকে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল মুহূর্তে।

'রানা?' পিছন থেকে ডাকল অ্যাবি।

'ওটা কালকের বিমানটাই,' রানা বলল।

'তুমি শিয়োর?' তীক্ষ্ণ চোখে বিমানের দিকে তাকাল অ্যাবি, আণ্ডারক্যারিজের মার্কিং পড়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু মার্কিং পড়ার দরকার নেই রানার, এক নজরেই চিনে নিয়েছে বিমানটাকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কোনও সন্দেহ নেই।'

ওর কথা শেষ হতেই সেসসার জানালায় নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। একজন মানুষ তার দেহের ঊর্ধ্বাংশ বের করল ওখান দিয়ে, হাতে লম্বা কী যেন ধরা।

গ্রেনেড লঞ্চার... রকেট-প্রপেলড্ গ্রেনেড লঞ্চার!

চেঁচিয়ে উঠল রানা, পরক্ষণে অগ্নিবর্ষণ করল অস্ত্রটা। ডাইভ দিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল সবাই, তবে ওদের ধারেকাছে পৌঁছুল না গ্রেনেড, তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে প্রতিপক্ষ, বাড়ির বেশ কিছুটা সামনে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ছিটকে উঠল তুষার। প্রবল গর্জন করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল সেসনা। বাঁক নিয়ে ফিরতে শুরু করল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। চেঁচাল, 'বাড়ির ভিতরে ঢোকো সবাই! কুইক!!'

দুদ্দাড় করে লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল অ্যাবি, রিচার্ড আর ম্যাসন। পিছু পিছু লোবো-সহ ও নিজে। ভিতরে ঢুকেই আটকে দিল দরজা।

'হচ্ছেটা কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইলেন রিচার্ড। 'কারা ওরা? আমাদের উপর হামলা করছে কেন?'

'ওসব নাহয় পরে শুনবেন,' রানা বলল। 'আগে প্রাণ বাঁচানো দরকার।'

'কোনও প্ল্যান আছে তোমার মাথায়?' অ্যাবি জিজ্ঞেস করল।

'এখানে থাকা চলবে না, কোণঠাসা হয়ে যাবার আগেই কেটে পড়া ভাল।' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'তোমার টুইন অটারটার অবস্থা কী? ফ্লাই করা যাবে?'

'যাবে। ফিউয়েলও আছে আধ ট্যাঙ্কের বেশি।'

'গুড। তা হলে ওটাই ব্যবহার করব আমরা।'

'জঙ্গলে ঢুকে পড়া যায় না?' পাল্টা প্রস্তাব দিল ম্যাসন। শেরিফের ছোট্ট বিমানটা দেখেছে সে, খুব একটা আস্থা পাচ্ছে না প্রাচীন আকাশযানটার ব্যাপারে।

'গতকাল আবহাওয়া খারাপ ছিল, ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি আমরা,' রানা মাথা নাড়ল। 'কিন্তু আজ সে-রকম কোনও সুবিধে পাব না। জঙ্গলে আমাদের অপেক্ষায় ক'জন কমাণ্ডো বসে আছে কে জানে।'

'অস্ত্র দরকার আমাদের।' বলে রানার দিকে একটা রাইফেল বাড়িয়ে ধরল অ্যাবি। নিজে নিল পিস্তল। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'ডক পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব বলে মনে হচ্ছে না,' শঙ্কিত গলায় বলল ম্যাসন। 'অন্তত একশো গজ ফাঁকা জায়গা পার হতে হবে তার আগে। সহজ টার্গেট।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' অভয় দিল রানা, 'ওদেরকে ব্যস্ত রাখব আমি।' অ্যাবির দিকে ফিরল, মেয়েটাকে আশ্চর্য রকমের শান্ত দেখাচ্ছে, একটুও ঘাবড়াচ্ছে না। 'প্লেনে উঠেই ইঞ্জিন চালু করবে, ঠিক আছে? যত দ্রুত সম্ভব।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাবি।

'তা হলে আর দেরি নয়। লেটস্ গো!'

বাড়ির পিছনের দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল সবাই। কুকুরটাও রয়েছে ওদের সঙ্গে। প্রাণপণে ছুটল সবাই ডকের

দিকে। রানা রয়েছে সবার পিছনে। কিছুদূর গিয়েই উল্টো ঘুরল ও, আকাশের দিকে রাইফেল তুলল। পলায়নরত মানুষগুলোকে স্পট করেছে বিমানটা, মুখ ঘুরিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। নিশানা স্থির করার জন্য সময় নিল না রানা, আন্দাজে টিপে দিল ট্রিগার। লাগল না গুলি, তবে নড়ে উঠল সেসনা, নাক ঘুরিয়ে সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

দ্রুত বোল্ট টেনে চেম্বারে আরেকটা রাউণ্ড ভরল রানা। আবার চাপল ট্রিগার। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হতাশ হলো না ও। উড়ন্ত একটা বিমানের গায়ে গুলি লাগানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। পাইলট ভড়কে দেয়া গেছে, তা-ই ঢের। ইতিমধ্যে কাঠের ডকে উঠে পড়েছে ওর সঙ্গীরা। উল্টো ঘুরে ও-ও ছুটল।

ডকে পা রেখে দ্বিতীয়বারের মত থামল রানা। রিচার্ড, ম্যাসন আর লোবোকে নিয়ে টুইন অটারে উঠে পড়েছে অ্যাবি, কিন্তু ইঞ্জিন চালু করতে কয়েক মিনিট সময় দরকার ওর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। খালি কার্তুজ ফেলে দিয়ে রিলোড করল রাইফেল।

ওদের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছে সেসনার আরোহীরা। নাক ঘুরিয়ে ডকের দিকে ছুটে আসছে বিমানটা। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে, ডাইভ দিচ্ছে শিকারি ঈগলের মত।

'অ্যাবি! তাড়াতাড়ি করো!' চেঁচাল রানা। তারপরেই গুলি ছুঁড়ল সেসনাকে লক্ষ্য করে। এবারও লাগাতে পারল না। তাড়াতাড়ি বোল্ট টেনে আরেকবার টিপল ট্রিগার। তাড়াহুড়োয় এটাও ব্যর্থ হলো।

আর তখুনি খক খক করে যক্ষ্মারোগীর মত কেশে উঠল টুইন অটার। কয়েক দফা কেশেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন, ঘুরতে শুরু করল প্রপেলারের পাখা।

'রানা! চলে এসো!!' ডাক শোনা গেল অ্যাবির।

ইচ্ছে হলো ছুট লাগায়, কিন্তু জোর করে নিজেকে নিরস্ত রাখল রানা। অনেকখানি নেমে এসেছে সেসনা, ডাইভ দিচ্ছে না আর, নদীর ধারা অনুসরণ করে ত্রিশ ফুট উচ্চতায় ছুটে আসছে টুইন অটারকে লক্ষ্য করে। ঝট্ করে একটা সাইড ডোর খুলে গেল, সেখান দিয়ে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বের করল সাদা পারকা-পরা এক লোক। হাতে ধরা কালো রঙের গ্রেনেড-লঞ্চারের পুরোটাই দেখতে পাচ্ছে রানা। বলতে গেলে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে শুট করতে চাইছে। কিছুতেই এ-আঘাত এড়ানো সম্ভব হবে না ডকে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্লোটপ্লেনের পক্ষে। একটাই উপায় আছে—ব্যর্থ করে দিতে হবে হামলাটা। ঘুরে এসে দ্বিতীয় আঘাত হানতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে সেসনার, ততক্ষণে ওরা হয়তো টেকঅফ করে সরে যেতে পারবে।

রাইফেলের সাইটে চোখ রাখল রানা। এবার আর তাড়াহুড়ো করছে না। দম আটকে নিশানা স্থির করল, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

কোথায় লাগল, ঠিক বোঝা গেল না। তবে গ্রেনেড-লঞ্চারটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠতে দেখল ও। মনে হলো লাল একটা ছোপও দেখেছে অস্ত্রধারীর হাতে। নিশ্চিত হওয়া গেল না, কারণ ঝট্ করে সেসনার ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা। বিমানটা প্রবল গর্জনে পেরিয়ে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে। তবে কিছুদূর গিয়েই আবার ঘুরতে শুরু করল।

'রানা, কুইক!' এবার রিচার্ড ম্যানিটকের ডাক শুনল রানা। 'আমরা এখনও দড়ি ছাড়িনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাইফেল কাঁধে ঝোলাল রানা, এক ছুটে চলে এল বিমানের কাছে। ত্রস্ত হাতে বোলার্ড থেকে খুলে নিল দড়ি, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল টুইন অটারের পণ্টুনে। ভাসতে ভাসতে বিমানটা সরতে শুরু করল ডক থেকে।

'দেরি কোরো না! টেকঅফ করো!' চড়া গলায় অ্যাবিকে নির্দেশ দিল রানা। রিচার্ড হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ওকে কেবিনে ঢুকতে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু মাথা নাড়ল ও। 'না, আপাতত এখানেই থাকতে হবে আমাকে। সাহায্য করুন।' দড়িটা বৃদ্ধ ইনুইটের হাতে ধরিয়ে দিল।

'কী!' চমকে উঠলেন রিচার্ড। 'কেন?'

'বিপদ এখনও কাটেনি।' ইশারায় পিছনটা দেখাল রানা। সেসনা মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে, এবার পিছন থেকে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

মাথা ঝাঁকালেন রিচার্ড। দড়ি দিয়ে দরজার পাশের একটা স্ট্রাটের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন রানাকে, যাতে ঝাঁকিতে নীচে পড়ে না যায় ও। ইতিমধ্যে রাইফেল রিলোড করে ফেলেছে রানা।

চলতে শুরু করল টুইন অটার। গতি বাড়ছে ধীরে ধীরে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দূরত্ব কমিয়ে আনছে সেসনা, ওদের চেয়ে বড়জোর একশো গজ পিছনে আছে ওটা। গ্রেনেড-লঞ্চার নিয়ে আবারও শরীর বের করেছে অস্ত্রধারী। জখম নিশ্চয়ই গুরুতর নয়।

লোকটাকে নয়, ককপিটের উইণ্ডশিল্ডের দিকে রাইফেল তাক করল রানা। সেসনা ওদের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছুতেই চাপ দিল ট্রিগারে। প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল ওর রাইফেল আর প্রতিপক্ষের গ্রেনেড-লঞ্চার। টুইন-অটারের পিছনের পানিতে আছড়ে পড়ল লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেড, বিস্ফোরিত হয়ে পানির ফুলঝুরি ছিটাল—নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি শত্রু। সেসনাটা মাতালের মত উড়ে গেল ফ্লোটপ্লেনের উপর দিয়ে। চকিতে ওটার উইণ্ডশিল্ড দেখতে পেল রানা—মাকড়সার জালের মত চিড় ধরেছে। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটল ওর।

টুইন অটারের গতি বেড়ে গেছে, ওটা এখন ধাওয়া করছে

সেসনাকে। ইয়োক টানল অ্যাবি, সঙ্গে সঙ্গে পানির বুক ছেড়ে শূন্যে পাখা মেলল বিমান। পন্টুনের উপর পা পিছলে গেল রানার, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, বেঁচে গেল কোমরে বাঁধা দড়ির কারণে। তারপরেও ভীষণভাবে ঝাঁকি খেলো ওর দেহ, হাত থেকে ছুটে গেল রাইফেলটা। পন্টুনের গায়ে একটা আছাড় খেয়ে অস্ত্রটা রওনা হলো পানির দিকে।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠলেন রিচার্ড। বাড়িয়ে দিলেন একটা হাত।

রানা তখন খড়ের পুতুলের মত ঝুলছে, তীব্র বাতাসে হাত-পা নড়ছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল, মাংস কেটে দড়িটা বসে যাচ্ছে কোমরে। কয়েক মুহূর্ত যুদ্ধ করার পর অবলম্বন ফিরে পেল ও। খপ করে ধরে ফেলল বৃদ্ধ ইনুইটের হাত। অন্যহাতে একটা ছুরি নিয়ে দুই পোঁচে ওর বাঁধন কেটে দিলেন রিচার্ড, হ্যাঁচকা টানে ওকে নিয়ে এলেন বিমানের ভিতরে। আটকে দিলেন দরজা।

'থ্যাঙ্কস্,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা।

'তুমিও কম দেখাওনি,' প্রশংসা ঝরল রিচার্ডের কণ্ঠে।

'এখনও শেষ হয়নি ঝামেলা,' বলল রানা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে চলে গেল কো-পাইলটের সিটে। দ্রুত সিটবেল্ট বাঁধল।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল অ্যাবি।

'হ্যাঁ।' সামনে তাকাল রানা। কাত হয়ে ওদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে সেসনা। 'তবে রাইফেলটা হারিয়েছি। আর কোনও অস্ত্র আছে তোমার কাছে?'

'এই ব্রাউনিংটা,' কোমরের হোলস্টার দেখাল অ্যাবি। 'পিছনের কেবিনের দেয়ালে আমার সার্ভিস শটগানটাও ঝোলানো আছে। তবে দুটোর কোনোটাই আমাদের কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অ্যাবির কথাই ঠিক। লং রেঞ্জে পিস্তল বা শটগান একেবারেই অচল। বিশেষ করে তীব্র বাতাসের মাঝে।

বিমানের উচ্চতা বাড়াতে শুরু করেছে অ্যাবি। বলল, 'প্রুডো বে-র দিকে পিঠটান দেয়া ছাড়া আর কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওখানে পৌঁছুতে পারলে সাহায্য মিলবে।'

'ওটা চারশো মাইল দূরে,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'ততক্ষণ টিকে থাকতে হবে আমাদেরকে।'

নয়

'মাফ করবেন, স্যার, আপনার জন্য মেসেজ।'

স্টেটরুমের দরজায় উদয় হওয়া তরুণ লেফটেন্যান্টের কথা যেন শুনতেই পেলেন না রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছেন তিনি—ফিয়োদর দস্তয়েভস্কির দ্য ব্রাদার্স কারামাযভ। খুব প্রিয় একটা বই... বিশেষ করে মনের অস্থিরতার সময়ে। বইয়ের নায়ক আইভান কারামাযভের জীবন ও আত্মার যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তার পিছনে সঙ্গত কারণও আছে।

রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের পিতা ইগোর নিকোলায়েভ ছিলেন ধর্মপ্রাণ গোঁড়া রাশান অর্থোডক্স। জোসেফ স্টালিনের উত্থানের পর পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নে জারি করা হয়েছিল

ধর্মকর্মের উপর নানাবিধ বিধি-নিষেধ, কিন্তু সে-সবের পরোয়া করেননি তিনি। তার মূল্যও দিতে হয়েছে চরমভাবে। এক রাতে অস্ত্রের মুখে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় কেজিবির লোকেরা, পরিবারের সবার সামনে থেকে। মৃত্যুদণ্ড পেতেন, কিন্তু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হওয়ায় প্রাণভিক্ষা দেয়া হয় তাঁকে, পাঠানো হয় দেশ থেকে বহুদূরে... আর্কটিক মহাসাগরের এক রিসার্চ স্টেশনে, গোপন গবেষণার কাজে। মৃত্যুর চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না তা। আর কোনোদিন স্ত্রী বা সন্তানের দেখা পাননি তিনি।

এ-মুহূর্তে বইয়ের যে-অংশটা পড়ছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, সেখানে সরাসরি ঈশ্বরের বিরুদ্ধবাদিতায় নেমেছে আইভান। পড়তে পড়তে রক্ত গরম হয়ে উঠেছে তাঁর। আইভানের ক্ষোভ আর আক্রোশের সঙ্গে মিল পাচ্ছেন নিজের অনুভূতির। তাঁর কথাগুলোই যেন উচ্চারণ করছে কাহিনির নায়ক। ওরই মত রিয়ার অ্যাডমিরালের নিজের পিতা ইগোরও মারা গেছেন—না, আপন সন্তানের হাতে নয়; তবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে।

দুর্ভাগ্যের সমাপ্তি ওখানেই ঘটেনি। ঊনিশশো আটচল্লিশে যখন গোপন গবেষণা-কেন্দ্রটা হারিয়ে গেল, স্বামীর শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরালের মা। এক সকালে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। নিকোলায়েভ নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মৃতদেহ। ছোট্ট এক শিশুর জন্য বড়ই ভয়াবহ এক দৃশ্য ছিল সেটা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এরপর ভয়াবহ জীবনযুদ্ধে নামতে হয় তাঁকে। পদে পদে শিকার হয়েছেন দুঃখ, কষ্ট আর বঞ্চনার। শেষ পর্যন্ত আঠারো বছর বয়সে যোগ দেন তিনি রাশান নৌবাহিনীতে। ওটাই হয়ে ওঠে তাঁর পরিবার... তাঁর সবকিছু। বলতে গেলে পুরো যৌবন তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন দেশের জন্য। ঘর-সংসার পর্যন্ত করা হয়নি। সুন্দরী এক তরুণীকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু দু'বছরের

মাথায় তাঁকে ছেড়ে চলে যায় সে। পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, অথচ স্ত্রীর প্রতি উদাসীন... এমন লোকের সঙ্গে নাকি জীবন কাটানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। হতাশ হয়েছিলেন নিকোলায়েভ, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছিল নারীজাতির উপর। দ্বিতীয়বার আর ও-পথ মাড়াননি। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন দেশের সেবায়। অথচ এই ত্যাগ বা নিষ্ঠার কোনও প্রতিদান পাননি তিনি। বহু কষ্টে রিয়ার অ্যাডমিরাল পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়েছেন, কিন্তু তারপরেই থমকে গেছে ক্যারিয়ার। অথচ তাঁর সমসাময়িকেরা অ্যাডমিরাল হয়ে গেছে, কিংবা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মস্কো—ওখানে তাঁর কোনও স্থান নেই। সবার চোখে তিনি আজও উপেক্ষিত। ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীর উপর ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে নিকোলায়েভের, বুঝে গেছেন—এখানে নিষ্ঠা বা সততার কোনও দাম নেই। দুনিয়া শুধু মন্দলোক আর তোষামোদকারীদের জন্য।

হতাশা আর বঞ্চনার মাঝেও একটা ব্যাপার প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়িয়েছে রিয়ার অ্যাডমিরালকে—তাঁর পিতার করুণ পরিণতি। ভুলতে পারেননি ফাঁসে ঝুলতে থাকা মায়ের লাশের দৃশ্যও। কীসের অভাব যেন বোধ করেছেন সারাটা জীবন। সম্ভবত সুবিচারের... প্রতিশোধের। আজ... এত বছর পর এসেছে সে-সুযোগ। সাবমেরিন নিয়ে সেখানেই চলেছেন তিনি, যেখানে তাঁর পিতা মারা গেছেন। এবার তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

'স্যর?' আবার ডাকল লেফটেন্যান্ট, নার্ভাস গলায়। প্রতাপশালী রিয়ার অ্যাডমিরাল অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন কি না, সে-ভয়ে অস্থির।

ঘাড় ফেরালেন নিকোলায়েভ। জলদগম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

'আর্জেন্ট মার্কিং করা একটা কোডেড মেসেজ এসেছে আপনার জন্য,' জানাল লেফটেন্যান্ট। 'ওটা নিয়ে এসেছি।'

'হুম!' বইটা বন্ধ করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। উঠে পড়লেন ডেস্ক থেকে। মেসেজটা প্রত্যাশিত। আধঘণ্টা আগে পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে এসেছে *ড্রাকন*, বরফস্তরের একটা ফাটলের মাঝ দিয়ে কমিউনিকেশন অ্যারে তুলেছে খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য।

হাত বাড়িয়ে লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে একটা মুখবন্ধ খাম নিলেন নিকোলায়েভ। বললেন, 'ধন্যবাদ। এবার তুমি যেতে পারো।'

'জী, স্যর,' সটান হয়ে স্যালিউট ঠুকল লেফটেন্যান্ট। তারপর চলে গেল উল্টো ঘুরে।

দরজা আটকে ডেস্কে ফিরে এলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। খামের মুখ ছিঁড়ে ভিতর থেকে বের করলেন ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ। ডেস্কের উপর রেখে শুরু করলেন ডিক্রিপশন। মেসেজটা এসেছে কেজিবি-র উত্তরসূরি এফএসবি, মানে ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের কর্নেল ভ্লাদ ইয়েলৎসিনের কাছ থেকে। তিক্ত একটা হাসি ফুটল নিকোলায়েভের ঠোঁটে। নামই শুধু বদলেছে, কাজের ধরন পাল্টায়নি সংগঠনটার। লুবিয়াঙ্কার হেডকোয়ার্টার থেকে আসা এই মেসেজটাই তার প্রমাণ।

ডিক্রিপশনে বেশি সময় লাগল না, তবে সময় নিয়ে ওটা পড়লেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। টপ সিক্রেট মেসেজ, বলা হয়েছে—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম শুরু করেছে আমেরিকানরা, ইউএস ডেল্টা ফোর্সকেও মাঠে নামানো হয়েছে। অপারেশন কন্ট্রোলারকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে এফএসবি এজেন্টরা, লেপার্ড অপসের সাহায্যে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এরপর দেয়া হয়েছে ওমেগা ড্রিফট স্টেশনের সাম্প্রতিক লোকেশন, ওটাকে টার্গেট হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সবশেষে রয়েছে নির্দেশ—এখন থেকে সাইলেন্ট মোডে এগোতে

হবে ড্রাকনকে। কমিউনিকেশন বজায় রাখতে হবে নির্দিষ্ট শিডিউল অনুসারে। অপারেশন শুরু করবার জন্য নির্দেশও দেয়া হবে পরবর্তী সময়ে।

মেসেজ পড়া শেষ হলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন নিকোলায়েভ। ইউএস ডেল্টা ফোর্স মাঠে নামা মানেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে, ওয়াশিংটন নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছে পুরনো আইস বেইসটার গুরুত্ব। ডেল্টা ফোর্স কাজ করে স্বাধীনভাবে, কোনও ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া। ওদের নিয়ন্ত্রণ করে স্রেফ একজন অপারেশনাল কন্ট্রোলার—সে-লোক হয় কোনও হাই র‍্যাঙ্কিং মিলিটারি অফিশিয়াল, নয়তো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার... সোজা কথায় যুদ্ধে নামার জন্য বলা হয়েছে তাঁকে—গোপন যুদ্ধ! এ-ধরনের যুদ্ধ হয় সবার চোখের আড়ালে, পৃথিবীর লোকে কোনোদিন যার খবর জানতে পারে না। কেউ কিছু প্রশ্ন তুললেও দুই সরকারই অস্বীকার করবে কোনও ধরনের লড়াইয়ের কথা। অথচ প্রাণ বিপন্ন করতে হবে তাঁকে!

বিবমীষা অনুভব করলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, রাজনীতির মারপ্যাঁচ অসহ্য লাগে তাঁর কাছে। আপাতদৃষ্টিতে আমেরিকা আর রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক যতই ভাল দেখাক, আসলে সোভিয়েত আমলের স্নায়ুযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। আইস বেইসের এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন নিকোলায়েভ, উঠে দাঁড়ালেন। ভাবছেন, দুনিয়ার এই কলুষতা আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তিনিই এর অবসান ঘটাবেন। লঘু পায়ে হেঁটে মেঝেতে সাজিয়ে রাখা টাইটেনিয়ামের কেসগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কেউ জানে না, এগুলোর ভিতরে আসলে কী নিয়ে এসেছেন তিনি।

আলতোভাবে হাত বোলালেন তিনি সবক'টা কেসের গায়ে। তারপর ফিরে এলেন ডেস্কে। আবার ডুবে গেলেন দস্তয়েভস্কি-র ক্লাসিক উপন্যাসে।

দশ

এয়ারস্পিড আর হেডিং চেক করল অ্যাবি। উত্তেজনা আর ভয়ে শুকিয়ে গেছে বুক, তারপরেও চেষ্টা করছে ঠাণ্ডা মাথায় পাইলটের দায়িত্ব পালন করতে। ওর পাশে, ককপিটের কাঁচে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে রানা, চেষ্টা করছে সেসনাটাকে দেখতে।

'ফিরে আসছে ওরা,' হঠাৎ বলল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম নাড়ল অ্যাবি, একপাশের ডানায় ভর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল টুইন অটার। চকিতের জন্য নজরে পড়ল ওদের বাড়িটা। মন খারাপ হয়ে গেল প্রিয় ঘোড়াটার কথা ভেবে। ওটা এখনও রয়ে গেছে আস্তাবলে। ছেড়ে দিয়ে আসতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু এখন আর সে-সুযোগ নেই।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বিচ্ছিরি একটা ক্যাট ক্যাট শব্দ ভেসে এল পিছন দিক থেকে। পরক্ষণেই ভীষণভাবে কেঁপে উঠল গোটা ফিউজেলাজ। লোবো গর্জন করে উঠল রিয়ার কেবিন থেকে।

'ওরা গুলি করছে!' ভয়ার্ত গলায় বলে উঠলেন রিচার্ড।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যাবি। ডানদিকের ডানায়

অনেকগুলো গর্ত দেখা যাচ্ছে—গুলির আঘাত।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'গুলি লেগেছে ডানায়।'

'কিছু মনে কোরো না, অ্যাবি,' বলল রানা। 'ফ্লাইঙের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।' কো-পাইলটের কন্ট্রোলে হাত রাখল ও। 'তুমি বাইরে নজর রাখো। ঠিক আছে?'

অ্যাবি শুনেছে রানা অত্যন্ত ভাল পাইলট, যদিও সেটা দেখার সুযোগ হয়নি কোনোদিন। নিশ্চিন্তে রানার হাতে ছেড়ে দিল প্লেনের কন্ট্রোল।

থ্রটল পুরো সামনে ঠেলে দিল রানা, নাক উঁচু করল বিমানের। প্রায় খাড়া হবার ভঙ্গিতে দ্রুত উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। পিছন থেকে *ওহ্ গড* বলে গুঙিয়ে উঠলেন রিচার্ড।

'শক্ত করে সিটবেল্ট বাঁধুন সবাই,' রানা বলল।

অ্যাবি তখন ইতি-উতি বাইরে তাকাচ্ছে। সেসনাটাকে দেখতে পেল ক্ষণিকের জন্য। দিক পাল্টে ওদেরকে ধাওয়া করে আসছে ওটা।

প্রবল বেগে একটা পাহাড়সারি পেরিয়ে গেল টুইন অটার। ওপাশে একটা গিরিখাত দেখতে পাচ্ছে রানা। পাহাড়ের কিনারাগুলো খাড়া, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদী। একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ঝুঁকি আছে, কিন্তু এখন ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। পুরনো টুইন অটারের চেয়ে সেসনার গতি অনেক বেশি, কিছুতেই ওটাকে সুবিধাজনক পজিশনে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না।

দ্রুত ফ্ল্যাপ নামাল ও, থ্রটল টেনে ডাইভ দিল গিরিখাতের দিকে। মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য নিয়ে বিপজ্জনক বেগে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। পিছন থেকে আবারও গোঙানি ভেসে এল।

একেবারে নদীর উপরে এসে ইয়োক টানল রানা, লেভেল করে আনল বিমানকে। এখন পানির ধারা অনুসরণ করে

আঁকাবাঁকা পথে ছুটছে টুইন অটার। মাথা না ঘুরিয়েই জানতে চাইল, 'পিছনের ওরা কোথায়?'

'পিছনেই আছে, তবে বেশ খানিকটা উপরে,' অ্যাবি বলল। 'আমাদের মাথার উপরে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে।'

'পারবে না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। থ্রটল ঠেলে স্পিড বাড়াল বিমানের। গিরিখাতের মাঝ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে ছোটাচ্ছে আকাশযানটাকে। শাঁই শাঁই করে দু'পাশে সরে যাচ্ছে পাহাড়ি প্রাচীর।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠল ম্যাসন। 'নির্ঘাত মারা পড়ব। স্পিড কমান, মি. রানা।'

'সাহস রাখুন,' রানা বলল। 'এত সহজে মরছি না আমরা কেউই।'

কয়েক মিনিট ব্যর্থ চেষ্টা চালাল সেসনা ওদের উপরে পৌঁছুতে। কিন্তু লাভ না হওয়ায় ডাইভ দিল, নেমে আসছে গিরিখাতের ভিতরে।

'নামছে ওরা!' জানাল অ্যাবি।

'আসুক,' বলল রানা।

সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, এরপরেই রয়েছে ধাপে ধাপে জলপ্রপাত। পানির তীব্র গর্জনে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে কান, বাতাসে উড়তে থাকা জলকণা সৃষ্টি করেছে ঘন কুয়াশা, ওপাশে দৃষ্টি চলে না। সোজা সেদিকেই টুইন অটারকে নিয়ে গেল ও।

'গুড আইডিয়া!' প্রশংসার গলায় বলল অ্যাবি, রানার মতলব টের পেয়েছে। অ্যাবি নিজে খুবই ভাল পাইলট, কিন্তু রানার মত বেপরোয়া নয়। বিপদের কথা ভেবে বুক কাঁপছে ওর, তবে রানার দক্ষতা চাক্ষুষ করার সুযোগ হারাতে চায় না।

বিমানকে আরেকটু নামিয়ে আনল রানা। নদীর স্রোত, আর পানি ভেদ করে উঁচু হয়ে থাকা পাথরসারির মাত্র তিনফুট উপর

দিয়ে উড়ছে এখন টুইন অটার। নতুন একটা আওয়াজ হলো পিছন থেকে, যেন আতশবাজি ফাটাচ্ছে কেউ। আওয়াজের পিছু পিছু ছুটে এল এক পশলা বুলেট, নদীর পানি আর পাথরের গায়ে মাথা কুটল। একটু উপর থেকে ফায়ার করছে শত্রু।

'মেশিনগান, রানা!' অ্যাবি চেঁচাল।

একটা বুলেট রিকোশে করল বোল্ডারের গায়ে, আঘাত হানল টুইন অটারের সাইড উইণ্ডোতে। ফাটল ধরল কাঁচে। কিন্তু বিমান নড়াতে পারল না রানা। গিরিখাত সরু হয়ে এসেছে। যেন চোয়াল বন্ধ করছে অতিকায় কোনও দৈত্য। একটু এদিক-ওদিক হলেই আছড়ে পড়বে প্লেনটা পাহাড়ি প্রাচীরের গায়ে।

'মাথা নামিয়ে রাখুন সবাই!' নির্দেশ দিল ও।

আবারও গুলির আওয়াজ হলো, ধাতব শব্দ ভেসে এল পোর্ট সাইডের উইং থেকে। দ্বিতীয়বারের মত গুলি লেগেছে ডানায়। একটু ঝাঁকি খেলো বিমান, বাম দিকে পণ্টুন আছাড় খেলো পানির বুকে, পরমুহূর্তে আবার ড্রপ খাবার ভঙ্গিতে উঠে এল শূন্যে। সাবধানে বিমানকে লেভেল করল রানা, ঢুকে পড়ল ঘন কুয়াশায়। চারপাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সবকিছু, কানে ভেসে এল জলপ্রপাতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। উইণ্ডশিল্ড ঢাকা পড়ে গেছে গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায়, কিন্তু ওয়াইপার অন্ করল না রানা। তার প্রয়োজন নেই। জায়গাটা ওর চেনা।

কণ্ট্রোল কলাম সামনে ঠেলে দিল ও। গোঁত্তা খাবার ভঙ্গিতে ডাইভ দিল টুইন অটার। পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন, ভাবছে ক্র্যাশ করছে ওরা। অবস্থা অনেকটা সেরকমই। দুইশ' ফুট উঁচু জলপ্রপাতের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবল বেগে নামছে ওদের বিমান। কিছুদূর নামতেই পরিষ্কার হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড, কুয়াশা সরে গিয়ে দেখা গেল নীচের নদী—এক লাফে যেন উঠে আসছে ওদের দিকে। শেষ মুহূর্তে কণ্ট্রোল টানল রানা,

বিমানকে সিধে করে বাঁক নিল বাঁয়ে। পাহাড়ি প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে ছুটে চলল সামনের দিকে।

'আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম,' একটু ধাতস্থ হয়ে বলল ম্যাসন।

'রিল্যাক্স,' রানা বলল। 'ধরে নিন বেড়াতে এসেছেন।' বাইরে ইঙ্গিত করল। 'এটাই আমেরিকার কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইড। ব্রুকস্ রেঞ্জে এসেছেন অথচ কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইড দেখবেন না, তা কী করে হয়?'

ব্যাপারটা সম্পর্কে জানা আছে ম্যাসনের। কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডের মাধ্যমে জলপ্রবাহের দিক অনুসারে বিভক্ত হয়েছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ। এই ডিভাইডের একদিকের নদীগুলো মিশেছে আটলাণ্টিকে, অন্যদিকের নদীগুলো মিশেছে প্যাসিফিকে, আর উপরদিকেরগুলো মিশেছে আর্কটিক মহাসাগরে। ব্রুকস্ রেঞ্জ হয়ে গেছে এই ডিভাইড।

কথা শেষ করেই আবার ফ্লাইঙে মনোযোগ দিয়েছে রানা। মনে মনে প্রার্থনা করছে, কুয়াশার মেঘ ভেদ করে ধাওয়াকারীরা আসার আগেই যেন দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পারে। তা হলে কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডের শাখা-প্রশাখার ভিতরে হারিয়ে যেতে পারবে।

'সেসনাটাকে দেখতে পাচ্ছ?' অ্যাবিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' পিছনে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল অ্যাবি। 'ডাইভ দেয়নি, উপর থেকেই খুঁজছে আমাদেরকে।'

ভাল, মনে মনে ভাবল রানা। অত উপর থেকে ওদেরকে স্পট করতে সময় লাগবে সেসনার। হয়তো বা ফাঁকি দেয়া যাবে। কথা হলো সময় কতটা পাবে।

'চক্কর দিচ্ছে ওরা,' অ্যাবি জানাল।

কোর্স কারেকশন দিল রানা, পাহাড়ি প্রাচীরের পাশ থেকে

সরে এল, এগোল মাউন্টেইন রেঞ্জের গোড়ায় সৃষ্টি হওয়া একটা চওড়া উপত্যকা লক্ষ্য করে। জায়গাটা চেনে ও। অ্যালাট্না ভ্যালি। ওখান দিয়ে দক্ষিণে গেছে নদীর একটা শাখা। তবে দক্ষিণ বা উত্তরে নয়, নদীকে পিছনে ফেলে পশ্চিমদিকে চলল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?' হঠাৎ বলে উঠল অ্যাবি। 'আমাদের তো প্রুডো বে-তে যাবার কথা।'

'ওখানেই যাচ্ছি।'

'তা হলে উত্তরদিকে যাচ্ছ না কেন? অ্যালাট্না পেরিয়ে অ্যান্টিগান পাসের ভিতর দিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে নিরাপদ।'

'ওদিক দিয়ে বেশিদূর যেতে পারব না। অ্যান্টিগান পেরুলেই খোলা তুন্দ্রা। আমাদেরকে স্পট করে ফেলবে পিছনের ওরা।'

'কিন্তু...'

'যদি সন্দেহ থাকে, তা হলে নিজেই চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল অ্যাবি। 'ওকথা বলছি না। তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা আছে আমার।'

'গুড,' রানা বলল। 'তা হলে একটা কাজ করো। রেডিওতে চেষ্টা করে দেখো, কাউকে পাওয়া যায় কি না। কী ঘটছে এখানে, সেটা জানিয়ে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডফোন পরল অ্যাবি। স্যাটকম সেটের সুইচ অন্ করল—পাহাড়ি এলাকায় ওটাই যোগাযোগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টাল কয়েকবার, তারপর জানাল, 'স্ট্যাটিক ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না।'

'নিশ্চয়ই সোলার স্টর্মের প্রকোপ বেড়েছে,' অনুমান করল রানা।

'দাঁড়াও, নরমাল রেডিও অন্ করি। চ্যানেল ইলেভেনে বেটল্‌স্ বেসের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। রেঞ্জের মধ্যে আছি

আমরা।'

'গুড আইডিয়া।'

কয়েকবার ডাকাডাকি করল অ্যাবি, কিন্তু কোনও জবাব পেল না। বিরক্ত হয়ে খুলে ফেলল হেডফোন।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' পিছন থেকে বকের মত গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন, গলা কাঁপছে। নার্ভাসভাবে তাকাচ্ছে ফাটল ধরা জানালার দিকে। ওর মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না—গতকালই একদফা প্লেন-ক্র্যাশের শিকার হয়েছে বেচারা।

'বললে বুঝতে পারবেন?' রানা বলল তাকে। 'এই এলাকা চেনেন?'

মাথা নাড়ল ম্যাসন।

'তা হলে শুধু এটুকু জেনে রাখুন, পিছনের লেজটাকে খসাবার চেষ্টা করছি। কাভার দরকার আমাদের। এখনও আমরা বড্ড এক্সপোজড্ অবস্থায় আছি।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল অ্যাবি। ওর উদ্দেশ্য টের পেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'তুমি সিরিয়াস?'

রিচার্ডও বুঝতে পেরেছেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আশা করি অ্যারিগেচের কথা বলছ না?'

'দুঃখিত, ওখানেই যাচ্ছি,' বলল রানা।

'ওহ্ গড!' গোঙানির মত আওয়াজ করল অ্যাবি।

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' বোকা বোকা গলায় বলল ম্যাসন। 'অ্যারিগেচ আবার কোন্ জায়গা?'

'সাক্ষাৎ নরক,' জানাল তাকে অ্যাবি। 'প্লিজ, সিটবেল্ট শক্ত করে বাঁধুন।'

এগারো

আইসবোট নিয়ে বরফ প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে শ্যারন। বাতাসে ফুলে উঠেছে বারো-ফুটি পাল. ফাইবারগ্লাসের সিটে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে ও, দু'পা রেখেছে ফ্লোর প্যাডালে, এক হাতে ধরে রেখেছে জিব-লাইন। উদ্দাম গতিতে ছুটছে বাহনটা।

আশপাশে নজর বোলাচ্ছে শ্যারন ক্ষণে ক্ষণে। প্রাণের কোনও সাড়া নেই, চারপাশে শুভ্রতার রাজত্ব—অতিথিবিমুখ, রুক্ষ ও রূঢ়। এ যেন বরফের মরুভূমি। পার্থক্য কেবল এ-ই যে, এখানকার দৃশ্য অনেক বেশি সুন্দর। তীব্র বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে শ্বেতশুভ্র তুষার, একবিন্দু জঞ্জাল নেই কোনোখানে। প্রকৃতির অত্যাচারে অদ্ভুত আকৃতি পেয়েছে প্রেশার রিজগুলো—যেন সময় নিয়ে ভাস্কর্য বানিয়েছে কোনও আত্মভোলা শিল্পী।

প্যাডাল আর জিব-লাইনের সাহায্য নিয়ে এমনই একটা রিজকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ও—অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এক দশকের অভিজ্ঞতা আছে ওর আইস-সেইলিঙে। যে-বোটটা চালাচ্ছে, সেটা নিজেই বানিয়েছে ওর ছোট ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে। খোলটা ষোলো ফুট লম্বা, বাছাই করা সিটকা স্প্রুসের কাণ্ড কুঁদে বানানো। রানারগুলো টাইটেনিয়াম অ্যালয়ের। এই বোট নিয়ে কানাডার লেক ওটাচিতে ষাট মাইল পর্যন্ত স্পিড তুলেছে ও।

সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকাল শ্যারন, এখানে সেই রেকর্ড ভাঙার ভাল সুযোগ আছে। কিন্তু কপাল খারাপ, সময় নেই। আপাতত ট্রান্সপোর্টেশনের নামে সামান্য যেটুকু সময় সেইলিং করতে পারছে, সেটাই ঢের। স্টেশনের সহকর্মীরা তো এর ঘোর বিরোধী, ওকে স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরুবার জন্য বলে, যান্ত্রিক বাহনটা নাকি অনেক বেশি নিরাপদ। কিন্তু ওদের কথা কানে তোলে না শ্যারন। বরফের প্রান্তরে আইসবোট নিয়ে ঘোরা যে কত আনন্দের, ওরা তার কী জানে!

সত্যি বলতে কী, ওই সময়টার জন্য আর প্রতিবন্ধী থাকে না শ্যারন। সেইলিঙের সময় বাতাসের হিসহিসানি, বা চাকার ঘড়ঘড় শোনার প্রয়োজন নেই ওর। বোটের কাঁপুনি দেখে বুঝতে পারে গতি, উড়ন্ত তুষারকণা দেখে আঁচ করতে পারে বাতাসের দিক আর গতি-প্রকৃতি। নীরবে যেন গান গায় পৃথিবী ওর চারপাশে। ভুলে যায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কথাও, যেটা ওর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

এক রাতে দুনিয়া ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল ওর। মাতাল এক ড্রাইভারের কারণে ঘটেছিল রোড অ্যাকসিডেন্ট, ফেটে গিয়েছিল মাথার খুলি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত যখন জ্ঞান ফিরে পেল, তখন নিঃশব্দ হয়ে গেছে পৃথিবী। মস্তিষ্কের যে-অংশ শ্রবণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানকার নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে চিরতরে। কারও করুণা পেতে চায়নি শ্যারন, ঘৃণা করেছে সেই জীবনকে। তাই সুস্থ হবার পর যুদ্ধ করেছে স্বাবলম্বী হবার জন্য... কঠিন যুদ্ধ... কখনও যেন কারও সামনে মাথা নোয়াতে না হয়, কেউ যেন করুণার দৃষ্টিতে না তাকাতে পারে ওর দিকে। সফল হয়েছে তাতে, কিন্তু তাই বলে কি উন্নতি হয়েছে নিজের অবস্থার? দশ বছর কেটে গেছে ভয়ানক সেই দুর্ঘটনার পরে। এখন পরিষ্কারভাবে কথা বলার ক্ষমতা হারাতে শুরু করেছে ও। মুখ

খুললেই সামনের মানুষের চোখে বিভ্রান্তি লক্ষ করে, ওর জড়ানো কথা বুঝতে পারে না অনেকে, দু'বার-তিনবার করে বলতে হয় একই কথা। কোথায় সমস্যা, তা নিজে শুনতে পাচ্ছে না, তাই উচ্চারণটা ঠিক করে নেয়াও সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। হতাশা এড়াবার জন্য নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে পড়াশোনা আর গবেষণার কাজে। কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে মাথায় ঘুরতে থাকে নিজের অক্ষমতা। শুধু আইস-সেইলিঙে বেরুলেই মুক্তি মেলে সেটা থেকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এলোমেলো চিন্তা থেকে বাস্তবে ফিরে এল শ্যারন। মন দিল সেইলিঙে। প্যাডালে হালকা চাপ দিয়ে বাঁক নিল—এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। পুরনো আইস বেইসটাতে যাচ্ছে ও। আজ সকালেই বায়োলজি টিমের প্রধান ড. কেভিন কনওয়েরে জরুরি বার্তা পেয়েছে—নতুন একটা আবিষ্কার নিয়ে নাকি ঝামেলা দেখা দিয়েছে জিয়োলজি টিমের সঙ্গে, সেটা মিটমাট করার জন্য শ্যারনকে আইস বেইসে যেতে অনুরোধ করেছে সে।

ওমেগা স্টেশনের প্রধান হিসেবে প্রায়ই এ-ধরনের বিরোধে মধ্যস্থতা করতে হয়ে শ্যারনকে। বিরক্তিকর ব্যাপার, নামী-দামি বিজ্ঞানীরা ছেলেমানুষের মত আচরণ করে, কোনও কথা শুনতে চায় না। মাঝে মাঝে ব্যস্ততার অজুহাতে তাই এড়িয়ে চলে শ্যারন ঝগড়া মেটানোর দায়িত্ব। তবে আজ অনুরোধটা পেয়ে ভালই হয়েছে, ড্রিফট স্টেশনে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, সেইলিঙের সুযোগ পেয়ে গেছে। পুরনো বেইসটাও দেখা হয়ে যাবে একই সঙ্গে। লাঞ্চ সেরেই তাই বেরিয়ে পড়েছে আইসবোট নিয়ে।

একটু পরেই উঁচু রিজের চূড়ায় উড়তে থাকা লাল পতাকা চোখে পড়ল, বাতাসে পত পত করে উড়ছে। ওটাই মার্কিং, নীচে রয়েছে আইস বেইসে ঢোকার প্রবেশপথ। মার্কিং অবশ্য না

থাকলেও চলত, রিজের গোড়ায় এ-মুহূর্তে পার্ক করে রাখা হয়েছে চারটা স্কি-ডু আর দুটো স্নো-ক্যাট। ওগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রবেশপথের অবস্থান। পার্কিং এরিয়ার পরে আছে বিশাল এক টানেল, নেভির এক্সপ্লোরাররা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওখান দিয়ে উন্মুক্ত করেছে আইস বেইসে ঢোকার রাস্তা।

ব্রেক চেপে আইসবোটের গতি কমাতে শুরু করল শ্যারন। এণ্ট্রান্সের টানেলের দিকে তাকাতেই নিজের অজান্তে ছমছম করে উঠল গা। টানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম বাষ্প—জেনারেটরের উত্তাপে সৃষ্ট। মনে হচ্ছে যেন গরম নিঃশ্বাস ফেলছে অতিকায় কোনও দানব, টানেলটা ওটার মুখ-গহ্বর। ওদিকেই এগোচ্ছে ও। ওখানে গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে সারাক্ষণ, সেটাও জেনারেটরের কল্যাণে। কয়েকদিন আগেই আইস বেইসের পুরনো সবক'টা জেনারেটর মেরামত করে নিয়েছে টেকনিশিয়ানরা—দিনরাত চলছে ওগুলো, আলো এবং তাপ সরবরাহ করছে।

এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন, কিন্তু প্রথমবার যখন নেমেছিল, সে-অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। মেটাল ডিটেক্টর আর পোর্টেবল সোনারের সাহায্যে খুঁজে বের করা হয়েছিল বেইসের এণ্ট্রান্স। এরপর মেল্ট-চার্জ আর এক্সপ্লোসিভের মাধ্যমে তৈরি করা হয় টানেল। এণ্ট্রান্সটা বরফ আর মোটা স্টিলের পাত দিয়ে বন্ধ হওয়া অবস্থায় পায় ওরা। অ্যাসিটিলিন টর্চ ব্যবহার করতে হয়েছিল দরজাগুলো খোলার জন্য। পরের পর্বটা ছিল দুঃস্বপ্ন।

পাল গুটিয়ে ফেলল শ্যারন, ব্রেক চেপে গতি কমাল আইসবোটের। প্রেশার রিজের সারি পেরিয়ে ছোট্ট একটা উপত্যকার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। রিজের আড়ালে তৈরি করা হয়েছে একটা টেম্পোরারি মর্গ—বেইস থেকে উদ্ধার করা সমস্ত লাশ রাখা হয়েছে কমলা রঙের বড় এক স্টর্ম টেণ্টে।

অ্যাডমিরাল বেকেট জানিয়েছেন, মস্কো থেকে নাকি ইতিমধ্যেই একটা প্রতিনিধি-দল রওনা হয়েছে—আগামী সপ্তাহে লাশগুলো নিতে আসবে তারা। এ-ছাড়া বিষয়টা নিয়ে আর কোনও কথা বলছে না কেউ।

ফুট প্যাডাল ব্যবহার করে দক্ষভাবে স্টিয়ার করল শ্যারন, মেক-শিফট পার্কিং লটে পৌঁছে থামাল বাহন। তারপর ধীরে-সুস্থে নেমে এল। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কেউ আসেনি। কোমরে হাত রেখে চারপাশে চোখ বোলাল। বরফের পাহাড়-পর্বত আর অবারিত প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নেই আশপাশে। ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ে গেল ডিপআই সোনারে দেখা আকৃতিটার কথা। সত্যি সত্যি কোনও প্রাণী ছিল না তো ওটা? এখন পর্যন্ত অবশ্য তেমন কোনও আলামত পাওয়া যায়নি আইস-বেইসের ভিতরে বা চারদিকের এলাকায় জ্যান্ত কোনও কিছুর সন্ধান পায়নি ওরা।

দ্রুত পাল ভাঁজ করে ফেলল শ্যারন, ওটা রেখে দিল পাটাতনের নীচে। টেনে বোটটাকে নিয়ে গেল পার্কিং লট সংলগ্ন পাহাড়ি এক খোঁড়লের ভিতর, যাতে ঝড়-ঝাপটা এলে না লাগে ওটার গায়ে। একটা স্নো-অ্যাঙ্কর গেঁথে সেটার সঙ্গে বাঁধল বোটকে। এরপর বোটের ভিতর থেকে ওভারনাইট ব্যাগটা নিয়ে পা বাড়াল কুয়াশায় ঢাকা টানেলের দিকে।

গুহামুখটা বৈচিত্র্যহীন, তবে শ্যারন লক্ষ করল, আরও বড় করা হয়েছে ওটাকে। পুরো একটা স্নো-ক্যাট ঢুকিয়ে ফেলা যাবে এখান দিয়ে। মেঝেতে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে রাখা হয়েছে, সেগুলোয় সাবধানে পা রেখে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ও। খুব শীঘ্রি পৌঁছে গেল এন্ট্রান্সে। দরজার পাল্লাদুটো এখনও মেরামত করা হয়নি, কবজার সঙ্গে ঝুলছে অসহায়ভাবে। ফাঁকা ডোরওয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের কুণ্ডলী। ওখানে একটু দাঁড়াল শ্যারন, চোখ বোলাল দরজার উপরে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে

নামফলক... শেষবার যখন এসেছিল, তখন বরফে ঢাকা ছিল ওটা; টানেল বড় করবার সময় পাওয়া গেছে জিনিসটা।

ফলকটা পড়ল শ্যারন। রাশান অক্ষরে বড় বড় করে লেখা আছে বেইসের নাম:

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল

ভুরু কোঁচকাল তরুণী বিজ্ঞানী। এমন অদ্ভুত নাম দেবার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ কী আছে? বেউলফের উপকথা পড়েছে ও, গ্রেণ্ডেল নামের দানব সম্পর্কে জানে। কিন্তু সেটার সঙ্গে একটা গোপন গবেষণা কেন্দ্রের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, কিছু আঁচ করতে পারছে না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আগে বাড়ল শ্যারন। দরজার পাল্লা বরফে জমে জ্যাম হয়ে আছে, রীতিমত টানাহেঁচড়া করে ভিতরে ঢোকার মত জায়গা বের করতে হলো। ডোরওয়ে পেরুল হাঁপাতে হাঁপাতে। একটু থেমে দম নিল, তারপর পা বাড়াল সামনে।

চওড়া একটা হলওয়েতে পৌঁছে গেল ও খানিক পরেই। তরুণ এক রিসার্চারের দেখা মিলল ওখানে—হাঁটু গেড়ে একটা খোলা ইলেকট্রিকাল প্যানেলে কাজ করছে। আবছা আলোতেও চেনা গেল তাকে—মাইলস্ ফস্টার, নাসা থেকে এসেছে, ইঞ্জিনিয়ার। এ-মুহূর্তে স্রেফ একটা টি-শার্ট আর জিন্স পরে আছে সে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করল শ্যারন, বেইসের ভিতরটা অস্বাভাবিক রকমের গরম। ঘামতে শুরু করেছে ও।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফস্টার। কৃত্রিম ভয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'ওরে বাবা! ইয়েতি নাকি!!'

হেসে ফেলল শ্যারন। ভারী আর্কটিক গিয়ার আর পলিপ্রোপিলিন মাস্ক পরা অবস্থায় দানবের মতই লাগছে বটে ওকে। মাস্ক খুলে ফেলল ও, মাথা ঝাঁকাল, 'হাই, মাইলস্!'

'গ্রেণ্ডেল নামের উনুনে স্বাগতম, ড. বেকেট,' পাল্টা হাসি

দিয়ে বলল ফস্টার। বেশ খাটো সে, মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি। চেয়েছিল নভোচারী হতে, কিন্তু উচ্চতা কম বলে বাদ পড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছে নাসায়। আর্কটিকে এসেছে চরম শীতল তাপমাত্রায় নতুন কয়েক ধরনের সংকর ধাতুর প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে।

হুড নামিয়ে থারমাল সুটের চেইন খুলল শ্যারন। জিজ্ঞেস করল, 'এত গরম কেন এখানে?'

'সবার একই অভিযোগ,' বলল ফস্টার। 'আমি ওই নিয়েই কাজ করছি। বেশ ক'টা এয়ার পাম্প এনেছি এর মধ্যে, বাতাসের সার্কুলেশন ঠিক রাখার জন্য। তবে থার্মোস্ট্যাটের সমস্যাটা দ্রুত মেটাতে না পারলে পুরো বেইসটাই গলে পাহাড়ের গায়ে মিশে যাবে।'

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলতে চাইছ?'

একটু হাসল ফস্টার। বেইসের ধাতব দেয়ালে টোকা দিয়ে বলল, 'এখনও ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি। স্ট্রাকচারের পিছনে তিন ফুট পুরু ইনসুলেশন আছে। তাপ বাইরে যেতে দিচ্ছে না।' একটু প্রশংসা ফুটল তার কণ্ঠে। 'যারাই ডিজাইন করে থাকুক, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের ব্যাপারে ভাল জ্ঞান ছিল তাদের। অ্যাসবেস্টস মেশানো সিমেন্ট আর স্পঞ্জ ব্লকের ইণ্টারলকড্ লেয়ার দিয়ে বানিয়েছে ইনসুলেশন। মূল কাঠামোটা স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম আর সিরামিক কম্পোজিটের। হালকা, টেকসই, সময়ের চেয়ে অনেক উন্নত প্রযুক্তি। আমি তো বলব...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল শ্যারন। ওর কলিগদের নিয়ে এই এক সমস্যা। নিজের ফিল্ডের ব্যাপারে কিছু বলার সুযোগ পেলে রীতিমত লেকচার শুরু করে দেয়। লম্বা, বিরক্তিকর। কাঠখোট্টা গলায় ও বলল, 'কিছু মনে কোরো না, মাইলস্। ড. কনওয়েের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি। ওঁকে কোথায় পাওয়া

যাবে, বলতে পারো?'

'ড. কনওয়ে?' কাঁধ ঝাঁকাল ফস্টার। 'স্নেক পিটে খোঁজ নিয়ে দেখুন। সেই সক্কাল বেলা ওঁকে ঢুকতে দেখেছি ওখানে। কী নিয়ে যেন খিটিমিটি লেগেছে জিয়োলজি টিমের সঙ্গে, ওদেরকে ঢুকতে দিচ্ছেন না ওখানে। কান পাতলে সম্ভবত এখান থেকেও দু'দলের চেঁচামেচি শোনা যাবে।'

'ধন্যবাদ। তুমি কাজ করো, আমি যাই।'

ফস্টারকে পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল শ্যারন। বেইসটা বৃত্তাকার পাঁচটা লেভেলের সমন্বয়ে গঠিত, এক লেভেল থেকে আরেক লেভেলে যেতে হয় মাঝখানের সরু স্টেয়ারকেস দিয়ে। প্রত্যেক লেভেলের লে-আউট মোটামুটি একই রকম—মাঝখানে কমিউনাল স্পেস, চারদিকে সারি সারি কক্ষ। পার্থক্য হলো, উপরের লেভেল থেকে নীচের লেভেলের আয়তন কম।

সারফেসের কাছাকাছি লেভেলটা সবচেয়ে বড়, প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া। ওখানে রয়েছে লিভিং কোয়ার্টার, ব্যারাক, কিচেন, ডাইনিং হল আর কয়েকটা অফিস। করিডোর ধরে মাঝখানের ফাঁকা অংশে চলে এল শ্যারন, ওখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো টেবিল-চেয়ার... এখানেই এককালে খাওয়াদাওয়া করত বেইসের রাশান ক্রু-রা। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরাও করছে।

একটা টেবিল দখল করে বসে থাকা দু'জন রিসার্চারের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝোঁকাল শ্যারন, তারপর প্যাঁচানো সেণ্ট্রাল স্টেয়ারকেস ধরে নামতে শুরু করল নীচে। সিঁড়িটা দশফুট চওড়া একটা শাফটের ভিতর দিয়ে নেমেছে। সিঁড়ি ছাড়াও এই শাফটে রয়েছে চারটে কেইবল, ওগুলোর সাহায্যে একটা লোহার খাঁচা তুলে আনা যায় একেবারে নীচের লেভেল থেকে। পুরনো আমলের কার্গো এলিভেটর আর কী।

নামতে নামতে পায়ের তলায় কম্পন অনুভব করল শ্যারন।

জেনারেটর আর নানা ধরনের মেশিনারির ভাইব্রেশনের কারণে কাঁপছে ধাপগুলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো ওর—মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ শীতনিদ্রা শেষে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এই বরফের দুর্গ।

একে একে দুই আর তিন নম্বর লেভেল পেরুল শ্যারন। এই দুটো লেভেলে রয়েছে নানা রকম রিসার্চ ল্যাব আর বেইসের ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাণ্ট। আরও দুটো লেভেল আছে এর পরে। একদম নীচেরটা হলো ডকিং স্টেশন, ওখানে একটা সাবমেরিন এখন বরফে জমাট বেঁধে আটকা পড়ে আছে। ওটারই অংশবিশেষ দেখেছিল ওরা সেদিন পোলার সেণ্টিনেল থেকে।

তবে শ্যারনের গন্তব্য হলো চার নম্বর লেভেল, ওটা বাকি সব লেভেলের চেয়ে একেবারেই ব্যতিক্রম। সেণ্ট্রাল কমিউনাল স্পেস নেই, সিঁড়ি থেকে নামলেই একটা বদ্ধ হলঘর; চারদিকে অন্যান্য লেভেলের মত অসংখ্য দরজা চোখে পড়ে না, তার বদলে নজরে পড়ে মাত্র দুটো ভারী স্টিলের দরজা। একটা দিয়ে যাওয়া যায় বেইসের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাকৃতিক টানেল নেটওয়ার্কে, অন্যটার পিছনে রয়েছে বিশেষ সেই কক্ষ... যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সবার জন্য, বসানো হয়েছে সার্বক্ষণিক পাহারা। এ-মুহূর্তে দু'জন অস্ত্রধারী নাবিককে দেখা যাচ্ছে দরজাটার সামনে, এরা নেভির লোক... একজন পেটি অফিসার, অন্যজন সেকেণ্ড গ্রেডের সেইলর।

শ্যারনকে দেখতে পেয়েই হাসল পেটি অফিসার। 'গুড আফটারনুন, ড. বেকেট!'

'গুড আফটারনুন,' পাল্টা জবাব দিল শ্যারন। 'ড. কনওয়েকে দেখেছেন আপনারা?'

'জী, ম্যাম। আপনি আসবেন বলে জানিয়েছেন উনি আমাদেরকে। তার আগ পর্যন্ত সবাইকে স্নেক পিট থেকে দূরে

সরিয়ে রাখার অনুরোধ করেছেন। ওখানেই আছেন ভদ্রলোক।'

পেটি অফিসারের ইশারায় কামরার অন্যপ্রান্তের দরজাটার দিকে তাকাল শ্যারন। ওপারে রয়েছে প্রাকৃতিক গুহা আর সুড়ঙ্গের এক জটিল গোলকধাঁধা। রিসার্চাররা ঠাট্টা করে এরই নাম দিয়েছে স্নেক পিট, মানে সাপের গুহা। জিয়োলজিস্ট আর গ্লেসিয়োলজিস্টদের জন্য স্বর্গরাজ্য। ওই টানেল নেটওয়ার্কের কারণে বরফের এত গভীর থেকেও সহজে স্যাম্পল সংগ্রহ করতে পারছে ওরা, মাপতে পারছে তাপমাত্রা, করতে পারছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হাজার হোক, ক'জনেরই বা সৌভাগ্য হয় একটা হিমশৈল-র পেটের ভিতরে ঘুরে বেড়াবার! শ্যারন শুনেছে, ইতিমধ্যে প্রাচীন প্রস্তর আর টেরেস্ট্রিয়াল ডেব্রি-র বড়সড় একটা সংগ্রহ পাওয়া গেছে ওখানে। সে-জন্যে পুরো জিয়োলজি টিমকে রিলোকেট করা হয়েছে গ্রেগুলে। কিন্তু এর মধ্যে বায়োলজিস্টদের সঙ্গে ঝামেলার কী সম্পর্ক?

'ধন্যবাদ,' বলে দরজাটার দিকে হাঁটতে শুরু করল শ্যারন। মনে মনে স্বস্তিও অনুভব করছে বন্ধ দরজাটার কাছ থেকে দূরে সরতে পেরে। ওখানে কী আছে, তা ভাবলেই শিউরে উঠছে শরীর। সমস্যা হলো, ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই।

লেভেল ফোর নিয়ে ইতিমধ্যে গুজব আর কানাকানি শুরু হয়েছে রিসার্চারদের মাঝে। কল্পনার সাগরে ভেলা ভাসিয়েছে সবাই। কেউ বলছে, ভিনগ্রহবাসীদের স্পেসশিপ আছে ওখানে, কেউ বলছে ভয়ঙ্কর কোনও বোমা, কেউ বা ভাবছে বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের নিদর্শন লুকিয়ে আছে বন্ধ দরজার ওপাশে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন, সত্যটা ওদের কল্পনারও বাইরে।

স্নেক পিটে যাবার দরজার সামনে পৌঁছুল ও, সঙ্গে সঙ্গে খুলে

গেল পাল্লা। একটু হকচকিয়ে গেল। হলুদ পারকা পরা বিশালদেহী একজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে শৈত্যের একটা প্রবাহ—বিশাল বরফদ্বীপের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা নিশ্বাস! ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল শ্যারন।

'ড. বেকেট!' একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন মানুষটা। তাড়াতাড়ি হুড খুলে উন্মুক্ত করলেন চেহারা। ড. কেভিন কনওয়ে, হার্ভার্ড বায়োলজিস্ট, পঞ্চাশের কোঠায় বয়স। 'আপনি চলে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ড. কনওয়ে,' মৃদু হেসে বলল শ্যারন। থারমাল সুটের চেইন আটকাল। ঠাণ্ডা বাতাস যেন হাড্ডিমজ্জায় আঘাত হানছে।

'সরি, এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন ভাবিনি,' বললেন কনওয়ে। হাত বোলালেন মাথার মস্ত বড় টাকে। চুলের অভাব পূরণ করেছেন ভারী গোঁফ-দাড়ি রেখে। থুতনি চুলকালেন। 'ভেবেছিলাম উপর থেকেই রিসিভ করব আপনাকে।'

'রাখুন তো ওসব। কী হয়েছে সেটাই বলুন। আমাকে খবর দিয়েছেন কেন?'

চকিতে পিছনটা দেখে নিলেন কনওয়ে। 'আ... আমি একটা জিনিস পেয়েছি। খুবই অদ্ভুত... আসুন আপনাকে...'

ঘুরে গেছেন ভদ্রলোক, ঠোঁট দেখা না যাওয়ায় কথার শেষটুকু বুঝতে পারল না শ্যারন। ডাকল, 'ড. কনওয়ে?'

ওর দিকে তাকালেন কনওয়ে। চোখে জিজ্ঞাসা। ইশারায় নিজের ঠোঁট দেখাল শ্যারন।

'ওহ্, সরি,' তাড়াতাড়ি বললেন কনওয়ে। তারপর ওর দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বললেন কথা। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, নিজ চোখে দেখতে হবে আপনাকে। সেজন্যেই খবর পাঠিয়েছি।' নেভির প্রহরীদের দিকে ইশারা করলেন। 'ওদের সাহায্য নিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি জিয়োলজিস্টদের ওই

পাথর-কুড়ানি দলটাকে। ভিতরে গেলেই সব বুঝতে পারবেন। আমার ক্লেইম কতখানি ইম্পরট্যান্ট, সেটা টের পাবেন। স্পেসিমেনগুলো...' কথা শেষ করলেন না তিনি। পিঠ খাড়া করলেন। 'ভিতরে খুব ঠাণ্ডা। দাঁড়ান, একটা পারকা এনে দিচ্ছি আপনাকে।'

'দরকার নেই,' বাধা দিল শ্যারন। 'আমার থারমাল সুটই যথেষ্ট। চলুন কী দেখাবেন।'

হালকা এক টুকরো হাসি ফুটল বায়োলজিস্টের ঠোঁটে। 'আমি যা পেয়েছি, সেটাই সবকিছুর মূল... অন্তত আমার মতে! মনে তো হয়, ওটার কারণেই তৈরি করা হয়েছিল এই বেইস।'

হেঁয়ালির মত লাগল কথাটা। 'কী! কীসের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'আসুন আমার সঙ্গে।' উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন কনওয়ে।

তাঁকে অনুসরণ করবার আগে পিছনে একবার তাকাল শ্যারন। নিশ্চয়ই ভুল করছেন ভদ্রলোক। এই রিসার্চ স্টেশন তৈরির পিছনে মূল কারণ তো লুকিয়ে আছে ওই বন্ধ দরজার ওপাশে! তা হলে কীসের কথা বলছেন কনওয়ে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বায়োলজিস্টের পিছু নিল ও।

বারো

গভীর মনোযোগে বিমান চালাচ্ছে রানা। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে উদয় হয়েছে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর্কটিক ন্যাশনাল

পার্কের এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর দলে দলে হাজির হয় হাজারে হাজার হাইকার, ক্লাইম্বার আর অ্যাডভেঞ্চারার। কিন্তু এ-মুহূর্তে প্রকৃতির দিকে মনোযোগ নেই রানার।

সামনেই দেখা যাচ্ছে অ্যারিগেচ পিকস্। স্থানীয় ভাষায় অ্যারিগেচের অর্থ: উপর দিকে খাড়া করে রাখা হাতের আঙুল। নামটার সঙ্গে প্রচুর মিল আছে জায়গাটার। বিশাল একটা এলাকা জুড়ে মাথা তুলে রেখেছে পর্বতমালার অসংখ্য চূড়া। হাজার ফুট উঁচু পাহাড়-প্রাচীর, টলমলে ওভারহ্যাং আর গ্লেশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারের দেখা মিলবে ওখানে। ক্লাইম্বারদের জন্য আদর্শ চ্যালেঞ্জ, হাইকাররাও উপভোগ করে প্রকৃতির এই নগ্ন, আদিম রূপ।

কিন্তু অ্যারিগেচের ভিতর দিয়ে বিমান চালনা আসলেই পাগলামির নামান্তর। সংকীর্ণ গিরিখাতগুলোই একমাত্র সমস্যা নয়, রয়েছে বাতাসের তীব্র আগ্রাসনও। প্রমত্তা নদীর স্রোতের মত শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিত চায় সবকিছু। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে বালিকণা আর গাছের লতাপাতা-সহ হরেক রকমের জিনিস। অবশ্য ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না রানা।

'তৈরি হও সবাই!' একটু পর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল ও।

পর্বতমালার ভিতরে ঢুকে পড়ল টুইন অটার। যেদিকে চোখ যায়, আকাশছোঁয়া পাহাড়... ঢালের উপর জমাট বাঁধা বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যকিরণ। গোলকধাঁধার চেয়েও জটিল। হঠাৎ দেখায় মনে হয়, এর মাঝ দিয়ে এগোবার কোনও পথ নেই।

শরীর বাঁকিয়ে পিছনে তাকাল অ্যাবি। সেসনাটা দূরত্ব কমিয়ে এনেছে, মাত্র সিকি মাইল পিছনে রয়েছে ওরা। পাহাড়ি গোলকধাঁধার ভিতরেও ধাওয়া চালিয়ে যাবে কি না, সেটাই

প্রশ্ন।

নীচে কুলুকুলু আওয়াজ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে দুরন্ত-গতি পাহাড়ি ঝর্ণা। পাহাড়ি ঢালে দেখা যাচ্ছে গাছপালার সারি, কিছুদূর উঠে থেমে গেছে তাদের বিস্তার। উপরে পাহাড়চূড়াগুলো বরফের টোপর পরা—যেন পক্বকেশ বৃদ্ধ।

রানার দিকে ফিরল অ্যাবি, ভাবল ওকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তটা পাল্টাবার জন্য আরেকবার অনুরোধ করবে কি না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালি যুবকের চেহারায় অখণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। বোঝা যাচ্ছে, ঝুঁকিটা নেবেই ও। এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই।

পিছন থেকে রিচার্ড ম্যানিটকের কণ্ঠ শোনা গেল। সিট হারনেসের সঙ্গে লোবোর কলার আটকে দিয়েছেন তিনি। বললেন, 'আমরা রেডি।'

'গুড,' রানা জবাব দিল।

বৃদ্ধ ইনুইটের পাশে বসে আছে ম্যাসন, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কোনও কথা বলল না। অ্যারিগেচ পিকসের চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। নীচ থেকে এ-দৃশ্য মোহনীয়, কিন্তু আকাশ থেকে ভীতিপ্রদই নয়, স্রেফ আতঙ্ককর।

নিচু একটা ঢাল পেরিয়ে গেল টুইন অটার, এবার শুরু হচ্ছে কঠিন এলাকা।

'অ্যারিগেচে ঢুকলাম আমরা,' জানিয়ে দিল রানা।

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বুলেটবৃষ্টির পরিচিত আওয়াজ। একটু কাত হয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল রানা, ব্যর্থ বুলেটগুলো মাথা কুটল পাহাড়ি ঢালে। সেসনা এখনও নিখুঁত শট নেবার মত দূরত্বে পৌঁছায়নি। নিশ্চয়ই পাহাড়ি গোলকধাঁধায় শিকারকে ঢুকে পড়তে দেখে আগুপিছু না ভেবে গুলি চালাতে শুরু করেছে।

পিছনে তাকাল অ্যাবি, সেসনার একটা জানালায় আগুনের ঝলকানি দেখল। শব্দ শোনা গেল না, তবে কী ছোঁড়া হয়েছে, তা বোঝা গেল পরিষ্কার—গ্রেনেড। ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটে এল ওটা, তবে টুইন অটারের দশ গজ পিছনে থাকতেই গতি হারাল, খসে পড়ল নীচে। শোনা গেল বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। পাহাড়ি ঢালে ছিটকে উঠল বরফ আর পাথরকুচি।

কন্ট্রোল কলাম নাড়ল রানা। একপাশের ডানায় ভর দিয়ে প্রায় খাড়া করে ফেলল বিমানকে। দুটো চূড়ার মাঝখানের সংক্ষিপ্ত একটা ফাঁকের দিকে ছুটে যাচ্ছে, এভাবে না গেলে জায়গা হবে না বিমানের। দম আটকে এল অ্যাবির, পিছন থেকে শোনা গেল ম্যাসনের ভয়ার্ত গলা।

'ওহ্ মাই গড... ওহ্ মাই গড...'

একমনে ঈশ্বরকে ডাকছে বেচারা।

নিরাপদে ফাঁকটা পেরিয়ে গেল বিমান, সাবধানে ওটাকে লেভেলে নিয়ে এল রানা। আকাশ এবার অদৃশ্য হয়েছে সামনে থেকে, উইণ্ডশিল্ডের ওপারে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি দেয়াল আর অলিগলির মত গিরিখাত ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঠিক যেন এক গোলকধাঁধা।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রথমবারের মত হামলা চালাল দমকা হাওয়া। বাতাসের অদৃশ্য প্রাচীরে ধাক্কা খেলো বিমান, প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো ফিউজেলাজ। মাথা ঝন ঝন করে উঠল আরোহীদের। কোনোমতে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ভয়াবহ টার্বিউলেন্সের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল রানা। ডানে-বাঁয়ে ডানা নামিয়ে-উঠিয়ে ঝাঁকুনি কমিয়ে আনল।

বিশাল এক ক্লিফ ফেস আর তার গায়ে ঠেস দিয়ে থাকা পাথরের কলামের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল টুইন অটার। আতঙ্কে

আর্মরেস্ট খামচে ধরল অ্যাবি। সামনের সিটে বসায় প্রতিটা বিপদের খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ক্লিফ ফেসটা পেরুতে না পেরুতে উদয় হলো একটা পাহাড়চূড়া, ঠিক ওদের পথের মাঝখানে।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রানার চেহারায়, ঝড়ের বেগে বিমানকে রোল করালো ও, নিপুণভাবে পাশ কাটাল চূড়াটাকে। পরের পাঁচ মিনিটে আরও খেলা দেখাতে হলো ওকে—আঁকাবাঁকা গিরিখাতের ভিতরে সার্কাস খেলোয়াড়ের মত দৌড়ঝাঁপ আর ডিগবাজি দিতে হলো বিমান নিয়ে।

যাত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, চেঁচাতেও ভুলে গেছে সবাই। অ্যাবির পেট মোচড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে বমি করে দেবে যে-কোনও মুহূর্তে। মনোযোগ ফেরানোর জন্য পিছনে তাকাল, খুঁজল সেসনাটাকে। কিন্তু নেই ওটা। গায়েব হয়ে গেছে। পাথুরে এই গোলকধাঁধা থেকে বের হবার হাজারটা পথ আছে... যদি একবার হারিয়ে ফেলে, খুঁজে পাবে না আর। ওদেরকে বাগে পেতে হলে পিছু পিছু আসতেই হবে বিমানটাকে। গেল কোথায়? হাল ছেড়ে দিয়েছে?

চওড়া একটা গ্লেশাল সার্ক-এ ঢুকেছে ততক্ষণে টুইন অটার। বিশাল একটা খোঁড়লের মত জায়গা, পাহাড়ের শরীর ক্ষয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে। সার্কের ভিতর দিয়ে বিমানকে ঘুরিয়ে আনল রানা, দুই পাহাড়ের মাঝ গলে বেরিয়ে এল বড়সড় একটা লেকের উপরে। স্বচ্ছ পানিতে ঝিলমিল করছে সকালের রোদ, উপরে খোলা আকাশ। চারদিকে খাড়া পাহাড়প্রাচীর, অন্তত দু'হাজার ফুট উঁচু। সরাসরি ওঠা যাবে না উপরে। তাই প্রাচীর ঘেঁষে পাক খেতে শুরু করল, ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়াচ্ছে, খোলা আকাশে পৌঁছুলেই মুক্তি পাবে অ্যারিগেচের গোলকধাঁধা থেকে।

হঠাৎ একটা প্রতিবিম্ব দেখতে পেল অ্যাবি পানির বুকে। আরেকটা বিমান! ঝট্ করে নীচে তাকাল, তীব্রবেগে উপত্যকায় প্রবেশ করেছে সেসনাটা। ওদের অনুসরণ করে নয়, পাহাড়ের আরেক পাশ থেকে। নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছিল। কপালজোরে খুঁজে পেয়েছে এই উপত্যকা... স্রেফ কপাল!

'রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবি।

রানাও দেখতে পেয়েছে। মাথা নেড়ে বলল, 'এখনও ক্লিফ পেরুনোর মত উচ্চতায় পৌঁছুইনি। কিচ্ছু করার নেই। একটু অপেক্ষা করো।'

সেসনাও চক্কর দিতে শুরু করল উপত্যকার ভিতর। ওদের মতই উচ্চতা বাড়াচ্ছে। কিন্তু গতি বেশি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত উঠে আসছে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল টুইন অটারের আরোহীরা।

দুই বিমানের মধ্যকার দূরত্ব সত্তর গজে পৌঁছুতেই সেসনার একটা দরজা খুলে যেতে দেখল অ্যাবি। কাঁধে গ্রেনেড লঞ্চার ঠেকিয়ে সাদা পারকা পরা লোকটা আবার শরীর বের করল ওখান দিয়ে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল অ্যাবি। 'আবার গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছে ওরা, রানা।'

চকিতে চারপাশ দেখে নিল রানা। পাহাড়ের মাত্র অর্ধেকটা উঠে এসেছে ওরা, বাকিটুকু পেরুনোর সময় নেই। একটাই কাজ করা যেতে পারে কেবল।

'হোল্ড অন,' বলল ও। 'অ্যারিগেচে আবার নামছি আমরা।'

'হোয়াট!' আঁতকে উঠল ম্যাসন।

'আর কোনও উপায় নেই,' রানা বলল। একটু নামাল বিমানের নাক। বাঁক নিয়ে এবার নীচের দিকে নামছে টুইন অটার। 'অ্যাবি, একটু ডাইভারশন দরকার আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, খুলে ফেলল সিটবেল্ট। পিছনের কেবিন থেকে শটগান আনার সময় নেই, তাই হাত চালাল সিটের তলায়, বের করে আনল একটা ফ্লেয়ার গান। দ্রুত একটা কার্টিজ লোড করল ওতে। তারপর খুলে ফেলল জানালার কাঁচ। পাগলা হাওয়া হামলে পড়ল বিমানের ভিতর, কেঁপে উঠল ফিউজেলাজ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ঝাঁকুনিটা সামাল দিল রানা, কিন্তু কণ্ট্রোল কলাম স্থির রাখতে গিয়ে ওর দুই হাত কাঁপছে থর থর করে।

'কী করছিস তুই, অ্যাবি?' রিচার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোবো।

'প্লিজ, আমার মনোযোগ নষ্ট কোরো না।' জানালা দিয়ে ফ্লেয়ার গান ধরা হাত প্রসারিত করে দিয়েছে অ্যাবি, চেষ্টা করছে সেসনার দিকে লক্ষ্য তাক করতে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই লাইন অভ সাইটে পাওয়া গেল টার্গেটিকে। পারকা পরা লোকটা তখনও কসরত করছে ভারী গ্রেনেড লঞ্চারটা ওদের দিকে তাক করতে। লোকটাকে নিশানা করল অ্যাবি, টিপে দিল ট্রিগার।

মৃদু আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল ফ্লেয়ার। বাতাসের তোড়ে সরে গেল খানিকটা, আছড়ে পড়ল সেসনার উইণ্ডশিল্ডে, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে। ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল সেসনার পাইলট, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাত হয়ে গেল বিমানটা। সঙ্গে সঙ্গে তাল হারাল পারকা পরা লোকটা। খোলা দরজা দিয়ে আকাশে ডানা মেলল সে, কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, তালগোল পাকিয়ে তাকে নীচে পড়ে যেতে দেখল অ্যাবি। হাত থেকে ছুটে গেছে গ্রেনেড লঞ্চার।

নির্বিকার রইল অ্যাবি। তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচ আটকাল, বেঁধে ফেলল সিটবেল্ট। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গো!'

প্রায় খাড়াভাবে টুইন অটার নিয়ে ডাইভ দিল রানা, চোখের পলকে পেরিয়ে এল পাক খেতে থাকা সেস্নাকে, ওটার নীচে পৌঁছে আবার লেভেল করল বিমান। ফুরসত পেয়ে তাকাল বান্ধবীর দিকে। প্রশংসার সুরে বলল, 'নাইস শট!'

'কীসের নাইস শট?' মুখ ঝামটা দিল অ্যাবি। 'ঝড়ে বক... আর কিছু না।' হাসল কথাটা বলে।

শরীর ঘুরিয়ে জানালার বাইরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ম্যাসন। হঠাৎ বলল, 'ওরা ফিরে আসছে।'

'ধ্যাত্তেরি,' খেদ প্রকাশ পেল রানার গলায়, 'আরও সময় পাব ভেবেছিলাম।'

'কী করবে এখন?' জানতে চাইল অ্যাবি।

'দেখোই না!'

এক ডানায় ভর করে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল টুইন অটার। কয়েক সেকেণ্ড পর যখন সিধে হলো, তখন সামনে একটা পাথুরে কলাম দেখতে পেল অ্যাবি। ওটার দিকে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে ওদের বিমান।

'ওহ্ নো!' ফিসফিসিয়ে উঠল ও।

'ওহ্ ইয়েস!' একই সুরে বলল রানা, তারপরেই আচমকা ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে নামিয়ে আনল বিমানের নাক, লেকের পানির কয়েক ফুট উপরে পৌঁছে আবার সোজা হলো। টুইন অটার এখন পানি ছুঁই ছুঁই অবস্থায় ছুটছে পাথুরে প্রাচীরের গোড়ার একটা অন্ধকার টানেলের দিকে। কয়েক হাজার বছর আগে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ওই টানেলের। নদী হয়ে লেকের পানি বইছে টানেলের ভিতর দিয়ে। জায়গাটা রানার চেনা।

'রানা, ওটা ডেভিলস্ পাস!' আতঙ্কিত গলায় বলল অ্যাবি।

'জানি।' শান্ত গলায় বলল রানা। সাবধানে টানেলের মুখের

সঙ্গে অ্যালাইন করে আনল বিমানকে, থ্রটল কমাল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ডেভিলস্ পাসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল টুইন অটার।

চোখের পলকে আঁধার হয়ে গেল দুনিয়া, ইঞ্জিনের আওয়াজ গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলল টানেলের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে। চারপাশে কিচ্ছু দেখা যায় না, শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আলোর আবছা আভা। টানেলের আরেক মুখ ওটা, ওদিক লক্ষ্য করে বিমানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

'সেসনাটা এসে গেছে,' একটু পরেই জানাল অ্যাবি।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। পিছনের পাইলট কম সেয়ানা নয়, প্রতিটা পদক্ষেপ অনুকরণ করছে নিখুঁতভাবে। প্রমাদ গুনল, এই টানেল থেকে বের হলে বড় ধরনের আর কোনও বিপত্তি নেই অ্যারিগেচের অলি-গলিতে। ওখানে কিছুতেই খসানো যাবে না ওদেরকে। যা করার করতে হবে এখানেই!

'শক্ত হয়ে বসো তোমরা,' বলল ও।

'আর কত শক্ত হব, বরফের মত জমে গেছি!' বলল অ্যাবি। তারপর স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল, 'এবার আবার কী করতে চাইছ?'

জবাব না দিয়ে আরও একটু নীচে নামাল রানা বিমান। তলার ফ্লোটগুলো পানির বুকে বাড়ি খাচ্ছে এর ফলে। পিংপং বলে মত লাফিয়ে উঠছে চাইল বিমান, কিন্তু শক্ত হাতে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করল রানা। ফ্লোটের সঙ্গে পানির সংঘর্ষের আওয়াজ শোনা গেল। পিছনে যেন ফোয়ারা ছুটল। একেবারে টানেলের শেষ মাথা পর্যন্ত এ-কাজ করল রানা, তারপর উঠে এল উপরে।

শাঁই করে খোলা একটা ময়দানে বেরিয়ে এল টুইন অটার। উচ্চতা বাড়িয়ে চক্কর শুরু করল রানা, নজর দিল টানেলের মুখের দিকে। পরক্ষণেই হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। বেরিয়ে এসেছে

সেসনা, তবে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। টুইন অটারের সৃষ্ট ব্যাকওয়াশ আঘাত হেনেছে ওটার ডানা আর প্রপেলারে, সংকীর্ণ টানেলে কিছুতেই সে-ধাক্কা এড়াতে পারেনি পাইলট, ড্রিফট করে ঘষা খেয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। ডানা ভেঙে গেছে, বোঁচা হয়ে গেছে নাক, কাঁচগুলো ভেঙে চুরমার। টানেল থেকে বেরিয়েই ময়দানের উপর আছাড় খেলো বিমানটা। স্থির হয়ে গেল কয়েক গড়ান দিয়ে।

'দেখালে বটে!' নিখাদ প্রশংসা বেরুল অ্যাবির মুখ দিয়ে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পিছনে লেগে থাকা লোকজন একদমই পছন্দ করি না আমি।'

তেরো

রাশান আইস স্টেশনের সঙ্গে লাগোয়া স্নেক পিট আসলে প্রাগৈতিহাসিক বরফ-গুহা আর সুড়ঙ্গের সমষ্টি। দরজা পেরিয়ে ওখানে ঢুকতেই শ্যারনের মনে হলো, আরেক জগতে পদার্পণ করল ও। মানুষের তৈরি কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই ওখানে, সব ফেলে এসেছে স্নেক পিটে যাবার দরজার ওপাশে।

দরজা পেরুলেই মোটামুটি খোলা একটা জায়গা, সেখানে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে পুরনো জং-ধরা লোহার তাল, কংক্রিটের বস্তা, নানা ধরনের ওয়্যারের রোল, ইত্যাদি। জায়গাটা আবিষ্কারের পর এসব দেখে সবাই ভেবেছিল, বোধহয় স্টোরেজ এরিয়া

হিসেবে টানেলগুলোকে ব্যবহার করত রাশানরা। নাসার একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ধারণা, পুরো বেইসই আসলে বানানো হয়েছে এই টানেল নেটওয়ার্কের ভিতরে, তাতে খোঁড়াখুঁড়ি কম করতে হয়েছিল নির্মাতাদের। তার মতে, স্নেক পিটের টানেলগুলো সেই মূল নেটওয়ার্কের উচ্ছিষ্ট, অব্যবহৃত অংশ।

অবশ্য এসব অলস থিয়োরির বাইরে স্নেক পিটের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ নেই ওমেগা-র বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর। শুধু জিয়োলজিস্ট আর গ্লেসিয়োলজিস্টরাই কাজ করছে টানেলগুলোর ভিতরে। ওদের সমস্ত কাজকর্মই বরফ আর পাথর নিয়ে। বায়োলজিস্টরা এর ভিতরে কী এমন আবিষ্কার করে বসল, ভেবে পাচ্ছে না শ্যারন।

'এদিকে আসুন,' বললেন কনওয়ে। পারকার চেইন গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন তিনি, মাথার টাক ঢেকেছেন হুড দিয়ে। টানেলের ভিতরে ভীষণ ঠাণ্ডা। একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে তাক করলেন খোলা জায়গার ওপারে হাঁ করে থাকা কতগুলো গুহামুখের দিকে। একটা লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করেছেন। নীরবে তাঁকে অনুসরণ করল শ্যারন।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না, টানেলের মেঝেতে বালি ছিটিয়েছে জিয়োলজিস্টরা, যাতে পা না পিছলায় কারও। সমস্যা শুধু তাপমাত্রা নিয়ে। যত এগোচ্ছে, ততই আরও ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে বাতাস, ভারীও বটে। শ্বাস টানলেই খচ্ করে বিঁধছে ফুসফুসে। একটু অবাক হলো শ্যারন, এমনকী বাইরের খোলা জায়গাতেও বাতাস এত ঠাণ্ডা নয়। থারমাল সুটের বেল্ট থেকে ওয়ার্মিং মাস্ক খুলে আনল ও। মুখে লাগিয়ে অন্ করল সুইচ।

দ্রুত পায়ে এগোচ্ছেন ড. কনওয়ে, পেরিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক সাইড টানেল—কোনোটা মালপত্রে ভরা, কোনোটা আবার একেবারে খালি; কিন্তু তাকাচ্ছেন না ওগুলোর দিকে।

একটা টানেলে কসাইদের হাতে প্যাক করা কিছু ক্রেট দেখল শ্যারন, উপরে রাশান হরফে কিছু লেখা। মাংস-টাংস আছে বোধহয় ভিতরে, জমে বরফ। দ্বীপের গভীরের এই গুহাগুলো ফ্রিজারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

টানেল ধরে আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখা মিলল নানা রকম গর্ত আর মার্কিঙের—ভূ-বিজ্ঞানীরা এসব জায়গা থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করছে। কৌতূহল নিয়ে ইতিউতি তাকাল শ্যারন। গোলকধাঁধা বললেও কম বলা হয় জায়গাটাকে। আশপাশে অসংখ্য গুহামুখ, একাকী ছেড়ে দিলে আর ফিরতে পারবে না। বলতেই পারবে না কীভাবে কতদূর এসেছে। এ-কথা ভেবেই বোধহয় টানেলের দেয়ালে নানা রকম চিহ্ন এঁকে রেখেছে বিজ্ঞানীরা।

একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে থামলেন কনওয়ে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন দেয়ালে। এক জায়গায় সবুজ পেইন্টে আঁকা ত্রিভুজ দেখতে পেয়ে মাথা ঝাঁকালেন, এগোলেন ত্রিভুজের পাশের গুহামুখ ধরে।

টানেলের আকার ছোট হয়ে এসেছে এদিকে। প্রস্থ কম, ছাতও নেমে এসেছে মাথার মাত্র ছ'ইঞ্চি উপরে। সিধে হয়ে হাঁটতে পারছে শ্যারন, কিন্তু কনওয়ে হাঁটছেন একটু কুঁজো হয়ে, নইলে মাথা ঠেকে যাবে ছাতে। ভিতরের বাতাস কেমন যেন গুমোট, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে দেয়াল আর ছাতে জমে থাকা বরফ স্ফটিক, যেন বহুমূল্য হীরকখণ্ড ওগুলো। দু'পাশে পাথরের অস্তিত্ব নেই আর, খাঁটি বরফে তৈরি হয়েছে সব দেয়াল... স্বচ্ছ, ভিতরে আটকা পড়া বাতাসের বুদবুদ দেখতে পাচ্ছে শ্যারন, মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে।

দেয়ালে হাত বোলাল ও। একেবারে মসৃণ। গ্রীষ্মকালে সৃষ্টি হয় এসব গুহার। সূর্যের তাপে গলে যায় সারফেসের বরফ,

পরিণত হয় পানিতে। সেই গরম পানি বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে গ্লেসিয়ারের ভিতরে, শিরা-উপশিরার মত গুহা আর পকেট বানিয়ে চলে যায় একেবারে নীচ পর্যন্ত। শীত নামলে গ্লেসিয়ারের উপরিভাগ আবার জমাট বেঁধে যায়, রয়ে যায় বরফের সুড়ঙ্গ আর গুহাগুলো।

নীলচে দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল শ্যারন। ভুলে গেল শীতের কথা, হারিয়ে গেল অদ্ভুত সৌন্দর্যের মাঝে। ছোট একটা বাঁক ঘুরতেই তাই পা পিছলে গেল ওর। পড়ে যাচ্ছিল, মরিয়া হয়ে হাত ছুঁড়ল, মুঠোর মধ্যে চলে এল দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের গজাল, ওটা ধরে পতন ঠেকাল ও।

শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন ড. কনওয়ে। বললেন, 'সাবধানে পা ফেলুন। এদিককার মেঝে বড্ড পিচ্ছিল।'

এতক্ষণে বুঝি কথাটা বলার সময় হলো? সখেদে ভাবল শ্যারন। আরেকটু হলেই তো আছাড় খাচ্ছিল! সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। চোখ ফেরাল পাথরের গজালটার দিকে। বরফের নয়, খাঁটি প্রস্তরখণ্ড ওটা। জিয়োলজিস্টদের কাছে এ-জাতীয় পাথরের কথা শুনেছে। প্রাচীন যে-ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এই গ্লেসিয়ার, সেটারই টুকরো অংশ এগুলো।

খানিক এগিয়ে গেছেন কনওয়ে, আঁধার ছেঁকে ধরছে শ্যারনকে। ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগোল ও, মনে মনে ভাবছে—আরেকটা ফ্ল্যাশলাইট আনা উচিত ছিল ওর। পিচ্ছিল মেঝেতে পা ফেলবার আগে ঠিকমত দেখে নিতে পারত। জিয়োলজিস্টরা এদিকে বালি ফেলেনি কেন কে জানে। হয়তো স্নেক পিটের এ-অংশে এখনও কাজ শুরু করেনি ওরা।

আবারও ঘাড় ফেরালেন বায়োলজিস্ট। জানালেন, 'পৌঁছে গেছি প্রায়।'

লক্ষ করল শ্যারন, ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে শুরু করেছে টানেল। বরফের দেয়াল আর ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে ছোট-বড় নানা আকারের বোল্ডার—যেন আচমকা জমাট বেঁধে গেছে একটা পাথরধস। ছাতও উঁচু হতে শুরু করেছে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঠিকমত পৌঁছুচ্ছে না উপর পর্যন্ত। এখানে-ওখানে নাচানাচি করছে ছায়া। অশুভ পরিবেশ।

বড় একটা বাঁক পেরিয়ে বিশাল এক গুহায় মিলল টানেল। ওখানে ঢুকতেই আবারও পা পিছলাল শ্যারনের। দু'পাশে হাত ছুঁড়ে ব্যালান্স রক্ষা করল কোনোমতে। সোজা হতেই বিস্ময় ফুটল ওর চোখে।

গুহাটা বিশাল, মেঝেটা যেন অলিম্পিকের কোনও আইস রিঙ্ক—আসলে ওটা একটা জমাট বাঁধা জলাশয়। চারপাশের দেয়াল গম্বুজের মত মিশেছে ছাতে গিয়ে। জায়গাটা বড়-সড় একটা ন্যাচারাল ক্যাথিড্রল—বরফ আর পাথরের সংমিশ্রণে গড়া। পিছনদিক আর দু'পাশে বরফ দেখা গেলেও নাক বরাবর শেষপ্রান্তে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ন্যাড়া পাথর, উঠে গেছে উপরদিকে। ছাতের অংশটা একটা ওভারহ্যাং।

কাছে এসে শ্যারনের বাহু স্পর্শ করলেন ড. কনওয়ে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'প্রাচীন একটা ক্লিফ ফেসের ধ্বংসাবশেষ ওটা... অন্তত বেনটনের তা-ই ধারণা।' ড. জেফরি বেনটন ওমেগার জিয়োলজি টিমের প্রধান, তার কথাই বলছেন ভদ্রলোক। 'ওর ধারণা, গ্লেসিয়ারটা যখন ল্যাণ্ডম্যাস থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন ক্লিফটাকে ভেঙে নিয়ে এসেছে সাথে করে। কথাটা যদি সত্যি হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে, ক্লিফটার বয়স বরফ যুগের কাছাকাছি। খুবই ইন্টারেস্টিং... ও চাইছিল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোর-স্যাম্পল সংগ্রহ করতে, বহু কষ্টে ঠেকিয়েছি আমি।'

'ঠেকালেন কেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'প্রাথমিক পরীক্ষায় মরা ব্যাকটেরিয়া আর জমাট শৈবালের খোঁজ পেয়েছি আমি ক্লিফের গায়ে। ক্লিফের খোঁড়লগুলোয় ভালমত তল্লাশি চালাবার পর পেয়েছি আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস। তিনটে পাখির বাসা... একটাতে ডিমও আছে!' কণ্ঠে উত্তেজনা ফুটল বায়োলজিস্টের। 'শুধু তা-ই নয়, বরফে আটকা পড়া কতগুলো বেজি আর সাপ পেয়েছি আমি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? এই ক্লিফ ফেস আসলে বরফ-যুগের এক রত্নভাণ্ডার... সে-আমলের একটা জমাট বাঁধা বায়োস্ফিয়ার এখন আমাদের হাতে!' সামনে ইশারা করলেন তিনি। 'আসুন, দেখাবার মত আরও জিনিস আছে।'

পাথুরে ক্লিফের উপর দৃষ্টি সেঁটে আছে শ্যারনের। প্রথমদর্শনে যতটা নিরেট মনে হয়েছিল, আসলে তা নয়। পুরো ক্লিফ জুড়ে ছোট-বড় হাজারো খোঁড়ল আর ফাটল দেখতে পাচ্ছে, ভিতরটা অন্ধকার। ওগুলোর ওপাশে আরও কত কী আছে, কে জানে। ড. কনওয়ের সঙ্গে সামনে এগোল ও। পাথুরে ওভারহ্যাঙের তলায় পৌঁছে ওকে থামালেন বায়োলজিস্ট। ফ্ল্যাশলাইট তাক করলেন আইস রিঙ্কের মেঝের দিকে।

কুয়োর মত একটা গোল গর্ত দেখল শ্যারন বরফের মাঝে। আকৃতিটা বড্ড নিখুঁত, কিনারাগুলো মসৃণ। প্রাকৃতিক হতেই পারে না। সঙ্গীর দিকে মুখ তুলে ভুরু নাচাল ও।

'ওদের একটাকে এখান থেকে বের করা হয়েছে,' জানালেন ড. কনওয়ে।

'কাদের একটাকে?' শ্যারন বিস্মিত।

একপাশে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন কনওয়ে। 'নিজের চোখেই দেখুন।' বেল্টে ঝোলানো ক্যান্টিন হাতে নিলেন তিনি। মুখ খুলে মেঝেতে ঢাললেন পানি, তারপর গ্লাভ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করলেন

ঘোলা বরফ। একটু সরে জায়গা দিলেন শ্যারনকে।

হাঁটু গেড়ে বসল তরুণী বিজ্ঞানী। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল মেঝের দিকে। বরফের তলায় আবছা একটা আকৃতি দেখতে পাচ্ছে। ওখানটায় আবারও পানি ঢাললেন ড. কনওয়ে, তারপর ফেললেন ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

'ভাল করে দেখুন,' বললেন তিনি।

আরেকটু নিচু হলো শ্যারন। বরফের ঘোলা ভাব কমে এসেছে অনেকটা। ভালমত তাকাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল আকৃতিটা। সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল ওর। একটা প্রাণী... বরফে জমাট বাঁধা একটা নিখুঁত স্পেসিমেন শোভা পাচ্ছে ওর তলায়! দেখে মনে হলো যেন ওর দিকেই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে ওটা, চেষ্টা করছে বরফ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে।

চোখ বন্ধ করে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাল শ্যারন। স্পেসিমেনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর আগে আড়চোখে দেখল সঙ্গীকে। মুখ হাসি হাসি হয়ে গেছে ড. কনওয়ের। ওর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছেন খুব। একটু বিরক্ত হলো ও, মন দিল নীচের দিকে। কী প্রাণী বোঝা যাচ্ছে না। চামড়াটা মসৃণ, ফ্যাকাসে সাদা... অনেকটা আর্কটিকের বেলুগা তিমির মত। আকারেও প্রায় অমনই, অন্তত আধ টন হবে ওজন। তবে মাছ বলা যাচ্ছে না প্রাণীটাকে, কারণ দেহের ঊর্ধ্বাংশে ছোট আকারের দুটো বাহু আছে এটার, মুঠোয় ধারালো নখ। পা-ও আছে, পাতাদুটো ডুবুরিদের ফ্লিপারের মত। তিমির চেয়ে দেহ অনেক লম্বা এবং সরু, মনে হলো পানির ভিতর দিয়ে খুব দ্রুত ছুটতে পারত। প্রাণীটার হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল শ্যারনের। ক্ষুরধার দাঁতের সারি দেখতে পাচ্ছে, এক কামড়ে গোটা একটা শুয়োর খেয়ে ফেলতে পারবে। দেখাচ্ছেও খুব ভয়ঙ্কর। প্রাণহীন চোখদুটোর সাদা মণিতে মৃত্যুর শীতলতা।

হিংস্র প্রাণী, কোনও সন্দেহ নেই।

মুখের কাছ মাস্ক তুলে জোরে জোরে শ্বাস নিল শ্যারন। তারপর মাথা তুলে তাকাল বায়োলজিস্টের দিকে। 'কী এটা?'

প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না কনওয়ে। বললেন, 'আরও স্পেসিমেন আছে। আসুন, দেখাই।'

ক্লিফ ফেসের গোড়ায় ওকে নিয়ে গেলেন তিনি। ওখানে বরফের গভীরে শুয়ে আছে একই রকম আরেকটা প্রাণী। তবে এটার ভাবভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, যেন ঘুমাচ্ছে পরম শান্তিতে।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল শ্যারন। 'কিন্তু...'

'ট্যুর এখনও শেষ হয়নি,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন কনওয়ে। 'প্রশ্নোত্তর পর্ব সবার শেষে।'

শ্যারনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ক্লিফের গোড়ার একটা ফাটলে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। বিরক্ত ভঙ্গিতে তাঁর পিছু নিল শ্যারন। ফাটলটা বিশ গজ দীর্ঘ, ওটা পেরুতেই মাঝারি আকারের একটা গুহায় বেরিয়ে এল দুই বিজ্ঞানী, আকারে ওটা দুটো গাড়ি রাখার গ্যারাজের সমান। ভিতরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন কনওয়ে।

গুহার মাঝামাঝি জায়গায় মেঝের উপর সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছ'টা প্রকাণ্ড আইস ব্লক—প্রত্যেকটার ভিতরে আবছাভাবে ফুটে আছে অচেনা প্রাণীগুলোর আকৃতি। বুঝল শ্যারন, গ্লেসিয়ারের বিভিন্ন অংশের বরফ কেটে সংগ্রহ করা হয়েছে ওগুলোকে। কিন্তু ওর শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল ঠিক মাঝখানের দৃশ্যটা। ওখানে উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটা প্রাণী। বরফ গলিয়ে বের করে আনা হয়েছে ওটাকে, ল্যাবরেটরির ব্যাঙের মত শুইয়ে রাখা হয়েছে চিৎ করে, হাত-পা পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে গাঁথা। তারপর চামড়া চিরে ফেলা

হয়েছে চোয়ালের নীচ থেকে পেট পর্যন্ত। নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে ওভাবে। সাম্প্রতিক ঘটনা নয়, বরফের আস্তর দেখে বোঝা গেল, বহুকাল আগে চালানো হয়েছে এই অপারেশন। কিন্তু তারপরেও দৃশ্যটা বীভৎস। খোলা দেহটার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বিবর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর হাড়গোড়... নিজের অজান্তেই ভয়ার্ত একটা ধ্বনি বেরুল শ্যারনের গলা চিরে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, বহু কষ্টে দমন করল বমি।

'কোনও সমস্যা, ড. বেকেট?' জিজ্ঞেস করলেন কনওয়ে।

জবাব দিল না শ্যারন। ঢুকে পড়ল ফাটলে, দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে এল আইস রিঙ্কে। উবু হয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলল।

ওর পিছু পিছু কনওয়েও এসেছেন। উৎফুল্ল গলায় বললেন, 'এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন, ড. বেকেট? সনাতন বায়োলজির ধ্যান-ধারণাই পাল্টে দিতে পারব আমরা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন জিয়োলজিস্ট টিমকে এই নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত ইকো-সিস্টেমে হাত লাগাতে বাধা দিয়েছি...

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন!' রূঢ় গলায় তাঁকে থামিয়ে দিল শ্যারন। 'কী ওগুলো?'

চোখ পিটপিট করলেন কনওয়ে। 'ওফফো, ভুলেই গিয়েছিলাম... আপনি আমার ফিল্ডের মানুষ নন।'

'কী বলতে চান?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল শ্যারন।

কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে। ফাটলের দিকে ইশারা করে বললেন, 'ওই স্পেসিমেনটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করেছি আমি। হয়তো জানেন, প্যালিয়ো-বায়োলজির ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে আমার। সেজন্যেই জানি, এ-ধরনের স্পিশিজের ফসিল পাওয়া গেছে পাকিস্তান আর চিনে। তবে এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত স্পেসিমেন...'

'কথা ঘোরাচ্ছেন কেন? কীসের স্পেসিমেন, সেটাই জানতে

চাইছি আমি।'

'*অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্*। সোজা ইংরেজিতে ওয়াকিং ওয়েইল... বা, হাঁটাচলায় সক্ষম তিমিও বলতে পারেন। এভোলিউশনারি লিঙ্ক ওটা... স্থলবাসী স্তন্যপায়ী প্রাণী আর আজকের আধুনিক তিমির মাঝামাঝি একটা পর্যায়।'

কিছু বলল না শ্যারন, বায়োলজিস্টের কথা এখনও শেষ হয়নি।

'ধরে নেয়া হয়, প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত এই প্রাণী,' বলে চললেন কনওয়ে, 'বিলুপ্ত হয়ে গেছে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে। হাত-পা, মেরুদণ্ডের সঙ্গে জোড়া লাগানো পেলভিস আর নাকের গড়ন... এসব দেখে নিশ্চিত হয়েছি—স্পেসিমেনগুলো অ্যাম্বিউলোসিটাসের। কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'আপনি বলতে চাইছেন, এই স্পেসিমেনগুলো কমপক্ষে সাড়ে তিন কোটি বছরের পুরনো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন কনওয়ে। 'ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা ওখানেই। বেনটন বলছে, এখানকার বরফ মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো... মানে পৃথিবীর শেষ বরফ যুগের। তা ছাড়া স্পেসিমেনগুলোর মধ্যেও কিছু অনবদ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। তাই ধারণা করছি, একদল অ্যাম্বিউলোসিটাস মাইগ্রেট করেছিল আর্কটিক এলাকায়... ঠিক যেমন আজকালকার তিমিরা করে। এখানে এসে আর্কটিক কণ্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় ওরা। সাদাটে চামড়া, বিশালত্ব আর চামড়ার নীচে চর্বির পুরু স্তর সেটাই বলে। মেরু ভালুক আর বেলুগা তিমির মধ্যেও এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।'

দ্বিমত পোষণ করল না শ্যারন, বেলুগা তিমির সঙ্গে প্রাণীগুলোর সাদৃশ্য ও নিজেও খেয়াল করেছে। ও শুধু বলল,

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন এরা মেরু এলাকায় এসে শেষ বরফ যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল? তা হলে আগে এর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি কেন?'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই। পোলার ক্যাপে বসবাসকারী প্রাণীরা মরার পর তলিয়ে গেছে আর্কটিক সাগরে... এই এলাকা নিয়ে খুব কম নাড়াচাড়াই করেছি আমরা। পার্মাফ্রস্টের কারণে আর্কটিক সার্কেলের উপরিভাগে খোঁড়াখুঁড়ি চালানো রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সত্যিকার অর্থে প্যালিয়োলজিক্যাল কোনও রেকর্ডই নেই এ-অঞ্চলের। কবে কোন্ প্রাণী এখানে থেকেছে না-থেকেছে, তা কেউই জানি না।'

কনওয়ের বক্তব্যে কোনও খুঁত দেখতে পেল না শ্যারন। মেরু এলাকা আজও মানুষের জন্য রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এখানে গবেষণা চালাবার উপযুক্ত আধুনিক ইকুইপমেণ্ট এবং টেকনোলজি আবিষ্কৃত অতি সম্প্রতি। তার আগ পর্যন্ত এখানে ঠিকমত ঢুঁ মারতে পারেনি কেউ। সিরিয়াস এক্সপিডিশন যারা শুরু করেছে, তাদের মধ্যে ওদের ওমেগা টিম অন্যতম।

'এই বেইস তৈরি করার সময় নিশ্চয়ই রাশানরা খোঁজ পেয়েছে প্রাণীগুলোর,' বললেন কনওয়ে। 'এমনও হতে পারে, এগুলোর উপর গবেষণার জন্যই তৈরি হয়েছে বেইসটা। কে জানে!'

চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল শ্যারন, এই ধারণার কথা আগেও বলেছেন ভদ্রলোক। 'এমনটা ভাবছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। প্রশ্নের ভিতরে প্রচ্ছন্ন কৌতুক চাপা রইল না। সন্দেহ নেই, আবিষ্কারটা বিশাল... কিন্তু চার নম্বর লেভেলে ওরা যা খুঁজে পেয়েছে, তার সঙ্গে ওয়াকিং ওয়েইলের কোনও তুলনাই চলে না।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বায়োলজিস্টের। 'কেন, বুঝতে পারছেন না?'

'কী বুঝব?'

'পাকিস্তান আর চিনে অ্যাম্বিউলোসিটাসের ফসিল পাওয়া গেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের, কোনও নামও দেয়া হয়নি তখন। যদি ধরে নিই, এই দানবগুলোকে নিজেরাই একটা নাম দিয়েছিল রাশানরা, সেটা কি খুব ভুল হবে?'

চমকে উঠল শ্যারন।

'আমি বলব, এই বেইসের নাম দেয়া হয়েছে ওই দানবগুলোর নামে,' বললেন কনওয়ে। 'এক ধরনের ম্যাসকট আর কী।'

আইস রিঙ্কের মেঝের উপর দৃষ্টি ফেলল শ্যারন। এতক্ষণে বুঝতে পারছে সহকর্মীর কথার মর্ম। বরফ ভেদ করে উঠে আসছে ভয়ঙ্কর এক দানব... নরডিক উপকথার গ্রেণ্ডেল!

চোদ্দ

অ্যাবির হাতে বিমান ওড়ানোর দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে রানা। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বোজার চেষ্টা করছিল, তন্দ্রা টুটে গেল বিচ্ছিরি নাক ডাকানোর শব্দে। বিরক্ত হয়ে পিছনে তাকাল ও। না, আমেরিকান রিপোর্টার বা বৃদ্ধ ইনুইট নন, শব্দটা বেরুচ্ছে লোবোর নাক দিয়ে। সিটের উপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে জানোয়ারটা, ঘুমিয়ে পড়েছে।

'কী হলো?' রানাকে নড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'ঘুম

আসছে না?’

‘ঘুমাই কী করে? করাত চালাচ্ছে তো পিছনে।’ ইশারায় কুকুরটাকে দেখাল রানা।

হেসে ফেলল অ্যাবি। ‘লোবোর নাকে জন্মগত সমস্যা আছে। ঘুমালেই অমন বিশ্রী আওয়াজ বেরোয়। আমি অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে গেছি।’

‘ঠিক করে নেয়া যায় না?’

‘মেইনল্যাণ্ডের এক ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। বলল বড়সড় একটা অপারেশন করাতে হবে। ওর নাকের সেপটাম বাঁকা হয়ে গেছে। কুকুরের পিছনে খরচ করার মত অত টাকা তো নেই আমার। কী আর করা, মেনে নিয়েছি ব্যাপারটা। লোবোর কোনও অসুবিধেও হয় না ওটার জন্যে।’

‘হুম।’

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। পাঁচটা না বাজতেই আঁধার নামতে শুরু করেছে আলাস্কার বুকে, আকাশে ভাসছে প্রায়-ভরাট চাঁদ, পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই। রূপালি আলোয় ঝলমল করছে নীচের প্রকৃতি। শীত এখনও বিদায় নেয়নি, কিন্তু বসন্ত তার আগমনী বার্তা জানাতে শুরু করেছে। গলতে শুরু করেছে গাছপালার মাথার সাদা টোপর, খোলা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে বইছে বরফ-গলা পানির ঝর্ণা, এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে, ছোট-বড় জলাশয়, সেগুলোর আশপাশে ভিড় জমিয়েছে তৃষ্ণার্ত হরিণের পাল।

অ্যাবির কণ্ঠ শুনে ধ্যানভঙ্গ হলো ওর।

‘কপাল ভাল যে, তখন যোগাযোগ করেছিলাম ডেডহর্সে। নইলে এখন আর সম্ভব হতো না।’

চোখ ফেরাল রানা। ‘হুঁ?’

অ্যারিগেচ পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই ক্রুডো

বে-র এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করেছে ওরা। ওখানকার সিভিল এবং মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে ব্রুকস্ রেঞ্জে ঘটে যাওয়া হামলার কথা। আগামীকাল সকালেই হেলিকপ্টার পাঠানো হবে সেসনাটার ধ্বংসাবশেষের খোঁজে। আশা করা যায়, হামলাকারীদের ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যাবে তখন। ডেডহর্সে কথা বলার পর সিটকায় নিজের বিসিআই কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা, ঢাকায় পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে সে। কোনও নির্দেশ থাকলে সেটা জানিয়ে দেবে ওকে। ম্যাসনও কথা বলেছে তার প্রতিনিধির সঙ্গে। প্রুডো-তে নামার পর প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। অ্যাবির কথায় বোঝা গেল, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সময় থাকতেই যোগাযোগ সেরেছে ওরা।

সামনের দিকে আঙুল তুলেছে মেয়েটা। দূর দিগন্তের কাছে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে লাল-নীল-সবুজ... হাজারো রঙের আলোর ফিতা। অরোরা বোরিয়ালিস। শুধুমাত্র মেরু এলাকার আকাশেই দেখা মেলে আলো নিয়ে প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেলার। অপূর্ব সুন্দর... সমস্যা একটাই—এ-সময় ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বেতার তরঙ্গ, রেডিও হয়ে যায় অচল।

'পূর্বাভাস বলছে, আজ খুব পরিষ্কার দেখা যাবে বোরিয়ালিসের খেলা,' যাত্রীদের উদ্দেশে বলল অ্যাবি।

সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রানা। চোখ রাখল দূরের আকাশে। বাড়ছে আলোর নাচানাচি, একে একে উঠে আসছে বর্ণিল আলোকরেখা, ভরিয়ে দিচ্ছে আকাশের ক্যানভাস। অনেক নাম আছে এর—মেরুজ্যোতি, নর্দার্ন লাইট... স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা বলে *কোয়োকুন* বা *ইয়োইয়াকিয়া।* ইনুইটদের ভাষায় স্প্রিং লাইট। দেখতে দেখতে যেন অন্য এক জগতে হারিয়ে গেল রানা। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়, তারপরেও প্রতিবারই মুগ্ধতায়

আবিষ্ট হয়। কিছু কিছু জিনিস আসলে কখনও পুরনো হয় না।

'আপাতত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না আমরা,' বলল অ্যাবি।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রানা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যকণার ঘর্ষণে তৈরি হয় এই আলো, জ্যাম করে দেয় রেডিও ওয়েভ। যতক্ষণ শেষ না হচ্ছে আলোর খেলা, ততক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে বাইরের দুনিয়া থেকে। কিন্তু তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না রানা। প্রুডো বে-র বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। বড়জোর আধঘণ্টা ফ্লাই করতে হবে। শহর আর অয়েলফিল্ডগুলোর মিটিমিটি আলো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

পুরো সময়টা নীরবে কাটল। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বোরিয়ালিসের সৌন্দর্য উপভোগ করল টুইন অটারের আরোহীরা। পঁচিশ মিনিটের মাথায় অয়েল ডেরিকগুলোর দেখা পেল ওরা—ক্রিসমাস ট্রি-র মত বাতি জ্বলছে সারা শরীরে। বাঁয়ে, আঁকাবাঁকা একটা রূপালি রেখা চলে গেছে সবুজ তুন্দ্রার বুক চিরে। ওটা ট্রান্স-আলাস্কা পাইপলাইন। প্রুডো বে থেকে আলাস্কার উত্তর উপকূলের ভালডেজ পর্যন্ত চলে গেছে এই লাইন, ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অপরিশোধিত খনিজ তেল।

গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে টুইন অটার। বাঁক নিয়ে পাইপলাইনকে অনুসরণ করল অ্যাবি। রেডিওতে চেষ্টা করল ডেডহর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু খড়খড়ে স্ট্যাটিক ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না হেডফোনে। আকাশে এখনও থামেনি অরোরা বোরিয়ালিসের নাচ।

কিছুদূর গেলে দৃশ্যমান হলো প্রুডো বে-র জনবসতি। সাধারণ মানুষ অবশ্য খুব বেশি পাওয়া যাবে না ওখানে, জায়গাটা স্রেফ একটা মাইনিং টাউন—অয়েল প্রোডাকশন, ট্রান্সপোর্টেশন,

আর অন্যান্য সাপোর্টিং সার্ভিসের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। জনসংখ্যা একশোর মত, বেশিরভাগই অয়েল ওয়ার্কার, এদের সংখ্যা সারা বছর কমে-বাড়ে। শহরের পাশে ছোট একটা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে তেল উত্তোলনের কাজে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য।

শহরের সীমানার ওপারে বিউফোর্ট সাগর... ওটা গিয়ে মিশেছে উত্তর মহাসাগরে। তীর থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে জমাট বরফের স্তর, তাই হঠাৎ দেখায় বোঝা মুশকিল কোথায় শেষ হয়েছে ডাঙা, আর কোথায় শুরু হয়েছে পানি। গরমকালে এই বরফ গলে যাবে, কেবলমাত্র তখনই দেখা মিলবে তটরেখার।

সাগরের উপর চক্কর দিতে শুরু করল অ্যাবি, ল্যাণ্ডিঙের জন্য অ্যালাইন করতে চাইছে বিমানকে। কয়েক মাইল দূরের এক চিলতে এয়ারস্ট্রিপ ওর লক্ষ্য। ফ্ল্যাপ নামাতে গিয়ে একটু থমকে গেল ও। ভুরু কুঁচকে বলল, 'হচ্ছেটা কী ওখানে?'

রানাও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। ছোট্ট শহরটার সীমানায় মানুষের ভিড়। সামরিক ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকগুলো জিপ ও ট্রাক... খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে। পাশের জানালা দিয়ে গাড়িগুলোর গন্তব্যের দিকে তাকাল ও। ট্রান্স-আলাস্কা পাইপলাইনের শেষ প্রান্ত ওদের ঠিক নীচে। গ্যাদারিং এবং পাম্প স্টেশনের বিশাল দুটো বিল্ডিঙে গিয়ে ঠেকেছে লাইনটা, সাইক্লোন-ফেন্সের সীমানার ভিতরে মাথা তুলে রেখেছে ইমারতদুটো। ওখানেই প্রাথমিকভাবে জমা হয় নর্থ স্লোপ থেকে তোলা তেল... ক্রুডের মধ্য থেকে সরানো হয় পানি আর গ্যাস, তারপর পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় আটশো মাইল দূরের ভালডেজে, তেলবাহী ট্যাঙ্কারে লোড করবার জন্য।

বিমান পাম্প স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা বৈসাদৃশ্য

দেখতে পেল রানা। সাইক্লোন-ফেন্সের অনেকখানি অংশ ভাঙা। ওটা লক্ষ করেই ছুটে আসছে মিলিটারি ভেহিকেলগুলো। মাথার ভিতরে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল ওর। ঝট্ করে অ্যাবির দিকে ফিরল।

'কুইক! প্লেনটা সরিয়ে নাও এখান থেকে!'

'ক্... কী!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল অ্যাবি। 'কেন...'

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বিমান। নীচে... লাল-কমলা শিখা ছড়িয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গ্যাদারিং স্টেশনের বিল্ডিং, আকাশে উঠে এল মস্ত বড় এক আগুনের গোলা। শকওয়েভের ধাক্কায় একদিকে ছিটকে গেল টুইন অটার, খসে পড়তে চাইল আকাশ থেকে।

কণ্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল অ্যাবি। পিছন থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত চিৎকার। লোবোও হাঁক ছাড়ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বিমানকে একটা রোল খাওয়াল অ্যাবি, সরে গেল শকওয়েভের পথ থেকে। ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত ঝরছে গ্যাদারিং স্টেশনের ছোট-বড় টুকরো অংশ।

আবার বিস্ফোরণ হলো... এবার সেটার শিকার পাম্প স্টেশন। দ্বিতীয় একটা আগুনের গোলা উঠে এল আকাশে। বিল্ডিঙের সঙ্গে সংযুক্ত চার-ফুট ডায়ামিটারের পাইপলাইন ফাটতে শুরু করল আতশবাজির মত—জ্বলন্ত ক্রুড অয়েল ফিনকি দিয়ে ছিটকাচ্ছে চারদিকে। এ-ধরনের বিপদ ঠেকানোর জন্য বাষট্টিটা ভালভ আছে পাইপলাইনের ভিতর, প্রথমটা পর্যন্ত পৌঁছে থামল বিস্ফোরণের ঢেউ, কিন্তু তার আগেই প্রচুর পরিমাণ তেল ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে।

চোখের পলকে শান্ত জনপদটা পরিণত হয়েছে নরককুণ্ডে। জ্বলন্ত তেলের সঙ্গে আগুনের করাল থাবা এগিয়ে যাচ্ছে শহরের

দিকে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল ভিড় করে থাকা মানুষের মাঝে। কেউ গাড়িতে কেউ বা পদব্রজে... যে-যেভাবে পারছে ছুটছে চারদিকে। অল্পক্ষণেই শহর-সীমানার বাড়িঘরে লেগে গেল আগুন, এরপর চলল একের পর এক ছোট-বড় বিস্ফোরণ, শহরের গ্যাস লাইন আর হোল্ডিং ট্যাঙ্কগুলো ফাটছে।

'জিযাস ক্রাইস্ট!' ফিসফিসিয়ে বলে উঠল ম্যাসন। বিমানের জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখছে সে।

খড়খড় করে উঠল রেডিও। স্ট্যাটিকে ভরা, জেনারেল চ্যানেলে ডেডহর্স থেকে কথা বলছে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠ। 'ক্লিয়ার অল এয়ারস্পেস ইমিডিয়েটলি! এখানে ল্যাণ্ড করা বিপজ্জনক, কেউ চেষ্টা করলে বাধা দেয়া হবে।'

'এমনিতেও নামছি না,' বলল অ্যাবি। বাঁক নিয়ে স্থলভূমির উপর থেকে সরে এল ও। ছুটল বরফ-ঢাকা সাগরের দিকে।

ফ্যাল ফ্যাল করে উপকূলের দিকে তাকিয়ে আছেন রিচার্ড। হতভম্বের মত বললেন, 'কীভাবে ঘটল এসব?'

'কে জানে!' বলল রানা, ও-ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত শহরের দিকে। 'তবে ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট বা স্যাবোটাজ যা-ই হোক না কেন, ঘটেছে ঠিক আমরা এখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে। কো-ইনসিডেন্স ভাবতে পারছি না কিছুতেই।'

'কী বলছ এ-সব!' অ্যাবি অবাক। 'আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?'

জবাব দিল না রানা। মানসচোখে সাইক্লোন ফেন্সের ভাঙা অংশটা দেখতে পাচ্ছে ও, মনে পড়ছে ওদিকে ছুটে যেতে থাকা সামরিক গাড়িগুলোর কথা। কেউ অনুপ্রবেশ করেছিল পাইপলাইনের ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে, অ্যালার্ম শুনে তাই ছুট লাগিয়েছিল মিলিটারি। কিন্তু ওরা পৌঁছুনোর আগেই ভিতরে বিস্ফোরক বসিয়েছে অনুপ্রবেশকারী, সরেও গেছে। গতকাল

থেকে যা যা ঘটে গেছে, তার বিচারে ব্যাপারটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ভাবতে পারছে না কিছুতেই। গ্যারি ম্যাসনের বিমান ক্র্যাশ করার পর থেকে ঘটছে একের পর এক ধ্বংসাত্মক ঘটনা। কেউ একজন চাইছে না, সিয়াটল টাইমসের এই সাংবাদিক আর্কটিকের ওই রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছাক। প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা সেটার অংশ হতে বাধ্য।

'আমরা এখন কোথায় যাব?' পিছন থেকে জানতে চাইল ম্যাসন।

'আমার ফিউয়েলও ফুরিয়ে এসেছে,' বলল অ্যাবি। টোকা দিল ইন্সট্রুমেন্ট গজে, যেন তাতে কাঁটাটা ডানদিকে সরে আসবে।

'কাকটোভিকে চলো,' পরামর্শ দিলেন রিচার্ড।

কথাটা পছন্দ হলো অ্যাবির। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

'ওটা আবার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'বারটার আইল্যাণ্ডের একটা ফিশিং ভিলেজ,' জবাব দিলেন রিচার্ড। 'কানাডিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি। এখান থেকে মোটামুটি একশো বিশ মাইল।' মেয়ের দিকে ফিরলেন। 'কতটুকু ফিউয়েল আছে? পৌঁছুনো যাবে তো?'

'শেষ কয়েক মাইল একটু কষ্ট হতে পারে,' বলল অ্যাবি।

বিমর্ষ হয়ে গেল ম্যাসনের চেহারা। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, আবারও ক্র্যাশ করে কি না।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' রানা আশ্বস্ত করল তাকে, 'ফিউয়েল শেষ হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। বরফের যে-কোনও সমতল জায়গা পেলেই স্কিডে ভর করে ল্যাণ্ড করতে পারবে টুইন অটার।'

'তারপর?' বুকের কাছে হাত ভাঁজ করল ম্যাসন। 'হাঁটতে শুরু করব, নাকি ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কাকটোভিক পর্যন্ত নিয়ে যাব এই বিমানটাকে?'

'কোনোটাই না,' মৃদু হেসে বলল অ্যাবি। 'আণ্ডারক্যারিজে

একটা স্পেয়ার ট্যাঙ্ক আছে। ল্যাণ্ড করার পর নিজেরাই রিফিউয়েল করে নিতে পারব।'

একটু যেন স্বস্তি পেল ম্যাসন। সিটে হেলান দিল সে।

জ্বলন্ত প্রুডো বে অনেকটা পিছনে পড়ে গেছে। দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত তাকাল রানা। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল অ্যাবি। 'এখনও ভাবছ ওটার জন্য আমরা দায়ী?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করি না আমি। কথা নেই, বার্তা নেই... আমরা আকাশে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবে একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার, তা কিছুতেই মানতে পারছি না।'

'কিন্তু কে করবে এই কাজ? কীসের জন্য?'

রানা জবাব দেবার আগেই মুখ খুলল ম্যাসন। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ওটা একটা হিসেবি চাল। ক্যালকুলেটেড অ্যাক্ট অভ ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন।'

'কী?' বিস্মিত গলায় বলল অ্যাবি।

রানাও একটু চমকে গেছে। ঘাড় ফেরাল সাংবাদিকের দিকে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেখা সমস্ত ভয়-ভীতি উধাও হয়ে গেছে লোকটার চেহারা থেকে। আশ্চর্য প্রশান্ত দেখাচ্ছে তাকে। তা হলে কি এতটা সময় অভিনয় করছিল?

ওর দিকে ফিরেও তাকাল না ম্যাসন। সহজ ভাষায় নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করল অ্যাবি আর রিচার্ডের কাছে। 'আমাদের উপর হামলার খবর দিয়েছি আমরা প্রুডো বে-তে। আগামীকাল সকালে তদন্ত শুরু হবার কথা। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, আজকের এই দুর্ঘটনার কারণে সেটা স্থগিত হয়ে যাবে। সিভিলিয়ান আর মিলিটারি মিলে খুব বেশি রিসোর্স নেই প্রুডো বে-তে। আগামী

বেশ কিছুদিন এই দুর্ঘটনার রহস্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে ওদেরকে। আমাদের হামলাকারীরা এর মধ্যে নিজেদের সমস্ত ট্র্যাক মুছে ফেলতে পারবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, তেলের ডাম্প উড়িয়ে দেয়া হয়েছে স্রেফ একটা ক্লিনআপ অপারেশনের জন্য?' অবিশ্বাসের সুর ফুটল রিচার্ডের কণ্ঠে।

'না, ঠিক তা বলছি না,' ম্যাসন বলল। 'এর সঙ্গে আরও কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে আমাদের ব্যাপারটা যে একটা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই বিস্ফোরণে তদন্ত পিছানো ছাড়াও আরেকটা উপকার হচ্ছে ওদের। এত বড় একটা দুর্ঘটনা... আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী... ইচ্ছা থাকুক বা না-থাকুক, পত্রিকা থেকে নির্ঘাত নির্দেশ দেয়া হবে আমাকে এটার কাভারেজ দেবার জন্য। অতএব এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও... সোজা কথায় ওমেগা স্টেশনে যেতে পারছি না আমি। ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি?'

'ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন...' বিড়বিড় করল অ্যাবি, 'হ্যাঁ, কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেছিলেন, সেটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'এই মাপের একটা দুর্ঘটনা শুধু আমাদেরকে ঠেকানোর জন্য ঘটাতে যাবে না কেউ। ওটা মশা মারতে কামান দাগার মত হয়ে যায়। আমি বলব, পুরোটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল... আমাদেরকে শেষ মুহূর্তে যোগ করে নেয়া হয়েছে এর সঙ্গে। ডিসট্র্যাকশনটা আসলে পুরো পৃথিবীর জন্য। এই ঘটনার পর সবার দৃষ্টি পড়ে থাকবে প্রুডো বে-র উপর। আলোচনা হবে, জল্পনা-কল্পনা চলবে... ব্যস্ত থাকবে মানুষ এ-নিয়ে। গ্যারান্টি দিতে পারি, চব্বিশ ঘণ্টা পেরুনোর আগেই সিএনএন, বিবিসি-সহ সমস্ত নিউজ চ্যানেলের প্রতিনিধি হাজির

হয়ে যাবে এখানে...'

'তাতে সমস্যা কোথায়?' বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন রিচার্ড।

এক মুহূর্তের জন্য রানার চোখে চোখ রাখল ম্যাসন। তার নীলচে চোখের মণির দিকে তাকিয়ে থমকে গেল রানা। দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্থির ও ক্ষুরধার। বুঝতে পারল ও—বাইরে থেকে যা-ই দেখাক, এই লোক আসলে গভীর জলের মাছ। শান্ত ভঙ্গিতে যেভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে, সেটা সাধারণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কে এই লোক?

'আমি তো বলেইছি—ডিসট্র্যাকশন অ্যাণ্ড মিসডিরেকশন,' রানার থেকে চোখ ফিরিয়ে রিচার্ডের দিকে ফিরল ম্যাসন। 'সারা দুনিয়ার দৃষ্টি যখন প্রুডো বে-র উপর আটকে থাকবে, তখন অন্য কিছু ঘটানো হবে চোখের আড়ালে। ওরা চাইছে না, কেউ ওদিকে নজর দিক।'

'মানে ওই ড্রিফট স্টেশনটার দিকে,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। খাদে নেমে গেল গলার স্বর। 'কিছু একটা ঘটতে চলেছে ওখানে। এমন কিছু... যা গোটা দুনিয়াকে জানতে দেয়া চলে না। ওটাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য প্রুডো বে-র স্যাবোটাজ সম্ভবত খুবই সামান্য একটা ব্যাপার।'

আসল পরিচয় যা-ই হোক, রানা বুঝতে পারছে—একবিন্দু ভুল বলছে না লোকটা। প্রখর বিশ্লেষণী ক্ষমতা রয়েছে এর, রয়েছে ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সত্যকে আঁচ করবার শক্তি।

'এখন তা হলে আমাদের করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাসন। 'কাকটৌভিকে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু করার নেই আমাদের!'

ভুরু নাচাল রানা। 'কেন? ড্রিফট স্টেশনে যাবেন না? জানতে চান না, ওখানে আসলে কী ঘটছে?' লোকটাকে বাজিয়ে দেখার

জন্য করল প্রশ্নটা।

'অসম্ভব!' দু'হাত তুলল ম্যাসন। 'মরে গেলেও ওখানে যাচ্ছি না আমি।'

গলার স্বরে সামান্য ভেজাল অনুভব করল রানা। সম্ভবত অভিনয় করছে লোকটা। নিজ থেকে ওখানে যাবার জন্য অনুরোধ করতে চাইছে না; চাইছে ওরাই প্রস্তাবটা দিক। তাল দেবে বলে ঠিক করল। তা ছাড়া ও নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বলল, 'কিন্তু আপনার অনুমান যদি সত্যি হয়...'

'কিস্‌সু যায়-আসে না। অযথা প্রাণ খোয়াবার ইচ্ছে নেই আমার। লেজ গুটিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।'

'সেক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করব আমরা। কাউকে পাঠানোর ব্যবস্থা করব ওখানে।'

'কীভাবে? সোলার ফ্লেয়ারের কারণে কমিউনিকেশনের দফা-রফা অবস্থা। ধারে-কাছে যারা আছে, তারা প্রুডো বে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্য কোনও দিকে মনোযোগ দেবার সময় কোথায়? তা ছাড়া স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছি আমরা, হাতে নিরেট কোনও প্রমাণ নেই।'

'তারমানে আমাদেরকেই যেতে হবে। এই তো?' বাঁকা সুরে বলল রানা। লোকটা চমৎকার কৌশলে ফাঁদে ফেলেছে ওদেরকে।

অভিনয় জারি রাখল ম্যাসন। 'তারচেয়ে ওই ফিশিং ভিলেজে কিছুদিন গা-ঢাকা দেয়া ভাল না? ঝড়-ঝাপটা কেটে গেলে নাহয় আবার মুখ দেখানো যাবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা বলল। 'ভেবেছেন নিরাপদে থাকবেন ওখানে? প্রতিপক্ষ যদি সত্যিই সমস্ত ট্র্যাক মুছতে চায়, আমাদেরকে খুন করার বিকল্প নেই। খোঁজ পেতে কষ্ট হবে না, এই বিমানটা ওরা চেনে। সবচেয়ে বড় কথা, ছোট্ট ওই গ্রামে আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ব।'

অ্যাবি আর রিচার্ডের চেহারায় মেঘ ঘনাতে দেখল ও, কিন্তু ম্যাসন নির্বিকার। শান্ত গলায় বলল, 'তারমানে পালানোর চেয়ে রুখে দাঁড়ানোকে উত্তম ভাবছেন আপনি? হানা দিতে চাইছেন ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দুতে?'

'অবশ্যই!'

'যা খুশি করুন, আমি কিছু জানি না।' সিটে হেলান দিল সাংবাদিক। চেহারায় ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠল স্বস্তির ছাপ, পরক্ষণে ভর করল গাম্ভীর্য।

অ্যাবির দিকে ফিরল রানা। 'কোনও আপত্তি আছে তোমার?'

অয়েল গজের উপর নজর বোলাল অ্যাবি। 'অতদূর যদি যেতেই হয়, রিফিউয়েল না করে উপায় নেই আমাদের।'

'কাকটোভিকে তো যাচ্ছিই, তাই না?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছুব। রিফিউয়েলিং করতে ধরো আরও এক ঘণ্টা। বাবা যদি আপত্তি না করে, এরপরে রওনা হয়ে যেতে পারি আমরা।'

'আমি রাজি,' পিছন থেকে বললেন রিচার্ড।

'গুড,' বলে সোজা হয়ে বসল রানা। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়।

ম্যাসনের কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ওর। কিছু একটা ঘটতে চলেছে ওই নির্জন ড্রিফট স্টেশনে... বড় কিছু। সারা দুনিয়ার চোখের আড়ালে। কী হতে পারে সেটা?

হাতে আর কোনও কাজ নেই। কাজেই...

জানতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা।

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

পনেরো

ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল।

পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ম্যাথিউ গরডন, তাঁর সামনে জমায়েত হয়েছে ডুবোজাহাজের সমস্ত অফিসার। আগ্রহ-উত্তেজনায় থমথম করছে তাদের সবার চেহারা।

'তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'তবে এ-ও জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি, ডিপ্লয় হবার নির্দেশ পাইনি আমরা, শুধু জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।'

অসন্তোষ দেখা দিল অফিসারদের মধ্যে। পোড় খাওয়া, অভিজ্ঞ সাবমেরিনার এরা। অত্যন্ত দায়িত্ববান। মাত্র চারশো মাইল দূরে প্রুডো বে-তে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে... তাগিদ অনুভব করছে কিছু করবার। কিন্তু সেই আগ্রহে পানি ঢেলে দিলেন ক্যাপ্টেন।

আধঘণ্টা আগে এসেছে খবরটা—শম্বুক গতির ইএলএফ ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে। সাগরের পানির মাঝ দিয়ে আসে এই শব্দতরঙ্গ, দীর্ঘ বিরতি নিয়ে রিসিভ করতে হয় একেকটা অক্ষর। সোলার স্টর্মের কারণে ন্যাভস্যাট আর ইউএইচএফ সিস্টেম কাজ করছে না, ইএলএফ-ই যোগাযোগের একমাত্র উপায়।

আলাস্কায় যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল ক্রু-রা, সাহায্য

করতে চেয়েছিল তদন্ত এবং উদ্ধারকাজে। বিজ্ঞানীদের দেখভাল করতে করতে এমনিতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল ওরা, সত্যিকার কোনও কাজে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এসেছে ফ্লিট হেডকোয়ার্টার থেকে নতুন নির্দেশ—কোথাও যাওয়া চলবে না পোলার সেন্টিনেলের, থাকতে হবে ড্রিফট স্টেশনের কাছেই। সবাইকে ডেকে সে-সংবাদ শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন গরডন। নিজেও হতাশ হয়েছেন, তবে চেহারায় তা ফুটতে দিচ্ছেন না। নেতা হবার এই এক জ্বালা, কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না অধস্তনদের সামনে।

'দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল কমাণ্ডার ফিশার।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন গরডন। 'এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা যাবে না। সবাই এখনও আগুন নেভানোতেই ব্যস্ত।'

কথাটা বলতে ভাল লাগল না তাঁর। সঠিক একটা জবাব দিতে পারলে বেশি খুশি হতেন। ইতিমধ্যে পুরো জাহাজ জুড়ে শুরু হয়েছে গুজব আর কানাকানি। কেউ ভাবছে, ইকো-টেরোরিস্টরা ঘটিয়েছে এই অঘটন, আলাস্কার প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎকে বাঁচাতে চাইছে খনিজ আহরণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে। কেউ আবার ভাবছে, এর পিছনে আরব তেল-ব্যবসায়ীদের হাত আছে—ট্রান্স-আলাস্কান পাইপলাইন বন্ধ করে দিতে পারলে গোটা উত্তর আমেরিকা নির্ভর হয়ে পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রুড অয়েলের উপর। একই থিয়োরি অবশ্য টেক্সাসের খনিমালিকদের বেলাতেও খাটে। চিন এবং রাশাকে দায়ী করছে, এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। খুব অল্প কিছু লোকই শুধু ভাবছে, ব্যাপারটা স্রেফ একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

এত রকমের ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়া ভাল নয়। গুজবের সঙ্গে বাতাসে ভর দিয়ে ডানা মেলে আতঙ্ক, কেড়ে নেয় মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি। আসল ঘটনা জানিয়ে সবাইকে শান্ত করতে পারলে তাই স্বস্তি পেতেন ক্যাপ্টেন। কপাল খারাপ, সেটা সম্ভব নয়। অকুস্থলে যেহেতু যেতে পারছেন না, সব খবর এখন পেতে হবে বাইরের উৎস থেকে।

'এর কোনও মানে হয় না,' রাগে গজগজ করে উঠল এক অফিসার। 'অযথা বসিয়ে রাখা হচ্ছে আমাদেরকে!'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালেন গরডন। না, ক্রু-দের মনোবল কিছুতেই ভেঙে যেতে দেবেন না তিনি। কড়া গলায় বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে! এ-ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য করবে না কেউ! যতক্ষণ না অন্য কোনও নির্দেশ আসছে, আমরা আমাদের বর্তমান দায়িত্ব ঠিকমত পালন করব, ঠিক আছে? এর গুরুত্বও একেবারে কম নয়। মাত্র তিনদিন পরেই রাশান ডেলিগেশন আসছে পুরনো লাশগুলো নিতে। তোমরা কি চাও, বিজ্ঞানীরা একাই ওই ডেলিগেশনকে সামলাক?'

'জী না, স্যর,' তটস্থ কণ্ঠে বলল কমাণ্ডার ফিশার। ক্যাপ্টেনের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরেছে। অল্প যে-ক'জন মানুষ আইস স্টেশনের চার নম্বর লেভেলের রহস্য জানে, তার মধ্যে সে একজন। তাড়াতাড়ি ঘুরল অন্যান্য অফিসারদের দিকে। 'মিটিং শেষ। সবাই নিজ নিজ কাজে যাও। খবরদার, কেউ এ-বিষয় নিয়ে আর কোনও কথা বলবে না।'

অফিসাররা চলে গেলে একজন রেডিওম্যান উদয় হলো। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, ক্যাপ্টেন গরডনের কাছে এসে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর, ফ্লিট হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। ফ্ল্যাশ ট্রাফিক।'

ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন। 'ফ্ল্যাশ ট্রাফিক! ন্যাভস্যাট কি

কাজ করছে?’

মাথা ঝাঁকাল রেডিওম্যান। ‘সোলার স্টর্মের ব্রেকের সময়টায় সিগনাল রিসিভ করতে পারছি। কপাল ভাল, মেসেজটা একটা ব্রেকের মাঝখানে এসেছে। অবশ্য... *ভিএলএফ*-এও রিপিট করা হচ্ছে ওটা।’

বিস্ময় বোধ করলেন গরডন। সব চ্যানেলে ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে মেসেজ... কেন? হাত বাড়িয়ে ক্লিপবোর্ডটা নিলেন তিনি, রেডিওম্যানকে বললেন, ‘ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।’

নিজের স্টেশনে ফিরলেন ক্যাপ্টেন, দ্রুত এনক্রিপশন ভাঙলেন মেসেজের। তারপর পড়লেন ওটা। সাবজেক্ট হেডিঙে লেখা: *অতিথিরা নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছুচ্ছে।* তারপর মূল বার্তা। সেটা এ-রকম:

পোলার স্যাটেলাইট কনফার্ম করছে—কো-অর্ডিনেট আলফা ফাইভ টু ডেসিমেল এইট ড্যাশ থ্রি সেভেনে ভেসে উঠেছে একটি রাশান আকুলা-টু ক্লাস সাবমেরিন। নাম ড্রাকন, নর্দার্ন ফ্লিটের ফ্ল্যাগ সাবমেরিন, রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভ ওটার সিনিয়র অফিসার অন বোর্ড। দূরত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, অতিথিরা নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছুবেন ড্রিফট স্টেশন ওমেগায়। টাইমটেবলের এই পরিবর্তনের কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রুডো বে-র সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছি আমরা, ওটা স্যাবোটাজ ছিল। কারা এর পিছনে জড়িত, সেটা এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না।

বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে পোলার সেণ্টিনেলকে

সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অন্য কোনও নির্দেশ না পাওয়া... কিংবা উস্কানিমূলক কোনও ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত অতিথিদেরকে বন্ধুপ্রতীম বলে ধরে নিতে হবে এবং সেভাবেই আপ্যায়ন করতে হবে। তবে ওমেগা ড্রিফট স্টেশন এবং আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা এখনও পোলার সেণ্টিনেলের জন্য টপ প্রায়োরিটি বলে গণ্য করতে হবে।

মিশনে সহায়তা করার জন্য ডেল্টা ফোর্সের টিম পাঠানো হচ্ছে। ওদের অপারেশনাল কণ্ট্রোলার (ল্যাংলি থেকে নির্বাচিত) আগেভাগেই পৌঁছুবে মিশন এরিয়ায়। এ-ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে দেয়া হবে।

শুভকামনা রইল। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থেকো।

—অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেট, কমাণ্ডার অভ প্যাসিফিক ফ্লিট।

ক্লিপবোর্ডটা সরিয়ে রেখে চোখ মুদলেন ক্যাপ্টেন গরডন। বোঝার চেষ্টা করলেন মেসেজের মর্মার্থ। ল্যাংলি থেকে নির্বাচন করা হয়েছে ডেল্টা ফোর্সের অপারেশনাল কণ্ট্রোলার, তারমানে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে সিআইএ জড়িত। ওদের আণ্ডারে দেয়া হচ্ছে ডেল্টা ফোর্সের টিম—লক্ষণটা শুভ নয়। ব্ল্যাক অপসের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। প্যাসিফিক ফ্লিট কমাণ্ডকে ওই কণ্ট্রোলারের পরিচয়ও জানানো হয়নি—এর অর্থ নেভিকে অন্ধকারে রাখতে চাইছে সিআইএ। শঙ্কিত হয়ে ওঠার হাজারটা কারণ দেখতে পাচ্ছেন গরডন। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন অ্যাডমিরাল, তারমানে খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কী সেটা?

চোখ খুলে এক্স.ও.-র দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। দ্বিধা ঝেড়ে নির্দেশ দিলেন, 'কমাণ্ডার ফিশার, জাহাজ থেকে এখুনি সমস্ত সিভিলিয়ানকে নামিয়ে দাও। শোর লিভ বাতিল করছি আমি, বিজ্ঞানীদেরকে ওমেগায় পৌঁছে দিয়ে সমস্ত ক্রু-কে ফিরিয়ে আনো সেণ্টিনেলে। কুইক!'

একটু অবাক হলো ফিশার, তবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, স্যর।'

'আর হ্যাঁ, সবাই এসে গেলে সেণ্টিনেলকে তৈরি রাখবে... যেন আমার নির্দেশ পাওয়ামাত্র ডাইভ দিতে পারো।'

চিফ অভ দ্য ওয়াচ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তাঁর দিকে। 'আমরা কি প্রুডো বে-তে যাচ্ছি, স্যর?'

'না।' ব্রিজ ক্রু-দের আগ্রহী মুখগুলোর উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন। জানেন, অ্যাকশনের জন্য প্রুডো বে যাবার প্রয়োজন নেই, যা ঘটার তা এখানেই ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। ক্রু-রা সেটা যথাসময়ে টের পাবে। তিনি শুধু বললেন, 'যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে, বয়েজ। ...এবং পরিস্থিতি বলতে আমি সবচেয়ে খারাপটাই বোঝাচ্ছি।'

কাকটোভিক, আলাস্কা।

টারমাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টুইন অটারের চারপাশে ঘুরছে অ্যাবি, হাতে ফ্ল্যাশলাইট। বোঝার চেষ্টা করছে, আকাশযুদ্ধে কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওর বিমানের। একটা ডানায় অনেকগুলো বুলেটের গর্ত চোখে পড়ল, তবে কাঠামোগত কোনও ড্যামেজ নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ফুটোগুলো ডাক্ট টেপ দিয়ে মুড়ে দিলেই হয়, আপাতত আর কোনও মেরামত না করলেও চলবে।

আধঘণ্টা হলো কাকটোভিকের তুষারে ছাওয়া ছোট্ট ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে নেমে এসেছে ওরা। ফিউয়েল ততক্ষণে তলানিতে পৌঁছে গেছে, খক খক করে কাশছিল ইঞ্জিন। আরেকটু দেরি হলেই বিপদে পড়তে হতো। কপাল ভাল, তেমন কিছু ঘটেনি। ল্যাণ্ড করবার পরেই রানা, ম্যাসন আর রিচার্ডকে এয়ারস্ট্রিপের পাশের হ্যাঙারে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওখানে একটা মেকশিফট ডাইনার আছে, সেরে নিতে বলেছে খাওয়া-দাওয়া। ও রয়ে গেছে রিফিউয়েলিং আর বিমানের ড্যামেজ অ্যাসেসমেণ্টের জন্য। রানা সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজি হয়নি অ্যাবি, বলতে গেলে জোর করেই ওকে পাঠিয়েছে ম্যাসন আর রিচার্ডের সঙ্গে, বলেছে সবার জন্য খাবারের অর্ডার দিতে। সঙ্গী হিসেবে রয়ে গেছে শুধু লোবো, ঘুরঘুর করছে আশপাশে। মাথা ঘুরিয়ে চকিতের জন্য ডাইনারের দিকে তাকাল অ্যাবি, ঘোলা কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবাইকে, সামনে কফির মগ, ব্যস্ত গল্প-গুজবে। ইনুইট এক তরুণী ওখানকার ওয়েইট্রেস, মেয়েটা টেবিলের সামনে আসতেই ছেদ পড়ল আলোচনায়, হাসিমুখে কী যেন বলতে শুরু করল রানা মেয়েটাকে। বুকের মধ্যে ঈর্ষা অনুভব করল অ্যাবি, পরক্ষণেই চোখ রাঙাল নিজেকে। যে-কোনও মেয়ের সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে পারে রানা, ওতে ঈর্ষার কী আছে? ওর তো কেউ না ওই বাঙালি যুবক!

যুক্তিতে শান্ত হলো না মন। দুত্তোর বলে চোখ ফিরিয়ে নিল অ্যাবি। ঘুরে চলে এল বিমানের অন্যপাশে। বিশালদেহী এক মাঝবয়েসী লোক দাঁড়িয়ে আছে ফিউজেলাজের গায়ে হেলান দিয়ে, এক হাতে ধরে রেখেছে বিমানের গায়ে লাগানো ফিউয়েলিং হোস, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। হেক্টর হ্যাডরন, কাকটোভিকের এয়ারস্ট্রিপের মালিক। অ্যাবির পূর্ব-পরিচিত।

'ফিউয়েলিঙের সময় সিগারেট ধরানো কি উচিত?' বাঁকা গলায় বলল অ্যাবি।

‘কী করব?’ কাঁধ ঝাঁকাল হেক্টর। ‘বউয়ের সামনে ধরাতে পারি না যে!’ ইশারা করল ডাইনারের দিকে। কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যবয়সী স্ত্রী।

এককালে শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করত হেক্টর, প্যাট্রোল ফ্লিটের বোটগুলোর দেখাশোনা করত। পরে টাকা জমিয়ে চলে আসে কাকটোভিকে, পুরনো হ্যাঙারটা ভাড়া নিয়ে একটা রিপেয়ার শপ খুলে বসে। কয়েক বছর পরে একটা সাইট-সিয়িং কোম্পানিও চালু করে সে, আলট্রালাইট বিমানে চাপিয়ে ট্যুরিস্টদেরকে ন্যাশনাল রিজার্ভ ফরেস্টের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনত। অয়েল এক্সপ্লোরেশনের কল্যাণে বড় হয়েছে সেই ব্যবসা—ট্যুরিস্টদের পাশাপাশি এখন জিয়োলজিস্ট, রিপোর্টার আর সরকারি লোকজনও তার কাস্টোমার। সম্প্রতি পুরো এয়ারস্ট্রিপটা লিজ নিয়েছে সে, বড় করেছে আলট্রালাইট বিমানের বহর।

ফিউয়েল হোসের গজের দিকে তাকাল হেক্টর, বন্ধ করল তেলের প্রবাহ। বলল, ‘ভরে গেছে ট্যাঙ্কি।’ হোসটা খুলে নিল বিমানের গা থেকে। ‘দুটোই।’

‘ধন্যবাদ, হেক্টর।’

‘নো প্রবলেম, অ্যাবি।’ হোস গোটাতে শুরু করল হেক্টর। ‘বুলেটের গর্তগুলো কীভাবে হলো, জানতে পারি?’

‘লম্বা কাহিনি। পরে নাহয় কখনও বলব। অনেককিছু এখনও অস্পষ্ট।’

‘যেমন তোমার মর্জি,’ মুচকি হাসল হেক্টর। ‘কিন্তু ওই সুপুরুষটা কে, বলো দেখি! আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। আমেরিকানও মনে হচ্ছে না। নতুন বয়ফ্রেণ্ড?’

‘রানার কথা বলছ? না, না, বয়ফ্রেণ্ড না। স্রেফ ফ্রেণ্ড। মাসুদ রানা... নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ছুটি কাটাতে এসেছে আলাস্কায়।’

'যা-ই বলো, এমন হ্যাণ্ডসাম ছেলে খুব একটা চোখে পড়ে না। তোমার পাশে খুব মানাবে কিন্তু ওকে।'

'ধ্যাৎ! কী যে বলো না!' মুখ আরক্ত হলো অ্যাবির।

'কাম অন! বিমান থেকে নামার পর কীভাবে তাকাচ্ছিলে তুমি ওর দিকে... তা লক্ষ করেছি আমি।'

'ওটা ছিল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি... প্রশংসার দৃষ্টি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে এনেছে রানা। সেজন্যেই হয়তো...'

'দুঃসাহসী বলতে চাইছ? অনেক মিল তা হলে তোমাদের মধ্যে। দারুণ জুটি হবে...'

'থামবে?' প্রায় ধমকে উঠল অ্যাবি। হেক্টরের চেহারা থেকে হাসি মুছে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আ... আমি দুঃখিত, হেক্টর। আসলে এ-সব নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা...'

'ঠাট্টা করছি না, অ্যাবি,' বলল হেক্টর গম্ভীর গলায়, 'আমি সিরিয়াস। উপযুক্ত এক সঙ্গীর দরকার আছে তোমার। আর কতদিন এভাবে একা থাকবে?'

'একা থাকাই ভাল,' ভারী গলায় বলল অ্যাবি। 'আমি একটা অপয়া মেয়ে। আমার কপালে সুখ নেই। কেন খামোকা আরেকজনকে এ-জীবনের সঙ্গে জড়াব?'

'কেন বলছ এ-কথা? স্বামী-সন্তানকে হারিয়েছ বলে? দুর্ভাগ্য কি আসতে পারে না মানুষের জীবনে? তাই বলে সুখী হবার চেষ্টা করবে না... এটা কেমন কথা? বয়স তো এমন কিছু হয়নি, নতুন করে জীবন শুরু করতে বাধা কোথায়?'

'আমার জায়গায় যদি তুমি থাকতে...'

তিক্ত হাসি হাসল হেক্টর। 'ভাবছ তোমার চেয়ে খুব ভাল আছি আমি বা জিল? আজ পর্যন্ত বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি আমাদের। কোনোদিন হবেও না—ডাক্তাররা বহুদিন আগে জানিয়ে দিয়েছে

এ-কথা। তাই বলে কি হতাশার সাগরে ডুবে গেছি আমরা? না, বরং ভুলে যেতে চেয়েছি ওই সত্যকে। যা আছে, তা-ই নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করেছি। কষ্ট হয়েছে... অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে... কিন্তু হাল ছাড়িনি কোনোদিন।'

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল অ্যাবি। বলল, 'সেজন্যে শ্রদ্ধা করি তোমাদেরকে, অবাক হই। কিন্তু প্লিজ... আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বোলো না। নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব না আমি। অতীতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। স্বামী আর ছেলের স্মৃতিকে ভুলতে পারব না কিছুতেই।'

'যেখানেই থাকুক তোমার স্বামী আর ছেলে...' উদাস গলায় বলল হেক্টর, '...আমার মনে হয় না ওরা চায় তুমি বাকি জীবন অসুখী হয়ে থাকো। যাক গে, যা বলার বলে দিয়েছি আমি। মাসুদ রানা নামের ওই ভদ্রলোককে প্রথম দেখাতেই খুব ভাল লেগে গিয়েছিল, সেজন্যেই...' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তুমি যদি না চাও তো আমার আর কী করার আছে?'

ডাইনারের দরজা খুলে গেল। ওখান দিয়ে উঁকি দিল হেক্টরের স্ত্রী—জিল হ্যাডরন। কড়া গলায় বলল, 'অ্যাই, তোমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তো!'

'আসছি, ডিয়ার!' গলা চড়িয়ে বলল হেক্টর।

'অ্যাবি, কুকুরটা আসতে পারে, কিন্তু ওই লোকটাকে বলে দাও—সিগারেট নিয়ে ওকে আমি দরজা পেরুতে দেব না।'

'দেখলে তো?' গোমড়া মুখে অ্যাবিকে বলল হেক্টর, 'কী এক স্বৈরাচারী মহিলার সঙ্গে বাস করছি!'

হেসে ফেলল অ্যাবি। 'সিগারেট ফেলে দেয়াই মনে হয় ভাল। জিলকে রাগানো উচিত হবে না তোমার।'

আধ-খাওয়া সিগারেট পায়ের তলায় পিষে ফেলল হেক্টর। অ্যাবিকে নিয়ে এগোল ডাইনারের দিকে।

ষোলো

ড্রাকনের কন্ট্রোল স্টেশনে বসে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ, চোখ সামনের ভিডিও মনিটরে। সাবমেরিনের বাইরে একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে, সেটার ফিড ফুটে উঠছে পর্দায়। সাবমেরিনের এক্সটেরিয়র লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে মাথার উপরের ভাসমান বরফের স্তর। থারমাল সুট পরা চারজন ডাইভার গত আধঘণ্টা ধরে ওখানে একটা টাইটেনিয়ামের গোলক বসাচ্ছে। আইস-ক্যাপের তলা ফুটো করে এক মিটার লম্বা বেশ ক'টা অ্যাঙ্করিং বোল্ট লাগাতে হচ্ছে তাদেরকে, সেই বোল্টের সঙ্গে আটকানো হচ্ছে গোলকের ক্ল্যাম্প। পুরো জিনিসটা মাকড়সার মত সেঁটে যাচ্ছে আইস-ক্যাপের পেটের তলায়।

এ-ধরনের মোট পাঁচটা ডিভাইস এনেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, এটাই শেষ। বাকি চারটে লাগানো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মোটামুটি একশো বর্গকিলোমিটার এলাকার একটা বৃত্তের পাঁচটা পয়েন্টে বসানো হয়েছে ডিভাইসগুলো। কাল্পনিক দাগ টানা হলে পয়েন্টগুলো পরিণত হবে পাঁচ-মাথার একটা নিখুঁত তারকায়। এখন শুধু মাস্টার ট্রিগার বসানো বাকি... সেটা বসাতে হবে বৃত্তের ঠিক মাঝখানে।

ডাইভারদেরকে ছাড়িয়ে সামনের কালো পানির দিকে নজর

চলে গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের। কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন বিশাল সেই বরফ-দ্বীপ, আর তার ভিতরে লুকানো আইস স্টেশনটাকে। ট্রিগার স্থাপন করবার জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।

মস্কো থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পিতার গবেষণার সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করতে হবে নিকোলায়েভকে, তারপর ধ্বংস করে দিতে হবে আইস স্টেশন। কিন্তু কেউ জানে না, আরও বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি।

মনিটরের উপর আবার মনোযোগ দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ডিভাইস আটকানো হয়ে গেছে। একজন ডাইভার ওটার গায়ের সুইচ চাপতেই ঠিক মাঝ বরাবর একসারি নীলচে আলো জ্বলে উঠল। ব্যস, অ্যাকটিভেট হয়ে গেছে ওটা। আলোর তলায় ফুটে উঠেছে রাশান আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মনোগ্রাম।

'এগুলো স্রেফ সায়েন্টিফিক সেন্সর?' পাশ থেকে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। কণ্ঠে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট।

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বললেন নিকোলায়েভ। 'ব্যাথিমেট্রি টেকনোলজির লেটেস্ট আবিষ্কার। সি-লেভেলের ওঠানামা, স্রোতের গতি-প্রকৃতি, পানির লবণাক্ততা, বরফের ঘনত্ব... সবকিছু মাপা যাবে এই একটামাত্র ডিভাইসের সাহায্যে।'

ভুরু কোঁচকাল রুশকিন। বোকা নয় সে। অনেককিছুই আঁচ করতে পারে। কাগজে-কলমে তার মিশন হলো—রিয়ার অ্যাডমিরালকে কূটনৈতিক কাজে নিয়ে যেতে হবে আমেরিকান এক রিসার্চ স্টেশনে। কিন্তু হাবভাবে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এর পিছনে আরও কিছু আছে। যে-সব ইকুইপমেণ্ট আর অস্ত্র-শস্ত্র তোলা হয়েছে ড্রাকনে, তা কূটনৈতিক কাজে লাগতে পারে না। রিয়ার অ্যাডমিরাল যে এফএসবি-র তরফ থেকে গোপন একটা

মেসেজ পেয়েছেন, সেটাও তার অজানা নয়। কী ধরনের নির্দেশ এসেছে সে-বার্তায়, কে জানে।

'আপনি বলতে চাইছেন, এগুলোর কোনও মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন নেই?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'যেমন ধরুন, আমেরিকানদের ট্রান্সমিশনে আড়ি পাতা বা অন্য কিছু...'

কোনও জবাব দিলেন না নিকোলায়েভ। যা খুশি ভাবুক ক্যাপ্টেন, তাঁর কিছু যায়-আসে না। ডিভাইসটাকে আড়ি পাতার যন্ত্র ভাবলে বরং ভালই হয়।

রিয়ার অ্যাডমিরালের নীরবতার ভুল অর্থ করল রুশকিন। সন্তুষ্টির হাসি হাসল। ভাবছে ধরে ফেলেছে রহস্যটা। তার ভুল ভাঙানোর কোনও চেষ্টা করলেন না নিকোলায়েভ। আসল রহস্য যথাসময়ে জানবে লোকটা।

এক দশক আগে, আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট... সংক্ষেপে এএআরআই-এর বাছাই করা কিছু বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছিলেন তদানীন্তন ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ। কেউ সেটাকে অস্বাভাবিক ভাবেনি, সেভেরোমরস্ক নেভাল কমপ্লেক্সে সবসময়েই কোনও না কোনও পোলার রিসার্চ প্রজেক্ট চলতে থাকে। তবে *শকওয়েভ* নামের এই বিশেষ প্রজেক্টটা, পরিচালিত হচ্ছিল নিকোলায়েভের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। রিসার্চার-রা শুধুমাত্র তাঁর কাছেই রিপোর্ট করত, আর কারও কাছে নয়। অন্যান্য হাজারো প্রজেক্টের মাঝে নিজের প্রজেক্টের খবর লুকিয়ে রাখতে কোনও অসুবিধে হয়নি নিকোলায়েভের। কেউ কখনও এই প্রজেক্ট নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেনি... এমনকী দু'বছর আগে প্রজেক্টের ছয় বিজ্ঞানী যখন বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল, তখনও কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কাগজে-কলমে ওখানে স্রেফ সমাপ্তি ঘটেছে প্রজেক্ট শকওয়েভের। সেভেরোমরস্ক নেভাল কমপ্লেক্সে চলতে থাকা গবেষণা কাজের

ব্যাপারে এমনই উদাসীন কর্তৃপক্ষ। কেউ জানেও না, দুর্ঘটনার অন্তত এক বছর আগে সফল হয়েছে প্রজেক্ট। টাইটেনিয়ামের ওই গোলক সেই প্রজেক্টেরই ফলাফল।

শুরুটা ছিল খুব সাধারণ—১৯৭৯ সালে একটা রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডের সম্পর্ক এবং এর সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে। পোলার আইস ক্যাপ গলে গেলে কী ঘটবে, সে-ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল বিশ্বকে। বলা বাহুল্য, রাশায় এই ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার দায়িত্ব পায় আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট। লম্বা একটা সময় ধরে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ওরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়: গ্রিনল্যাণ্ড আর অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে গেলে দুনিয়াজুড়ে সি-লেভেল বেড়ে যাবে পুরো দুইশ' ফুট! কিন্তু উত্তর মেরুর বরফ নিয়ে অমন চিন্তার কিছু নেই বলে রায় দেয় ওরা। ওই বরফ এমনিতেই পানিতে ভাসছে, কাজেই গলে গেলেও পানির উচ্চতা বেশি বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেকটা গ্লাস-ভর্তি পানিতে আইস কিউব গলবার মত ব্যাপার আর কী।

মোটামুটি বছর দশেক চলেছে এই থিয়োরি, এরপরেই এএআরআই-এর এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন—পৃথিবীর ডগা থেকে রাতারাতি পোলার আইস ক্যাপ উধাও হয়ে গেলে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। আর্কটিক সাগরের ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে আইস ক্যাপ, এ-জিনিস না থাকলে সৌরশক্তি প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা হারাবে সাগরটা। পানি বাষ্পীভূত হবে অতি দ্রুত, অ্যাটমোস্ফিয়ারে ঢুকে পড়বে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে জলকণা। এই জলকণা পুরো পৃথিবীজুড়ে বাড়িয়ে দেবে বৃষ্টিবাদল আর তুষারপাত। এর ফলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে পরিবেশে। দেখা দেবে বন্যা, ক্ষতি করবে কৃষিকাজের, নষ্ট হয়ে

যাবে ইকোসিস্টেম। অচল হয়ে পড়বে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি। নড়ে যাবে পৃথিবীর ক্ষমতার ভারসাম্য।

ব্যাপারটার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৯৭ সালে, যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ স্রোতের গতিপথে সামান্য পরিবর্তন ঘটল। এর ফলে তীব্র তাপপ্রবাহে আক্রান্ত হলো ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া-সহ প্যাসিফিকের পশ্চিমদিকের সমস্ত দ্বীপ... সেইসঙ্গে পেরু থেকে শুরু করে মেক্সিকো পর্যন্ত সেন্ট্রাল আমেরিকার সবগুলো দেশ। জাতিসংঘের হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল সে-সময়, অর্থনীতিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নব্বুই বিলিয়ন ডলারের। এ কেবল এক বছরের হিসাব, তাপপ্রবাহ দীর্ঘ সময় অক্ষুণ্ন থাকলে আরও কত কী ঘটতে পারত, তা কল্পনা করা যায় না। পোলার আইস ক্যাপ গলে গেলে ঠিক তেমনই একটা ঘটনা ঘটবে। তবে তার প্রভাব শুধু আর্কটিক সাগরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে পুরো পৃথিবীর বুকে। বদলে যাবে পরিবেশ ও জলবায়ু... এমন এক বিপর্যয় দেখা দেবে, যা দুনিয়ার ইতিহাসে কোনোদিন দেখা যায়নি।

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের সম্ভাবনার সপক্ষে জোরালো প্রমাণ থাকায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। গঠন করা হয় বড় বড় বিশেষজ্ঞ-দল, তাঁরা খোঁজ নিতে শুরু করেন, কোনোভাবে পোলার আইস ক্যাপ গলিয়ে দেয়া সম্ভব কি না। তবে খুব শীঘ্রি জানা গেল, আইস ক্যাপ গলাবার জন্য যে-ধরনের এনার্জি দরকার, তার অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে। এমনকী নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটিয়েও এ-কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে ওখানেই চুকে-বুকে গেল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এএআরআই-এর এক বিজ্ঞানী হাজির হলেন ইন্টারেস্টিং আরেক থিয়োরি নিয়ে। তাঁর মতে, বিপর্যয়ের জন্য গোটা আইস ক্যাপ গলানোর কোনও প্রয়োজন নেই,

প্রয়োজন শুধু এর ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়া। যদি আইস ক্যাপের সামান্য অংশ গলিয়ে দেয়া যায়, এবং বাকিটুকুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়, তা হলে আর্কটিকের একটা গ্রীষ্মই অবশিষ্ট কাজ করবার জন্য যথেষ্ট। আইসক্যাপ ভেঙে দেয়া হলে সূর্যকিরণ সাগরপৃষ্ঠের অনেক বেশি জায়গায় পৌঁছুতে পারবে, গরম করে তুলতে পারবে ভাঙা বরফের আশপাশের পানি। ফলে ছোট টুকরোগুলো সহজেই গলে যাবে গরম পানির সংস্পর্শে এসে। সোজা কথায়—নিউক্লিয়ার বোমার প্রয়োজন নেই, সূর্যকে কাজে লাগিয়েই ঘটানো সম্ভব বিপর্যয়। বসন্তের শেষভাগে যদি ওটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া যায়, তা হলে গ্রীষ্মের শেষে আইস ক্যাপের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

কথা হলো, কীভাবে করা যাবে এ-কাজ? উত্তরটা পাওয়া গেল ১৯৯৮ সালে। এএআরআই-এর আরেক বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন আর্কটিক আইস প্যাকের ক্রিস্টালাইযেশন এবং প্রেশার রিজের গঠন নিয়ে। সাগরের স্রোতের প্রভাব বিশ্লেষণ করে হারমোনিক্স-এর থিয়োরি খাড়া করেন তিনি। এই থিয়োরি হচ্ছে: বরফ আসলে অন্য যে-কোনও স্ফটিকের মতই ঠুনকো এক বস্তু, তীব্র প্রেশারের মাঝে সঠিক ফ্রিকোয়েন্সির শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জায়গামত আঘাত হানতে পারলেই পুরো আইস ক্যাপ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ঠিক কাঁচের মত!

হারমোনিক্সের এই থিয়োরি থেকেই উৎপত্তি হয় প্রজেক্ট শকওয়েভের। বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিমভাবে এমন একগুচ্ছ হারমোনিক ওয়েভ এবং হিট সিগনেচার তৈরি করা, যার সাহায্যে পোলার আইস ক্যাপ ভেঙে চুরমার করে দেয়া যায়।

ভিডিও মনিটরে জ্বলজ্বল করছে টাইটেনিয়ামের গোলক, উত্তেজনা অনুভব করলেন নিকোলায়েভ। কবজিতে একটা রিস্ট মনিটরও

আছে তাঁর, তাকালেন সেটার দিকে। প্লাজমা স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু—নির্দেশ করছে সবগুলো ডিভাইসের অবস্থান। ঠিক মাঝখানে জ্বলবে আরেকটা বিন্দু, যখন তিনি মাস্টার ট্রিগারটা ইন্সটল করবেন। বেশি দেরি নেই তার। হালকা এক টুকরো হাসি ফুটল রিয়ার অ্যাডমিরালের ঠোঁটে।

প্রজেক্ট শকওয়েভের মৃত বিজ্ঞানীরা ডিভাইসের তারকা-প্রতিম কনফিগারেশনের নাম দিয়েছিল *পোলারিস অ্যারে*... ধ্রুবতারার নামে। তবে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের মাস্টার ট্রিগারটার নাম অনেক বেশি টেকনিকাল—ওটা একটা সাবসোনিক ডিজরাপ্টার ইঞ্জিন। অ্যাকটিভেট হবার পর দুই ধাপে কাজ করবে ওটা। প্রথমে একটা সনাতন আণবিক বোমার মত বিস্ফোরিত হবে, ধ্বংস করে দেবে এক মাইল ব্যাসের মধ্যকার সবকিছু; তবে তারপর ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক পালস ছড়াবে না অন্যান্য বোমার মত। তার বদলে ছড়িয়ে দেবে হারমোনিক ওয়েভ। এই তরঙ্গ একসঙ্গে আঘাত হানবে পাঁচটা গোলকের গায়ে, ঘটাবে পরবর্তী বিস্ফোরণ। হারমোনিক ওয়েভ সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় কয়েক গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে আরও বেশি জায়গা জুড়ে। পুরো পোলার আইস ক্যাপে ফাটল ধরানোর জন্য সেটাই হবে যথেষ্ট।

রুমাল দিয়ে রিস্ট মনিটর পরিষ্কার করলেন নিকোলায়েভ, তারপর ওটা ঢুকিয়ে ফেললেন শার্টের হাতার তলায়। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ওটার এক কোণে লাল রঙের একটা হৃৎপিণ্ড আকৃতির আইকন জ্বলছে-নিভছে... রিয়ার অ্যাডমিরালের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে ওটা।

অস্থিরতা অনুভব করলেন নিকোলায়েভ, আর তর সইছে না। কিন্তু এ-ও জানেন, অস্থির হয়ে লাভ নেই। ধৈর্য ধরতে হবে তাঁকে। এতদিন তো তা-ই করেছেন। পুরো দুইটা বছর! অপেক্ষায় ছিলেন মোক্ষম সুযোগের... অবশেষে পেয়েছেন সেটা।

ভাগ্যও তাঁকে সহায়তা করেছে। নইলে এত বছর পর আবিষ্কৃত হবে কেন আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল? সেই জায়গা, যেখানে তাঁর পিতা ইগোর নিকোলায়েভ ঘুমিয়ে আছেন! মনের সব আশা পূর্ণ হবে এবার। পিতার মৃতদেহ উদ্ধার করবেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানাবেন, তারপর ফাটিয়ে দেবেন পোলারিস ডিভাইস... বদলে দেবেন পৃথিবীটাকে।

ভিডিও মনিটরের উপর আবার নজর দিলেন নিকোলায়েভ। ড্রাকনের এক্সটেরিয়র লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আঁধারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে পোলারিস ডিভাইসের নীল আলো। যেন পানির তলায় ওটা আরেক ধ্রুবতারা।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজেক্ট শকওয়েভ শুরু করেছিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। ১৯৮৯ সালের এএআরআই রিপোর্টের শেষভাগের একটা অংশ পড়ে আইডিয়াটা মাথায় আসে তাঁর। পোলার আইস ক্যাপ ধ্বংস হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার ঘটবে—আর সেটা হবে দীর্ঘমেয়াদী। বৃষ্টি ও তুষার হয়ে আর্কটিক সাগরের বাষ্পীভূত পানি ঝরবে স্থলভাগের উপরে, তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে সেই পানি পরিণত হবে বরফে... পুরো পৃথিবী ঢেকে যাবে গ্লেসিয়ার আর বরফের চাদরে। সূচনা ঘটবে নতুন এক বরফ যুগের!

পোলারিস ডিভাইসের আলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন নিকোলায়েভ। কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। বরফে জমে মারা গেছেন তাঁর পিতা, তাঁকেও মুরমানস্কের এক বরফাচ্ছাদিত ঘাঁটিতে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। এ-সব অবিচারের প্রতিশোধ নেবেন তিনি... পুরো দুনিয়াকে বরফে জমিয়ে দিয়ে!

সতেরো

ভোর পাঁচটা তেতাল্লিশ।

পোলার আইস ক্যাপের উপর দিয়ে উড়ছে টুইন অটার। কো-পাইলটের সিট থেকে এক লাফে সূর্যকে দিগন্ত ডিঙিয়ে উঠে আসতে দেখল রানা। নীচের বরফের গায়ে প্রতিফলিত হলো তীব্র আলো, আঘাত করল চোখে। অ্যাবির চোখে এভিয়েটর সানগ্লাস আছে, কিন্তু ওর চোখে নেই, মুখের সামনে হাত তুলতে হলো রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য।

ওকে নড়তে দেখে মাথা ঘোরাল অ্যাবি। 'গুড মর্নিং!'

জবাবে একটু হাসল রানা। জানতে চাইল, 'কদ্দূর এসেছি?'

'আর বড়জোর আধঘণ্টা,' বলল অ্যাবি। 'আশা করি ব্রেকফাস্ট ধরতে পারব ওখানে পৌঁছে।'

'ভাল,' বলল রানা। কফি দরকার ওর, মাথা টনটন করছে। ঘুম পুরো হয়নি। কাকটোভিক থেকে টেকঅফ করার পর ও-ই দায়িত্ব নিয়েছিল ফ্লাইঙের... মেয়েটাকে ঘুমাতে দিয়েছে রাত তিনটে পর্যন্ত। অ্যাবি জেগে ওঠার পর চেষ্টা করেছিল নিজে ঘুমাতে, কিন্তু নানান দুশ্চিন্তায় এক হতে চায়নি দু'চোখের পাতা। ঘণ্টাখানেক আগে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিল, কিন্তু সেটা বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট নয়।

সিটে সোজা হয়ে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চোখ বোলাল রানা। সকালটা অদ্ভুত সুন্দর। দক্ষিণ-পুবদিক থেকে আসছে

নির্মল হাওয়া, সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আইস ক্যাপের উপর জমে থাকা কুয়াশা। নীচে দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র প্রান্তর—কোথাও উঁচু-নিচু, কোথাও বা মসৃণ। কোথাও ধবধবে সাদা, কোথাও বা নীলচে রঙের পোঁচ। সদ্য উদয় হওয়া সূর্যের লালচে আলো আছড়ে পড়ছে এই বরফের বুকে, প্রতিফলিত হয়ে গোটা আকাশ রাঙিয়ে তুলছে রঙধনুর সাত রঙে।

'ঝড় আসছে,' ভারী কণ্ঠ শোনা গেল পিছন থেকে। ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন রিচার্ড ম্যানিটক। হাই তুললেন শব্দ করে।

'কোন্‌দিক থেকে?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

রিচার্ড জবাব দেবার আগেই গোঙানির মত আওয়াজ করল ম্যাসন। বৃদ্ধ ইনুইটের পাশের সিটে গুটিসুটি হয়ে ঘুমাচ্ছিল, কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেছে। বিমানের পিছন দিক থেকে লোবোও মাথা বের করল। নিচু লয়ে গরগর করে উঠল প্রাণীটা।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন রিচার্ড, আঙুল তাক করলেন উত্তরদিকের আকাশে। ওদিকটায় এখনও আবছা অন্ধকার, তার মাঝে সাদাটে কী যেন পাক খাচ্ছে।

'আইস ফগ,' বললেন তিনি। 'সূর্য ওঠা সত্ত্বেও কমছে তাপমাত্রা। তুষারঝড়ের লক্ষণ।'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো রানা। ওর চেহারা গম্ভীর হয়ে গেছে।

ঝড় মানেই বিপদ। মেরু এলাকার আবহাওয়ায় হালকা ঝড় বলে কিছু নেই। হয় ফকফকে পরিষ্কার থাকবে, নয়তো তুমুল আক্রোশ নিয়ে শুরু করবে তাণ্ডব। এই অক্ষাংশে বাতাসের গতিও হয় ভয়াবহ। লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু। তুষারঝড়ের মাঝখানে দুই ফুটও দৃষ্টি চলে না।

অ্যাবির দিকে ফিরল রানা। 'ঝড় আসার আগেই পৌঁছুতে পারবে ড্রিফট স্টেশনে?'

'পারা উচিত,' জানাল মেয়েটা।

'ঝুঁকি নিয়ো না। যতটা দ্রুত পারো এগোও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোলের উপর বিছিয়ে রাখা ম্যাপ স্টাডি করল অ্যাবি। বলল, 'মি. ম্যাসনের কো-অর্ডিনেটস্ যদি ঠিক থাকে, তা হলে বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'রেডিওতে যোগাযোগ করবে নাকি?' রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন। 'আমরা যে আসছি, সেটা ওদেরকে আগেভাগে জানিয়ে দেয়া ভাল না?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কী চলছে ওখানে, তার কিছুই জানি না। এখুনি ওদেরকে সতর্ক করে দেবার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া... রেডিও কমিউনিকেশন এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি।'

রাতভর সমস্ত ওপেন চ্যানেলে রেডিও মনিটর করেছে ও। ভাঙা ভাঙা ট্রান্সমিশন যতটুকু রিসিভ করতে পেরেছে, তাতে বোঝা গেছে, ক্রুডো বে-র দুর্ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে সবখানে। ম্যাসনের ধারণাই ঠিক, নিউজ এজেন্সিগুলো তড়িঘড়ি করে লোক পাঠাতে শুরু করেছে অকুস্থলে।

সিটের উপর সিধে হলো ম্যাসন। বলল, 'আচমকা ওখানে হাজির হবার ব্যাপারে কী ব্যাখ্যা দেব আমরা? মিস ম্যানিটক অবশ্য ল'অফিসার হিসেবে তদন্তের দোহাই দিতে পারবেন...'

'উঁহুঁ,' অ্যাবি বলল। 'ওখানে আমার কোনও এখতিয়ার নেই। বোলচাল মারতে গেলে বরং ঝামেলা বাধার সম্ভাবনা আছে। তারচেয়ে সব ঘটনা খুলে বলব আমরা, সতর্ক করে দেব ওখানকার লোকজনকে। যারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল, মনে হয় না তারা খুব একটা পিছনে আছে।'

শূন্য আকাশে শঙ্কিত ভঙ্গিতে চোখ বোলাল ম্যাসন, যেন তাকালেই দেখতে পাবে ধাওয়াকারীদেরকে। 'ওখানে আমরা প্রোটেকশন পাব কি না, কে জানে।'

তার দিকে ফিরল রানা। 'ওমেগা বেইস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি জানেন আপনি। ওখানে কী ধরনের নেভাল কণ্টিনজেন্ট আছে, বলতে পারেন?'

'আমাকে আসলে তেমন কোনও স্পেসিফিকস্ দেয়া হয়নি,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল ম্যাসন। 'প্রুডো বে-তে নামার পর কণ্ট্যাক্টের কাছ থেকে সব জেনে নেবার কথা ছিল... কিন্তু সে-সুযোগ তো পেলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নাহ্, এই লোকের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাচ্ছে না। নিজেই ভাবতে শুরু করল, একটা রিসার্চ স্টেশনে কী ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। নেভি যখন নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে, তারমানে অন্তত একটা সাবমেরিন আছে... সেইসঙ্গে বেইসের ভিতরে সিকিউরিটি পার্সোনেল। মিডিয়া ব্ল্যাকআউট পালন করছে ওরা, কাউকে সহজভাবে অভ্যর্থনা জানাবে বলে মনে হয় না। বাধাও দিতে পারে। অবশ্য ঝড়টা ওঠায় একটা উপকার হবে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চাইলেও ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না রিসার্চ বেইসের লোকজন, আশ্রয় দিতেই হবে।

'ঠিক আছে, অ্যাবি যেভাবে বলেছে, সেভাবেই এগোব আমরা,' জানাল রানা সঙ্গীদেরকে।

পরের কিছুটা সময় নীরবতায় কাটল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সবাই। হঠাৎ রিচার্ড বললেন, 'উত্তরদিকে কী যেন দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত লাল রঙের বিল্ডিং।'

'হ্যাঁ, বিল্ডিং-ই,' রানা জানাল।

'ওটাই আমাদের ড্রিফট স্টেশন?' সাগ্রহে জানতে চাইল ম্যাসন।

'আমি শিয়োর না,' ম্যাপ মেলাল অ্যাবি। 'আপনার দেয়া কো-অর্ডিনেটসে পৌঁছুতে এখনও ছয় মাইল বাকি।'

'আমার মনে হয় এটাই,' বলল রানা। 'ড্রিফট স্টেশন নাম তো আর এমনি এমনি হয়নি। নিশ্চয়ই দ্বীপটা স্রোতে ভেসে ছ'মাইল সরে এসেছে।'

'মনে হয় ঠিকই বলছ।'

টুইন অটারের কোর্স বদলাল অ্যাবি, এগোল বিল্ডিংগুলোর দিকে। কাছাকাছি যেতেই পরিষ্কার হলো খুঁটিনাটি। বিল্ডিং নয়, আসলে ওগুলো জেমসওয়ে হাট—অত্যন্ত মজবুত, আর্কটিক অঞ্চলের কথা ভেবে তৈরি করা। বৃত্তাকার ফরমেশনে মোট পনেরোটা হাট দেখা যাচ্ছে, ঠিক মাঝখানটায় উঁচু একটা পোলের ডগায় উড়ছে আমেরিকার পতাকা।

'যাক, অন্তত একটা আমেরিকান বেইসে পৌঁছাচ্ছি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাসন।

'এটা ওমেগা স্টেশন হতে বাধ্য,' জোর গলায় বলল রানা।

কয়েকটা ভেহিকল পার্ক করে রাখা হয়েছে বেইসের বাইরে। কাছেই রয়েছে একটা পলিনিয়া, সেখান থেকে একটা ট্র্যাক গেছে হাটগুলোর দিকে। আরেকটা ট্র্যাক দেখা গেল বরফের গায়ে—বেইস থেকে বেরিয়ে চলে গেছে দূরের পাহাড়ের উদ্দেশে। ঠিক কোন্ জায়গায় গেছে এই ট্র্যাক, বোঝা গেল না। তার আগেই বাঁক নিয়ে বিমানকে নীচের সঙ্গে অ্যালাইন করল অ্যাবি। বেইসের পাশের সমতল একটা জায়গায় ল্যাণ্ড করতে চলেছে।

টুইন অটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কিছু মানুষ। সবার গায়ে পারকা, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। পোলার ক্যাপের এই নির্জন এলাকায় বিনা নোটিশে কারও আগমন খুবই অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। নীচের দিকে চোখ বুলিয়ে একটু স্বস্তি অনুভব করল রানা—লাল, নীল, সবুজ... হরেক রঙের পারকা দেখা যাচ্ছে। তারমানে এরা সবাই সিভিলিয়ান—সাধারণ মানুষ। একটা সাদা পারকা নেই ওদের

মাঝে। সাদা হলো আর্কটিক অঞ্চলের ক্যামোফ্লাজের রঙ... মিলিটারির পোশাক।

ল্যাণ্ডিং গিয়ার ডিপ্লয় করল অ্যাবি, নামিয়ে দিল ফ্ল্যাপ। তারপর উঁচু গলায় নির্দেশ দিল, 'সবাই সিটবেল্ট বাঁধুন!'

উপর থেকে সমতল দেখালেও আইসফিল্ড আসলে এবড়ো-খেবড়ো। স্কি-তে ভর দিয়ে তার উপর নেমে এল টুইন অটার, শুরু হলো প্রবল ঝাঁকুনি। পুরো ফিউজেলাজ যেন আর্তনাদ করে উঠল তাতে। দ্রুত পাওয়ার অফ করল অ্যাবি, এয়ারব্রেক ব্যবহার করল। গতি কমতে শুরু করল বিমানের। একটু পরে থেমে গেল পুরোপুরি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আরোহীরা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বরফ আর বরফ। তার মাঝখানে বেমানানভাবে মাথা তুলে রেখেছে ড্রিফট স্টেশনের কুঁড়েগুলো।

'ওয়েলকামিং পার্টি আসছে।' টুইন প্রপেলারের গুঞ্জন থেমে গেলে বলে উঠল অ্যাবি।

ছ'টা স্নোমোবিল দেখতে পেল রানা, বেইসের দিক থেকে তুষার উড়িয়ে ছুটে আসছে। আরোহীদের পরনে নীল রঙের পারকা, বুকের কাছে নেভির ইনসিগনিয়া। নিশ্চয়ই বেইস সিকিউরিটি। কাছাকাছি এসে থামল তারা। সামনের স্নোমোবিল থেকে একজন আরোহী নেমে পড়ল। মুখের কাছে একটা বুলহর্ন তুলে নির্দেশ দিল:

'বিমান থেকে নেমে আসুন এক্ষুণি। দু'হাত মাথার উপর তুলে রাখবেন। পালানোর চেষ্টা, অথবা কোনও ধরনের সন্দেহজনক আচরণ দেখলে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব আমরা।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অভ্যর্থনার প্রকৃতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খারাবি আছে কপালে!

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

হতভম্ব হয়ে বায়োলজিস্ট টিমের কাজকর্ম দেখছে শ্যারন। রাতটা স্টেশনেই কাটিয়েছে ও, কিন্তু কল্পনা করতে পারেনি, রাতের ভিতর এত কিছু করে ফেলবে এরা। অবশ্য এ-ও ঠিক—স্নেক পিটের ভিতরে দিন-রাতের পার্থক্য বলে কিছু নেই। ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেবার সময় সম্পর্কে সম্ভবত কোনও ধারণাই ছিল না ড. কনওয়ে বা তাঁর টিমের। ওদের কাণ্ড-কারখানা বিস্ময় নিয়ে দেখতে থাকল ও।

'সাবধান!' আইস রিঙ্কের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন কনওয়ে। এত দূর থেকেও তাঁর ঠোঁট নড়তে দেখল শ্যারন।

প্রৌঢ় বায়োলজিস্টের তত্ত্বাবধানে একটা লাইটপোস্ট খাড়া করছে দু'জন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট। এই নিয়ে চারটা লাইট স্থাপন করা হলো ক্লিফ ফেসটাকে আলোকিত করে তুলবার জন্য। কাছাকাছি চলছে একটা ডিজেল জেনারেটর, বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বাতি আর অন্যান্য ইকুইপমেন্টে। আইস রিঙ্কের উপর দিয়ে গেছে ওটার আঁকাবাঁকা তারের কুণ্ডলী।

জমাট বাঁধা জলাশয়টার উপরিভাগে বিভিন্ন জায়গায় গাঁথা হয়েছে ছোট ছোট লাল পতাকা। মোটামুটি একই অবস্থা ক্লিফ ফেসেরও। বেশ ক'টা স্টিলের মই ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ওটার গায়ে। অসংখ্য পতাকা শোভা পাচ্ছে এখানে-ওখানে। বিভিন্ন স্পেসিমেনের অবস্থান নির্দেশ করছে ওগুলো। আইস রিঙ্কের কয়েক জায়গা আবার হলুদ ফিতে দিয়ে কর্ডন করে রাখা হয়েছে, বরফে আটকা পড়া গ্রেণ্ডেলগুলো রয়েছে ওখানে।

ড. কনওয়ের আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। শুধু বায়োলজি টিমই নয়, অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও বেশ কিছু কৌতূহলী সদস্যকে দেখা যাচ্ছে গুহার ভিতর। তাদের মাঝে সুইডিশ ওশনোগ্রাফার ড. মিকেলসেনকে দেখতে পেল শ্যারন। আইস

রিঙ্কের একপাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তিনি, গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন বরফের দিকে। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ও।

গায়ে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে তাকালেন মিকেলসেন। 'সুপ্রভাত, ড. রেকেট,' হাসিমুখে বললেন তিনি। 'আইস স্টেশনের ম্যানকাট দেখতে এসেছেন?'

'গতকালই দেখে গেছি,' বলল শ্যারন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিকেলসেন। থুতনি চুলকালেন। 'অসাধারণ এক আবিষ্কার... কী বলেন?'

'হ্যাঁ। ঠিক যেন গল্পগাথার গ্রেণ্ডেল।'

'অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্,' শুধরে দিলেন মিকেলসেন। 'আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে... মানে, আমাদের হার্ভার্ড এক্সপার্ট যদি ভুল করে না থাকে আর কী... অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্ আর্কটোস্।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। অলরেডি আর্কটিক সাব-স্পিশিজের নাম জুড়ে দিয়েছেন ড. কনওয়ে, মানে প্রজাতিটাকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিতে দেরি করছেন না তিনি। 'কী মনে হয় আপনার?' মিকেলসেনকে জিজ্ঞেস করল ও। 'ক্লেইমটা কতখানি অথেনটিক?'

'থিয়োরিটা ইন্টারেস্টিং—প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর পোলার অ্যাডাপটেশন,' স্বীকার করলেন ওশনোগ্রাফার। 'কিন্তু এই থিয়োরি প্রমাণ করবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে কেভিনকে।'

'গবেষণার জন্য স্পেসিমেনের অভাব নেই ওঁর,' মনে করিয়ে দিল শ্যারন।

'তা অবশ্য ঠিক। নিখুঁতভাবে জমাট বেঁধেছে প্রতিটা স্পেসিমেন। একটাকেও যদি ঠিকমত গলাতে পারে...'

কথা শেষ হলো না তাঁর, হৈচৈ-এর আওয়াজ শুনে মাথা

ঘোরালেন। ড. কনওয়ে উঁচু গলায় কথা বলছেন সুঠামদেহী একজনের সঙ্গে। ড. জেফরি বেনটন... জিয়োলজি টিমের প্রধান। শ্যারনকে বাদ দিলে ওমেগা স্টেশনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে-ই সর্বকনিষ্ঠ, টেনেটুনে চল্লিশ হতে পারে বয়স। কিন্তু তাই বলে পনেরো বছরের সিনিয়র কনওয়েকে ছেড়ে কথা বলছে না। মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে হাতাহাতি বেধে যাবে দু'জনের মধ্যে।

'মর জ্বালা,' বিরক্ত গলায় বললেন মিকেলসেন। 'গত একঘণ্টায় এই নিয়ে তিনবার লাগল ওরা!'

'দাঁড়ান, দেখি সমস্যাটা কী।' বলে পা বাড়াল শ্যারন।

'ডিপ্লোম্যাট সাজতে যাচ্ছেন?' বাঁকা গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিকেলসেন।

'না... যাচ্ছি বেবিসিটার সাজতে,' মুচকি হেসে জবাব দিল শ্যারন।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝগড়ারত দুই বিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছুল ও। কিন্তু ওকে যেন দেখতেই পেল না তারা।

ড. কনওয়ে বললেন, '...যতক্ষণ না সমস্ত স্পেসিমেন সংগ্রহ হচ্ছে, তার আগে এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না আমরা। এখনও তো ছবি তুলতেই শুরু করিনি!'

'চান তো এখানে ঘর-সংসারও শুরু করতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই,' খোঁচা মারা সুরে বলল বেনটন। 'কিন্তু এই ক্লিফ ফেস তৈরি হয়েছে ভলক্যানিক ব্যাসল্ট দিয়ে। ড্রিল করে এখান থেকে কয়েকটা স্যাম্পল তুলতেই হবে আমাকে।'

'কয়েকটা মানে ক'টা?'

'বিশটার বেশি নয়।'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল কনওয়ের। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? অতগুলো ফুটো করলে পুরো ক্লিফ ধসে পড়তে পারে। সমস্ত স্পেসিমেন আর ডেটা হারাব আমরা।'

'একগাদা মরা প্রাণীর চেয়ে আমার কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ!' সমান তেজে বলল বেনটন।

'কী বললে?' চেঁচিয়ে উঠলেন কনওয়ে।

মারামারি বেধে যাবার উপক্রম। নাক না গলিয়ে উপায় নেই। কড়া গলায় শ্যারন ধমকে উঠল, 'থামবেন আপনারা?'

থমকে গেল দুই বিজ্ঞানী। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল শ্যারন। কোমরে হাত দিয়ে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সমস্যা কোথায়, জানতে পারি?'

'আপনি আসায় খুব ভাল হলো, ড. বেকেট,' হড়বড় করে বলল বেনটন। 'বায়োলজি টিমকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি আমরা, কিন্তু ওঁরা আচরণ করছেন ঠিক একনায়কের মত। এখান থেকে স্যাম্পল সংগ্রহের অধিকার আমাদেরও আছে। এত বড় একটা আবিষ্কার...' ক্লিফ ফেসের দিকে ইশারা করল সে, '...সব ডক্টর কনওয়েয়ের একার সম্পত্তি হতে পারে না।'

'আবোল-তাবোল বকছে ও,' ফুঁসে উঠলেন কনওয়ে। 'মাত্র এক রাত পেয়েছি আমরা সাইট প্রিপারেশনের জন্য। আমাদের কালেকশন প্রসিডিওর ওদের বুলডোজিং টেকনিকের চেয়ে অনেক বেশি ডেলিকেট। কেসটা স্রেফ প্রায়োরিটির। আমার কাজে ওরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কিন্তু ওর কাজে আমার সমস্ত স্পেসিমেন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচাল বেনটন। 'সাবধানে কয়েক জায়গায় ড্রিল করব আমি; খেয়াল রাখব যাতে ফসিলগুলোর কোনও ক্ষতি না হয়।'

'ধুলো... ভাইব্রেশন... এগুলোকে ছোট করে দেখার কোনও অবকাশ নেই।' শ্যারনের দিকে তাকালেন কনওয়ে। 'আপনি কিন্তু গতকালই আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। 'জেফরি, ড. কনওয়ে ঠিকই বলছেন।

তা ছাড়া এত তাড়াহুড়োরও কিছু দেখছি না। পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে আছে ক্লিফটা। আর দু'চারদিনে কোথাও পালিয়ে যাবে না। একটু ধৈর্য ধরুন।'

'অন্তত দশ দিন চাই আমার,' বলে উঠলেন কনওয়ে।

'তিনদিন পাচ্ছেন আপনি,' বলল শ্যারন। 'এরপর ড. বেনটন তাঁর স্যাম্পল জোগাড় করবেন। ঠিক আছে? আমি আর কিছু শুনতে চাই না।'

মুখ কালো হয়ে গেল দুই বিজ্ঞানীর। সিদ্ধান্তটাতে কেউই খুশি হয়নি। কিন্তু পরোয়া করল না শ্যারন। দু'জনই যদি অসন্তুষ্ট হয়, একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। একজন খুশি, আর অন্যজন খেপলেই মুশকিল। ওদেরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ড. মিকেলসেনের কাছে ফিরে এল ও।

'চমৎকার সামলেছেন,' প্রশংসার সুরে বললেন ওশনোগ্রাফার। 'মনে হচ্ছিল আরেকটু হলেই নিলডাউন করিয়ে বেত মারবেন ওদেরকে।'

'সম্ভব হলে মন্দ হতো না,' শ্যারনও এবার হাসল।

'আসুন,' ইশারা করলেন মিকেলসেন। 'কীসের জন্য কনওয়ে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তা আপনাকে দেখাই।'

হাত ধরে শ্যারনকে ক্লিফ ফেসের ফাটলের দিকে নিয়ে চললেন তিনি। দ্বিধা ভর করল শ্যারনের ভিতরে। বিচ্ছিরি ওই দৃশ্য আবার দেখতে চায় না। 'ওই জায়গায় আমি গেছি, ড. মিকেলসেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ঝগড়াটে বিজ্ঞানী এরপরে কী করেছে, তা কি দেখেছেন?'

কৌতূহল অনুভব করল শ্যারন এবার। দ্বিধা ঝেড়ে এগোল ফাটলের দিকে। আজ আর থারমাল সুট পরেনি ও; পরেছে স্রেফ জিন্স, বুট, উলের সোয়েটার আর একটা ধার করা পারকা।

ফাটলের কাছে পৌঁছুতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসা গরম বাতাসের একটা ঝাপটা অনুভব করল।

এখনও ওর হাত ছাড়েননি মিকেলসেন। ফাটলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। পরমুহূর্তে নাকে ঝাপটা মারল হালকা একটা বোটকা গন্ধ... গরম বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে ওপাশ থেকে। লক্ষ করল, ছপছপ আওয়াজ তুলছে বুট—বরফ গলে পায়ের তলায় বইছে পানির মৃদু ধারা। ছাত থেকেও ঝরছে *ফোঁটা ফোঁটা পানি।*

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফাটল পেরিয়ে মাঝারি আকারের গুহাটায় বেরিয়ে এল দু'জনে। বাইরের বড় গুহার মত এটাকেও আলোকিত করে তোলা হয়েছে দুটো লাইট পোলের মাধ্যমে। ছোট একটা জেনারেটর গুঞ্জন করছে একপাশে, স্পেস হিটার বসানো হয়েছে দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে। গরম হয়ে আছে ভিতরটা।

গতকাল মাত্র একটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কিছুই ঠিকমত দেখা যায়নি, ছায়া আর অন্ধকার মিলে অশুভ লাগছিল পরিবেশটা। কিন্তু আলোর আতিশয্যে গা ছমছমে ভাবটা আর অনুভব করল না শ্যারন। কৌতূহল নিয়ে ভালমত পর্যবেক্ষণ করল গুহার অভ্যন্তর।

পেটকাটা দানবটা এখনও পড়ে আছে গুহার মাঝখানে। তবে তপ্ত বাতাসে ওটার উপরে জমে থাকা বরফের স্তর গলে গেছে, চকচক করছে নাড়ি-ভুঁড়ি আর উন্মুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ভেসে বেড়াচ্ছে বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধ। দেখে মনে হচ্ছে বুঝি গতকাল শুরু হয়েছে কাটাকুটি, ষাট বছরের পুরনো বলে বিশ্বাসই হতে চায় না।

জানোয়ারটার কাছ থেকে সামান্য দূরত্বে চকচক করছে বাকি ছ'টা আইস ব্লক। তাপের প্রভাব পড়েছে ওগুলোর উপরেও।

গলতে শুরু করেছে বরফের তাল, মেঝেয় গড়াচ্ছে পানি। ঘোলাটে ভাব দূর হয়ে গেছে ওগুলোর শরীর থেকে। স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখা যাচ্ছে ভিতরের প্রাণীগুলোকে—কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে গ্রেণ্ডেল-রা। নিখুঁত একটা বৃত্তের মত ভঙ্গি, শরীর কুঁকড়ে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে লেজের সঙ্গে।

'প্রাণীগুলোর শোয়ার ভঙ্গিতে কোনও বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল মিকেলসেন।

'একই ভঙ্গিতে রয়েছে সবাই,' শ্যারন বলল, 'এ-ছাড়া তো...'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিকেলসেন। 'হয়তো আমার নরডিক হেরিটেজের কারণে ভাবছি এমনটা... কিন্তু ভাইকিংদের খোদাই করা ড্রাগনের ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। ঠিক এভাবেই ঘুমাত দানবগুলো—শরীর কুঁকড়ে নাক ঠেকিয়ে রাখত লেজের সঙ্গে। জীবনের অনন্ত চক্রের প্রতীক ছিল ওই ভঙ্গিটা।'

বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের চিন্তাধারা আঁচ করতে পারছে শ্যারন। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, ভাইকিংরা আমাদের আগেই এই জমাট বাঁধা দানবগুলোর খোঁজ পেয়েছিল?'

'অস্বাভাবিক নয়। ওরাই প্রথম পোলার এক্সপ্লোরার ছিল। নর্থ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আইসল্যাণ্ড আর গ্রিনল্যাণ্ডে সবার আগে পা রেখেছিল ভাইকিংরা। কে বলতে পারে, অ্যাম্বিউলোসিটাসের দু'চারটে স্পেসিমেন ওদিকেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই?'

'হুম। যুক্তি আছে আপনার কথায়।'

'যুক্তি-টুক্তি না, স্রেফ অলস ভাবনার কথা শোনালাম আপনাকে।' গলতে থাকা আইস ব্লকগুলোর উপর আটকে গেল মিকেলসেনের দৃষ্টি। 'তবে এর কারণে পুরনো একটা অভিশাপের কথাও মনে পড়ে গেছে—এখানে পাওয়া লাশগুলোর কথা ভাবলে ওটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল শ্যারন। চার নম্বর লেভেলের রহস্য

জানা নেই বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের... তা হলে কী বোঝাতে চাইছেন উনি?

গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন মিকেলসেন, 'রাশান বিজ্ঞানী আর স্টাফদের কথা বলছি। ট্র্যাজেডি একটা! ষাট বছর আগে কী ঘটেছিল, তা জানতে ইচ্ছে করে। স্টেশনটার এমন পরিণতি হলো কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন। সমাধিতুল্য এই আইস স্টেশনে প্রথমবার পা রাখার অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেছে। যেদিকে তাকায় শুধু লাশ আর লাশ। কঙ্কালসার... যেন খেতে না পেয়ে মারা গেছে। কিছু কিছু লাশের মধ্যে ছিল আত্মহত্যার স্পষ্ট আলামত। তারচেয়েও ভয়াবহ পরিণতি বরণ করেছে, এমন লাশও কম ছিল না। হাবভাবে মনে হয়েছে, যেন আচমকা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সবাই। কেন? জটিল এক রহস্য।

'চল্লিশের দশকে হারিয়ে গিয়েছিল এই বেইস,' মিকেলসেনকে নিজের থিয়োরি শোনাল শ্যারন, 'সে-আমলে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ছিল না, উত্তর মেরুতে সাবমেরিন পৌঁছায়নি... এমনকী আর্কটিক সাগরের স্রোতের গতি-প্রকৃতিও ছিল অজানা। গ্রীষ্মকালের একটা ঝড়েই মূল পজিশন থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারত এই দ্বীপ, খুঁজে পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তার সঙ্গে যদি কমিউনিকেশন ব্রেকডাউন যোগ করেন... অথবা ধরে নেন ওদের রিসাপ্লাই শিপ পৌঁছুতে পারেনি, তা হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। সেই যুগে মঙ্গলগ্রহ আর উত্তর মেরুর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না—দুটোই ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'তারপরেও... বিশ্রী একটা ট্র্যাজেডি। কীভাবে ঘটল, জানা গেলে ভাল হতো।'

'খুব শীঘ্রি রাশান ডেলিগেশন আসছে। ওরা হয়তো কিছু

জানে। অবশ্য... বলবে কি না সেটাই প্রশ্ন।' সন্দেহটা যুক্তিসঙ্গত। চার নম্বর লেভেলে ওরা যা পেয়েছে, তার কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। রাশানরা যে মুখে তালা আঁটবে, সে-ব্যাপারে ও মোটামুটি নিশ্চিত।

একদৃষ্টে বরফে আটকা পড়া গ্রেণ্ডেলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মিকেলসেন, থমথম করছে চেহারা। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্যারন বলল, 'কী যেন অভিশাপের কথা বললেন... কী ওটা?'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। 'কুণ্ডলী পাকানো ড্রাগনের সম্পর্কে বলেছি আপনাকে—জীবনের অনন্ত চক্রের প্রতীক ওটা। কিন্তু আরেকটা অশুভ অর্থ আছে এই প্রতীকের। এই বেইসে যা ঘটে গেছে, সেটা মাথায় রাখলে বলতে হয়...'

'কী সেই অর্থ?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল শ্যারন।

আইস ব্লকগুলোর দিকে আবার তাকালেন মিকেলসেন। ফিসফিস করে বললেন, 'নর্স ভাষায় একে বলে *র‍্যাগনারক*... মানে, পৃথিবীর ধ্বংস!'

আঠারো

অত্যন্ত স্বাস্থ্যসচেতন মেয়ে মেগান গুড। জিয়োলজি টিমের জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসিসটেণ্ট সে, ড. জেফরি বেনটনের অধীনে

কাজ করে। পরের শিফটের ডিউটি শুরু হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, সময়টুকু স্কেটিং করে কাটাবে বলে ঠিক করেছে। চলে এসেছে স্লেক পিটের নির্জন একটা অংশে, বরফের মেঝে স্কেটিঙের জন্য আদর্শ। স্কেটসের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে গতরাতের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল। ড. বেনটনের সঙ্গে পুরো রাত কাটিয়েছে আইস স্টেশনের একটা কামরায়, পেশাগত গণ্ডি পেরিয়ে সম্পর্কটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেছে ওরা। বেশ কিছুদিন থেকেই আভাসে-ইঙ্গিতে ভালবাসার কথা বলছিল বেনটন, গতকাল সেটা মুখে উচ্চারণ করেছে। দু'জনেই কাজ-পাগল মানুষ, কোনোদিন প্রেম-ভালবাসার দিকে মনোযোগ দেয়নি... সময়ই পায়নি। কিন্তু সুমেরুর নির্জন পরিবেশে কাজও একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, দুজনেই অনুভব করেছে সঙ্গীর অভাব। কখন যেন নিজের অজান্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওরা।

স্কেটস পরা হয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াল মেগান, তাকাল সামনের দীর্ঘ টানেলের দিকে। একটু বাঁক নিয়ে এগিয়েছে ওটা। হালকা স্ট্রেচিং করে নিল মেগান, দূর করে নিল হাত-পায়ের আড়ষ্টতা। অ্যাথলিটের দেহ ওর। পা-দুটো লম্বা, ছিপছিপে... মিশেছে টানটান নিতম্বে গিয়ে। বছরদশেক আগে ইউ.এস. অলিম্পিক টিমের স্পিড স্কেটার ছিল ও, কিন্তু দুর্ঘটনায় পায়ের একটা লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অকালসমাপ্তি ঘটেছে সেই ক্যারিয়ারের। হতাশা চাপা দিয়ে লেখাপড়ায় ফিরে গিয়েছিল, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে গ্র্যাজুয়েশনের জন্য যোগ দিয়েছিল স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেই পরিচয় ড. জেফরি বেনটনের সঙ্গে।

শর্ট-ট্র্যাকের স্কেটস্ নিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা কদম ফেলল মেগান। জুতোজোড়া তৈরি হয়েছে গ্র্যাফাইট আর কেভলারের

সংমিশ্রণে, ঠিক ওর পায়ের মাপে। পরার পরে ওগুলো ওর শরীরেরই একটা অংশে পরিণত হয়। ইনসুলেটেড একটা স্কিন সুটও পরেছে ও—লাল, সাদা আর নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া; তলায় রয়েছে থারমাল আণ্ডারঅয়্যার। মাথায় হেলমেট—না, রেসিং হেলমেট নয়, ওই জিনিস সঙ্গে আনেনি; তাই জিয়োলজিস্টদের একটা মাইনিং হেলমেট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। ব্রিমের উপর ছোট একটা বাতি লাগানো আছে ওটায়।

টানেলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা অনুভব করল মেগান। পোলার আইস ক্যাপের সারফেসে বহুবার স্কেটিং করেছে ও, কিন্তু টানেলের ভিতরে এই প্রথম। কাজটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিংও বটে। তবে ওর মত অভিজ্ঞ স্কেটারের কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। বরং আঁকাবাঁকা পথে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটতে মজাই লাগবে।

বড় করে কয়েকবার দম নিল মেগান, তারপর শুরু করল দৌড়। দশ গজ যেতেই একটু ঢালু হয়ে গেল মেঝে, দৌড় থামিয়ে স্কেটের উপর চাপিয়ে দিল শরীরের ওজন, পিছলে এগোচ্ছে এখন। নিরুদ্বিগ্ন রইল ও, কোর্স আগেই ঠিক করা আছে, স্নেক পিটের এই অংশে কয়েক দফা জগিং করেছে ও, দেখে নিয়েছে সমস্ত অলি-গলি আর বাঁক। নিশ্চিত হয়েছে—পথে কোনও অযাচিত বাধা নেই, স্কেটিং করা যাবে। হঠাৎ করে কেউ সামনে এসে পড়ারও ভয় নেই। স্নেক পিটের এই অংশ একেবারে অবহেলিত—রক ফরমেশন নেই... নেই কোনও বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন। জিয়োলজি বা বায়োলজি... কোনও টিমই আগ্রহী নয় এই সেকশনটা নিয়ে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের লোকজন তো স্নেক পিটেরই ছায়া মাড়ায় না। আশা করছে আধঘণ্টার মধ্যেই চক্রাকার একটা পথ পেরিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরতে পারবে।

অনায়াসে প্রথম বাঁক পেরুল মেগান, গতি কমাল না। কানের কাছে শোঁ শোঁ করে উঠল বাতাস। হাঁটু ভাঁজ করে একটু কুঁজো

হয়ে গেল ও। সামনে ইংরেজি *এস* হরফের মত এঁকেবেঁকে গেছে টানেল, অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্যালান্স ঠিক করল ও, বাম হাত ভাঁজ করে নিয়ে গেল দেহের পিছনে। ডান হাত নেড়ে বজায় রাখল ছন্দ। আঁকাবাঁকা অংশটায় ঢুকে পড়ল তীব্র গতিতে।

দর্শনীয় ভঙ্গিতে এগোল মেগান। ঝড়ের বেগে একেকটা বাঁকের উল্টোপাশের দেয়ালের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠে গেল, নেমে এল কোনা ঘুরে। একটুও হেরফের করল না গতির। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগল ওর জায়গাটা পার হতে। পরের অংশটা বেশ জটিল, থামতে বাধ্য হলো। সামনে অসংখ্য গুহামুখ, গোলকধাঁধার মত সুড়ঙ্গের জাল বিছিয়ে আছে ওপাশে। তবে চিন্তার কিছু নেই, জগিঙের সময় স্প্রে-পেইন্টের সাহায্যে সঠিক টানেলটা দাগ দিয়ে রেখেছে ও।

হেলমেটের ল্যাম্প ঘোরাল মেগান, খুঁজে বের করল কমলা রঙের তীরচিহ্ন। ভেজা বরফের গায়ে চকচক করছে ওগুলো। সন্তুষ্ট হয়ে সঠিক প্যাসেজে ঢুকে পড়ল, পা ছুঁড়ে বাড়িয়ে নিল গতি। পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক অন্ধগলি আর শাখা-টানেলের মুখ। এমনই একটা চিহ্নহীন টানেলের মুখ পেরুনোর সময় চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। ছায়ার মাঝে নড়ে উঠল কী যেন। বড্ড জোরে ছুটছে, ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না কী ওটা। যখন ঘাড় ফেরাল, তখন বেশ কয়েক গজ এগিয়ে গেছে, হেডল্যাম্পের আলো জায়গামত পৌঁছুল না।

দ্রুত সোজা হলো মেগান। এই গতিবেগে ছোটার সময় সামনের দিকে মনোযোগ রাখতে হবে, নইলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তারপরেও নার্ভাসনেস কাটল না—চমকে গেছে ছায়াকে নড়তে দেখে, শিরদাঁড়ায় কেউ যেন ঢেলে দিয়েছে শীতল জল। যে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে স্কেটিং শুরু করেছিল, তা বদলে গেছে বেমালুম। সেখানে ভর করেছে নিখাদ ভয় আর উদ্বেগ।

চেষ্টা করল ভয়টা দূর করতে। 'সব চোখের ভুল!' জোরে জোরে উচ্চারণ করল মেগান। টানেলের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল সে-আওয়াজ। পরিবেশটা আরও ভুতুড়ে মনে হলো তাতে। আচমকা টের পেল, স্নেক পিটের এই নির্জন টানেলে ও একেবারে একা। প্রয়োজন হলেও সাহায্য করবার মত কেউ নেই!

পিছন থেকে খসখসে একটা শব্দ শুনে সচকিত হলো মেগান। আলগা কোনও বরফখণ্ড যেন আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো বুকের ধড়ফড়ানি। ঝুঁকি নিয়ে আবারও মাথা ঘোরাল ও। হেডল্যাম্পের আলোয় শূন্য টানেল ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না।

সামনে তাকাল আবার মেগান। আরেকটু হলেই একটা কমলা রঙের মার্কার মিস হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় থেমে গিয়ে দিক বদলাতে হলো ওকে। ঢুকে গেল সঠিক টানেলে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই টের পেল, পা কাঁপছে। তীব্র আতঙ্কের মুখে বিদ্রোহ করতে চাইছে শরীরের পেশি। আনমনে মাথা নাড়ল ও। ভুল হয়ে গেছে... আরেকটা টানেল ছিল পিছনে—ওটা একটা শর্টকাট, পাঁচ মিনিটেই ফিরে যেতে পারত স্টার্টিং পয়েন্টে। কিন্তু এই টানেলটা মাইলখানেক লম্বা, সিঙ্গেল লুপের আকৃতিতে এগিয়ে গেছে, স্কেটিঙের জন্য আদর্শ। সেজন্যেই মার্কিং করে রেখেছিল এটায়। তবে এখন আর স্কেটিঙের মেজাজে নেই মেগান। তাড়াতাড়ি এই ভুতুড়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

গতি বাড়িয়ে দিল ও। চাইল নড়তে থাকা ছায়ার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল ঘটনাবিহীনভাবে। স্নায়ু একটু শান্ত হয়ে এল। বোকামি করেছি... ভয় পেয়েছি অযথা—নিজেকে সান্ত্বনা দিল ও। নড়ছে না ছায়া, অদ্ভুত কোনও শব্দও নেই। বরফের গায়ে শুধু আঁচড় কাটার আওয়াজ তুলছে ওর স্কেটসের ব্লেড।

লুপের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল মেগান একটু পরে। এদিকটাও ঢালু, তবে নিচু নয়, উঠে গেছে উপর দিকে। ঢাল ধরে উপরে ওঠার জন্য খাটতে হলো ওকে। পা নড়াতে হচ্ছে ঘন ঘন, তবে গতি কমাল না। কাজটায় ছন্দ খুঁজে পেল ও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, বুক থেকে নেমে গেল যেন ভারী পাথর। এই তো, আর একটু পরেই পৌঁছে যাবে স্টার্টিং পয়েন্টে, সেখান থেকে পরিচিত মানুষজনের মাঝে... বেনটনের কাছে।

হাসি পেল মেগানের। কী যে হয়েছে ওর! খামোকাই অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস আর কেউ ছিল না আশপাশে, নইলে খেপিয়ে জান খারাপ করে দিত...

আচমকা চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। ধক করে উঠল বুক। আবারও শোনা যাচ্ছে খসখসে আওয়াজ! বরফের সঙ্গে যেন ঘষা খাচ্ছে বরফ! সবচেয়ে বড় কথা, শব্দটা এবার আসছে সামনে থেকে!

থেমে গেল মেগান। ঢোক গিলল কয়েকবার। তাকাল সামনের গুহামুখের দিকে। একটা ছায়া যেন সরে গেল ওটার সামনে দিয়ে। চোখ পিটপিট করল ও। হেডল্যাম্পের আলো অতদূর পৌঁছাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কী। ইতস্তত করল মেগান, সামনে এগোবার সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু টানেলের মাঝখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ও।

'হ্যালো?' কাঁপা গলায় ডাকল মেগান। হতে পারে সহকর্মীদের কেউই আছে সামনে... ঘুরতে এসেছে স্নেক পিটের এই অংশে।

কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তার বদলে থেমে গেল খসখস আওয়াজ। থামল ছায়ার নড়াচড়াও। সব এখন আগের মত স্থির।

'হ্যালো?' আবার ডাকল মেগান। 'কে ওখানে?'

নিরুত্তর। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল ও। হেডল্যাম্পের আলোয় আঁতিপাঁতি করে দেখছে টানেলের প্রতিটা ইঞ্চি। কোথাও কিছু নেই। তারপরেও ভয় ভয় ভাবটা কমল না একবিন্দু। গলার কাছে ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে কী যেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মেগানের।

ধীরে ধীরে লুপ আকৃতির টানেল থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনে আবার সেই গোলকধাঁধার জাল। বুকের ধুকপুকানি বেড়েই চলেছে। কোনোমতে জায়গাটা পার হতে পারলে হয়... মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন পা রাখবে না এদিককার টানেলে। ড. বেনটনের চেহারা ভেসে উঠল মানসপটে। শক্তিশালী মানুষ... সাহসী মানুষ। তার চওড়া বুকে ফিরে যেতে অস্থির হয়ে উঠেছে হৃদয়।

কমলা রঙের চিহ্ন অনুসরণ করে গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ল মেগান। না, কিছুই নেই ওখানে। একটু সাহস পেল, গতি বাড়িয়ে এগোতে থাকল সামনে। দৃষ্টি সেঁটে রেখেছে সামনে, একটা চিহ্নও যেন মিস না করে। পর পর কয়েকটা বাঁক পেরুল ও। তারপর... হঠাৎ... হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল লাল দুটো চোখ!

ব্রেক কষার ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল মেগান। টের পেল, রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে শিরা-উপশিরায়। এমন চোখ আগে কোনোদিন দেখেনি। বিশাল, প্রাণহীন, অনুভূতিহীন! চোখের মালিককে দেখতে পাচ্ছে না, এখনও সে লুকিয়ে আছে ছায়ার গভীরে। হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে শুধু মণিদুটো।

তীব্র আতঙ্ক অনুভব করল মেগান, পায়ে কোনও জোর পাচ্ছে না। টলমল ভঙ্গিতে দু'পা পিছাল, তারপর থেমে গেল আবার। কি করবে স্থির করতে পারছে না। উল্টো ঘুরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে পেশি, মস্তিষ্কের নির্দেশ

শুনছে না।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল লাল চোখজোড়া, তারপর মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। এতক্ষণে সচল হলো মেগান, ঝট্ করে উল্টো ঘুরল, ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কোন্‌দিকে যাচ্ছে কিছুই জানে না, শুধু জানে—পালাতে হবে এখান থেকে। পাগলের মত ছুঁড়ছে হাত-পা, যেন ভাঙতে চাইছে স্কেটিঙে নিজের রেকর্ড। কোনও গুহামুখ দেখলেই ঢুকে পড়ছে তাতে। বলা বাহুল্য, খুব শীঘ্রি পথ হারাল ও। গোলকধাঁধার গভীরে এমন জায়গায় চলে গেল, যেখানে আগে কোনোদিন যায়নি।

সংকীর্ণ একটা প্যাসেজে পৌঁছুল মেগান কয়েক মিনিট পর। অচেনা। দেয়াল আর ছাত থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য বরফ গজাল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খোঁচা লাগল হাতে-পায়ে। স্কিনসুট ছিঁড়ে গিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। ফুঁপিয়ে উঠল মেগান, কিন্তু থামল না। ব্যথা-বেদনা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল সামনে। একটু পরে চওড়া হয়ে এল প্যাসেজটা, সহজ হলো হাত-পা নড়ানো।

দম নেবার জন্য একটু থামল মেগান। ফোঁপাচ্ছে, দু'চোখ থেকে ঝরছে অশ্রু, জমাট বেঁধে যাচ্ছে গালের উপর। নিচু লয়ের একটা গরগর ভেসে এল পিছন দিক থেকে, ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ও। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাল ফেলে আসা পথের দিকে।

আবারও দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল চোখ! তবে এবার শুধু চোখ নয়, আবছাভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বিশাল একটা আকৃতি, গোলগাল মাথা আর সাদাটে গায়ের রঙ। প্যাসেজ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা।

ভালুক না তো! ভাবল মেগান। ডিপআই সোনারে একটা আবছা আকৃতি দেখা গিয়েছিল বলে শুনেছে, এটাই কি সেটা?

কৌতূহল নিবৃত্ত করার কোনও ইচ্ছে নেই ওর মধ্যে। অস্ফুট

একটা আর্তনাদ করে সামনে ফিরল, ছুট লাগাল প্রাণপণে। একটা বাঁক পড়ল, সেটা পেরিয়ে গেল প্রবল গতিতে। তারপরেই ঘটল অঘটন।

বাঁকের পরেই মুখ ব্যাদান করে রেখেছে অন্ধকার এক ফাটল। জিয়োলজির ছাত্রী হিসেবে এ-ধরনের ফাটলের নাম জানে মেগান—আইস শিয়ার। প্রাকৃতিক চাপের মুখে স্ফটিকের মত ফেটে যায় বরফ, তাতেই সৃষ্টি হয় এসব ফাটলের। শেষ মুহূর্তে ওটা চোখে পড়ল ওর, হাত-পা ছুঁড়ে থামতে চাইল, কিন্তু লাভ হলো না। গতির কাছে পরাস্ত হলো সমস্ত প্রচেষ্টা, ফাটলের কিনারা পেরিয়ে শূন্যে পাখা মেলল মেগান। তারপরেই পড়তে শুরু করল নীচের দিকে। গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ।

ফাটলটা বেশি গভীর নয়, পনেরো থেকে বিশ ফুটের মত হবে, ওটার তলায় পা দিয়ে পড়ল ও। সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গেল স্কেটসের তলার ব্লেড, ফল হলো মারাত্মক। কেভলারের আবরণ কাজে এল না, মড়াৎ করে ভেঙে গেল একটা গোড়ালি। অন্য পায়ের হাঁটু বাড়ি খেলো গর্তের তলায়, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো পুরো দেহ। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মেগান। শরীর কুঁকড়ে ফেলল নিজের অজান্তে। পড়ে রইল আচ্ছন্নের মত।

কয়েক মিনিট পর সচেতন হয়ে উঠল। ব্যথার কথা ভুলে গেছে, মনে পড়ে গেছে বিপদের কথা। মাথা তুলে উপরদিকে তাকাল। বিকনের মত জ্বলজ্বল করে উঠল ওর হেডল্যাম্প। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল অচেনা এক দানবের চেহারা।

ফাটলের কিনারায় দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। মাথা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে মেগানকে। চোখদুটো লাল... আগের মতই প্রাণহীন। বরফের গায়ে থাবা বসাল প্রাণীটা, শরীরের একাংশ ঢোকাল ফাটলের ভিতরে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের মেঘ। গরগর করে উঠল

হঠাৎ।

স্থবির হয়ে গেছে মেগান। এতক্ষণে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে দানবটাকে। ভালুক নয়, সম্পূর্ণ অন্য প্রজাতির কিছু। অন্তত আধ টন হবে ওজন, তেলতেলে মসৃণ ত্বক, পুরো দেহ ধবধবে সাদা। মাথা গোল, কান নেই, ঘাড়ও নেই। মাথা সরাসরি মিশেছে ধড়ের সঙ্গে। ডলফিনের মত লম্বা একটা মুখ। নাকের ফুটোদুটো বেশ উঁচুতে—দুই চোখের মাঝামাঝি। সব মিলিয়ে ভয় জাগানো এক চেহারা।

জীববিজ্ঞানী নয় মেগান, তারপরেও বুঝতে পারছে, এই প্রাণী আধুনিক পৃথিবীর হতে পারে না। কোনোদিন কোনও রেফারেন্স বইয়ে পড়েনি এমন কোনও প্রাণীর কথা। শোনেওনি। প্রাগৈতিহাসিক হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কিন্তু এখানে এল কোত্থেকে? ভুল দেখছে না তো?

একটু হাঁ করল দানব, হেডল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল দুই চোয়ালের মাঝে বসানো ধারালো দাঁতের সারি। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল মেগান, চোখের ভুল নয়, যা দেখছে তা ভয়াবহ বাস্তব। একই সঙ্গে অনুমান করতে পারল ভবিতব্য। দানবটা শিকারি, আর ও তার শিকার! উপলব্ধি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চিৎকার শুরু করল ও।

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না দানবটার মধ্যে। বরফের গায়ে বসে গেল দুই থাবার ধারালো নখর, ফাটলের গা বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে শুরু করল ওটা।

উনিশ

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন।

অস্ত্রের ব্যারেল দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। ঘণ্টাখানেক হলো ড্রিফট স্টেশনের মেস হলে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে, বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা টেবিলে। তখন থেকে অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে দুজন প্রহরী, নড়তে-চড়তে দিচ্ছে না। কপালে ব্রেকফাস্টও জোটেনি। দেয়া হয়েছে স্রেফ আলকাতরার মত কফি, সেটাই খেতে হয়েছে।

রানার পাশে বসে আছে ম্যাসন—মাথা নিচু, দু'হাতে ধরে রেখেছে কফির মগ, যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওটায় চুমুক দেয়া উচিত হবে কি হবে না। উল্টোপাশে বসেছে অ্যাবি আর রিচার্ড। শুরুতে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে, শেরিফের ব্যাজ দেখিয়ে কাজ হয়নি, সিকিউরিটি টিম ওদেরকে অস্ত্রের মুখে বন্দি করেছে। এখন অবশ্য অনেকটাই শান্ত তার চেহারা। বোধহয় বুঝতে পেয়েছে, মাথা গরম করে লাভ নেই। তারচেয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলানোই ভাল।

রানার সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে—প্রুডো বে-র ঘটনার পরে সর্বোচ্চ সতর্কতা পালন করছে এখানকার লোকজন, কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। এ-ধরনের পরিস্থিতি আগেও মোকাবেলা করেছে ও, জানে—পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে ওদেরকে ছাড়বে না এরা।

দুই প্রহরীর দিকে তাকাল রানা। ইউনিফর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছে, একজন পেটি অফিসার, অন্যজন সিম্যান। দু'জনের হাতেই রাইফেল। এ-ছাড়া কোমরের হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে পিস্তল। অ্যাবির সাইড আর্মস কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিমানের পিছনের কেবিনে রাখা সার্ভিস শটগানটাও।

'এত সময় লাগছে কেন ওদের?' হঠাৎ বলে উঠল অ্যাবি। কণ্ঠে অস্থিরতা।

'কমিউনিকেশনের অবস্থা খুব খারাপ,' শান্ত স্বরে বলল রানা। বিশ মিনিট হলো সিকিউরিটি টিমের লিডার ওদের আই.ডি. ভেরিফাই করতে গেছে। মেইনল্যাণ্ডে কথা বলতে হবে তাকে, সোলার স্টর্মের ইন্টারফ্যারেন্সের কারণে সেটা সহজ হবার কথা না।

'এখানকার দায়িত্বে কে আছে বলে মনে হয় তোমার?' নতুন প্রশ্ন ছুঁড়ল অ্যাবি।

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। সিকিউরিটি টিমের ছ'জন সদস্য ছাড়া আর কোনও মিলিটারি পার্সোনেল চোখে পড়েনি ওদের। অথচ নেভির লোকজনে এই স্টেশন গিজগিজ করার কথা। আকাশ থেকে দেখা পলিনিয়ার কথা মনে পড়ল রানার—খালি ছিল ওটা। অনুমান করল, 'সবাই বোধহয় সাবমেরিন নিয়ে কোথাও গেছে।'

'কীসের সাবমেরিন?' জানতে চাইলেন রিচার্ড।

'পুরনো সাইসেক্স স্টেশনগুলোর সাপোর্ট ভেসেল হিসেবে নেভির সাবমেরিন থাকত। এখানে তার ব্যতিক্রম হবার কথা না। আমার ধারণা নেভির সিনিয়র অফিসাররা এখন ওই সাবমেরিন নিয়ে কোনও মিশনে ব্যস্ত। হয়তো প্রুডো বে-তে গেছে সাহায্য করবার জন্যে।'

'তারপরেও রিসার্চ টিমের একজন লিডার তো থাকবে!' বলল

অ্যাবি। 'সিভিলিয়ানদের মধ্যেও চেইন অভ কমাণ্ড থাকতে বাধ্য। যদি দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যেত...'

গত এক ঘণ্টায় সিকিউরিটি টিমের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসামরিক মানুষ দেখেছে ওরা। মেস হলের দরজা খুলে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে তারা, চরম কৌতূহল নিয়ে। বোঝা গেছে, নবাগতদের কাছ থেকে বাইরের দুনিয়ার খবর পেতে উদ্‌গ্রীব। অবশ্য কাউকেই কাছ ঘেঁষতে দেয়নি প্রহরীরা। দূর দূর করে তাড়িয়েছে।

'বিজ্ঞানীদের লিডার কে, জানি না,' রানা বলল। 'তবে আমার ধারণা, সে-ও এ-মুহূর্তে হাজির নেই। নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার চেহারা দেখতাম আমরা।'

ওর কথা শেষ হতেই সশব্দে খুলে গেল দরজা। গটমট করে ভিতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার জেরোম রাইট—সিকিউরিটি টিমের লিডার। এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। তাকে দেখে গরগর করে উঠল লোবো। ঘরের এক কোণে, মেঝেতে মুখ গুঁজে বসে ছিল কুকুরটা, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। ইশারায় ওকে শান্ত থাকতে বলল অ্যাবি। বসে পড়ল লোবো, তবে সবগুলো পেশি রইল টানটান হয়ে। বিপদ দেখলেই মনিবকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

কাছে এসে জেনির ব্যাজ আর আই.ডি. কার্ড ফেরত দিল রাইট। নুমার ক্রিডেনশিয়াল জমা দিয়েছিল রানা, ম্যাসন দিয়েছিল পত্রিকার পরিচয়পত্র—ফিরিয়ে দিল ওগুলোও। বলল, 'আপনাদের আইডেন্টিটি ভেরিফাই করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আপনারা কেন এসেছেন, তা কেউই জানে না। বিশেষ করে মি. রানা... নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো, আপনি নাকি ছুটিতে আছেন!'

'আমার ব্যাপারেও কি একই কথা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'না, শুধু বলা হয়েছে—আপনি গোপন অ্যাসাইনমেন্টে

এসেছেন, সম্পাদক ছাড়া কেউ তার ডিটেইলস্ জানে না। ভদ্রলোককে পাওয়া যায়নি।'

কোমরে ব্যাজ ঝোলাল অ্যাবি, পকেটে রেখে দিল আই.ডি. কার্ড। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার সাইড আর্মস্ আর শটগান কোথায়?'

'দুঃখিত,' রাইট বলল, 'আমাদের ক্যাপ্টেন না ফেরা পর্যন্ত ওগুলো সিকিউরিটি টিমের জিম্মায় থাকবে।' কণ্ঠের দৃঢ়তায় বুঝিয়ে দিল, তর্ক করে লাভ নেই।

চেহারায় মেঘ জমল অ্যাবির। নিরস্ত্র থাকতে পছন্দ করে না ও।

'মাফ করবেন, লেঃ কমাণ্ডার রাইট,' বলল ম্যাসন। 'আমরা এখানে ঝামেলা বাধাতে আসিনি। এসেছি পরিত্যক্ত একটা আইস স্টেশন আবিষ্কারের খবর শুনে...'

বিস্ময় ফুটল রাইটের চেহারায়। 'রাশান বেইসটা?'

থমকে গেল রানা। রাশান আইস স্টেশন? আর্কটিকের এই দুর্গম জায়গায়? সন্দেহ নেই, বড় ধরনের একটা রহস্যের মাঝখানে নাক গলিয়ে বসেছে। অ্যাবি আর রিচার্ডের চেহারা দেখে মনে হলো, ওরাও একই কথা ভাবছে।

নির্বিকার রইল শুধু ম্যাসন। শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ওটাই। ওই আইস স্টেশনের উপর প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে সিয়াটল টাইমস্ থেকে। এই ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকেরা আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে এসেছেন... ইয়ে... আলাস্কায় সামান্য ঝামেলা হবার পর।'

'কারা যেন ওঁকে খুন করতে চেয়েছিল,' রাইট প্রশ্ন করার আগেই বলে দিল রানা।

ভুরু কোঁচকাল লেঃ কমাণ্ডার। 'সত্যি?'

'স্যাবোটাজ করা হয়েছিল ওঁর বিমানে—ক্র্যাশ করানো

হয়েছিল। তাতে কাজ না হওয়ায় এরপর নেমে আসে দু'জন প্যারাট্রুপার, চেষ্টা করে ওঁকে খুন করতে। কাছাকাছি ছিলাম আমি, ব্যর্থ করে দিই ওদেরকে। তারপর যাই শেরিফ ম্যানিটকের কাছে।' ইশারায় অ্যাবিকে দেখাল রানা।

'ওখানেই শেষ হয়নি ব্যাপারটা,' অ্যাবি যোগ করল। 'এরপরে ধাওয়া করা হয় আমাদেরকে। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাই আমরা। প্রুডো বে-তে পৌঁছুনোর চেষ্টা করি। কিন্তু ওখানে ল্যাণ্ড করা সম্ভব হয়নি। তার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে ওখানকার ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে। আমাদের ধারণা, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ওই দুর্ঘটনার সম্পর্ক আছে।'

'কীভাবে...' প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল রাইট। 'এক মিনিট! রাশান বেইসটার খবর কীভাবে পেয়েছেন আপনারা?'

'দুঃখিত, তথ্যদাতার পরিচয় জানাতে পারছি না আপনাকে,' বলল ম্যাসন। 'কথা যদি বলতেই হয়, বলতে চাই এমন কারও সঙ্গে, যাঁর অথোরিটি আছে। যিনি অ্যাকশন নিতে পারবেন।'

থমথমে হয়ে গেল লেঃ কমাণ্ডার রাইটের চেহারা, অপমানিত বোধ করছে। তাকে ছোট করে দেখছে এরা। কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না ম্যাসন, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টির লড়াই চলল দু'জনের মধ্যে। তারপর হার মেনে নিয়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন গরডন না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপনাদেরকে।'

'কখন ফিরছেন উনি?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না রাইট। বোঝা গেল, সহসা ফেরার সম্ভাবনা নেই ক্যাপ্টেনের।

'ওঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ নিশ্চয়ই দায়িত্বে আছে?' বলল অ্যাবি। 'রিসার্চ টিমের ইনচার্জ কোথায়? তার সঙ্গে কথা বললেও চলে আমাদের।'

'রিসার্চারদের টিম লিডার হচ্ছেন ড. শ্যারন বেকেট,' ইতস্তত করে বলল রাইট। 'তবে আপাতত উনিও এখানে নেই।'

'তা হলে আমাদের কী হবে?' জানতে চাইল অ্যাবি। 'এভাবে আমাদেরকে আটকে রাখতে পারেন না আপনি!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি... পারি, ম্যা'ম। সন্দেহজনক চরিত্র আপনারা। এখানে আপনাদের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত। যতক্ষণ না উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছি, ততক্ষণ আপনাদেরকে বন্দি করে রাখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আমার।'

ওদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না লেঃ কমাণ্ডার। উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাবি। 'ধ্যাৎ! কোনও লাভ হলো না।'

'ঠিক তার উল্টো,' বলল রানা। গলার স্বর খাদে নামিয়ে রেখেছে, প্রহরীরা যাতে শুনতে না পায় ওদের কথা। 'খুঁজে পাওয়া বেইসটা যে রাশান, তা জানতে পেরেছি। নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে ওরা ওখানে। সেজন্যেই এত রাখঢাক।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাসন। 'ট্রিক্ট স্টেশনে কড়াকড়ি আরোপ করেছে নেভি। কাউকে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে। আবিষ্কারের খবরটা চাপা দিয়ে রাখতে চাইছে ওরা। এখানে আমাকে পৌঁছুতে বাধা দেয়া হয়েছে সে-কারণেই।'

'বলতে চাইছেন, আমাদের মিলিটারিই বাধা দিয়েছে আপনাকে?' বিস্মিত গলায় বললেন রিচার্ড। 'খুন করার চেষ্টা করেছে?'

'না,' ম্যাসন মাথা নাড়ল। 'আমেরিকান সরকার চাইলে হাজারটা লিগ্যাল চ্যানেলে আটকাতে পারত আমাকে। হামলা যারা চালিয়েছে, তাদের সে-সুযোগ ছিল না। চুপি চুপি কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছে ওরা।'

'রাশানরা?'

'কী জানি। আমি শিয়োর না।'

'সম্ভাবনা আছে,' রানা বলল। 'কমাণ্ডোরা মিলিটারি ব্যাকগ্রাউণ্ডের ছিল। ছোট একটা স্ট্রাইক টিম... সার্জিকাল অ্যাটাক চালাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। রাশান হলে অবাক হব না।'

'কিন্তু মি. ম্যাসনকে টার্গেট করল কেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল অ্যাবি। 'উনি স্রেফ একজন রিপোর্টার। বলতে গেলে গুরুত্বহীন মানুষ।'

'উঁহুঁ, গুরুত্বহীন নন মোটেই। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, তাদের বাইরে একমাত্র ম্যাসনই জানেন এই আবিষ্কারের কথা। খবরটা জানাজানি হওয়া থেকে ঠেকানোর জন্য ওঁর মুখ বন্ধ করাটা হয়তো জরুরি ভেবেছে কেউ।'

ব্যাখ্যা দিল বটে, কিন্তু ওতে রানা নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না। পুরনো একটা আইস স্টেশন নিয়ে এত রাখঢাকের কী আছে? ব্যাপারটা খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায় কীভাবে? নিশ্চয়ই গভীর কোনও রহস্য আছে এর পিছনে।

দুই প্রহরীর দিকে দৃষ্টি ফেরাল ও। শরীর টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামান্য চারজন সিভিলিয়ানকে পাহারা দেয়ার সময় যে-ধরনের ঢিলেঢালা আচরণ স্বাভাবিক, ওদের মধ্যে তার বিন্দুমাত্র দেখা যাচ্ছে না। এ-ধরনের আচরণ শুধু রণক্ষেত্রে দেখা যায়। তা ছাড়া লেঃ কমাণ্ডার রাইটও অস্বাভাবিক রকমের নীরব থেকেছে ক্যাপ্টেনের ফিরে আসার ব্যাপারে। তার আচরণ খতিয়ে দেখল রানা। সাবমেরিনটা যদি প্রুডো বে-র রেসকিউ মিশনে গিয়ে থাকে, তা হলে ফিরে আসতে সময় লাগবে অন্তত কয়েক দিন। সেক্ষেত্রে এভাবে বসিয়ে রাখা হতো না বন্দিদেরকে। থাকার ব্যবস্থা করা হতো, নিয়ে যাওয়া হতো অ্যাকোমোডেশনের

কোনও কামরায়। নিদেনপক্ষে অস্থায়ী কোনও হোল্ডিং সেলে। তা যখন করা হয়নি, তারমানে ক্যাপ্টেন খুব শীঘ্রি ফিরে আসতে পারেন... সাবমেরিনটা আছে নাগালের মধ্যে। একটু অবাক হলো ও। ওটা প্রুডো বে-তে যায়নি কেন? এত বড় একটা দুর্ঘটনা... বলতে গেলে এদের পিছনের আঙিনায় ঘটেছে। খুব দ্রুত রেসপণ্ড করতে পারত এরা। কেন করল না?

গলা খাঁকারি দিল ম্যাসন। সে-ও সম্ভবত একই ধরনের চিন্তা করছে। বলল, 'এখানে কী ঘটছে, সেটা জানা দরকার আমাদের।'

'মাথায় কোনও আইডিয়া থাকলে শোনাতে পারেন,' হালকা গলায় বলল রানা।

'রাশান ওই আইস স্টেশনে যেতে হবে আমাদেরকে,' বলল অ্যাবি। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি... ওটাই সবকিছুর উৎস।'

'কীভাবে?' বললেন রিচার্ড। 'আমরা এখন বন্দি। তা ছাড়া বিমানটাও এখন সিকিউরিটি টিমের পাহারায়।'

জবাব দিতে পারল না কেউ। চেহারায় প্রকট হয়ে উঠল অসহায়ত্ব।

ঠোঁট কামড়াল রানা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করছে—বিপদ! বিপদ!! রাশা... আমেরিকা... আর বরফের তলায় লুকানো একটা গোপন ঘাঁটি। সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, অন্ধের মত জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে ওরা।

বিশ

অধৈর্য হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। বিরক্ত মুখচ্ছবি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তা। ধৈর্য হারানোর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। এক ঘণ্টা হলো ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে সাবমেরিন ড্রাকন, সারফেসের দু'মিটার নীচে। উপরের বরফের ছাতের সঙ্গে দূরত্ব আরও কম, মাত্র এক মিটার। ঘণ্টাখানেক আগে ওই বরফের মাঝে একটা ফাটল খুঁজে পেয়েছে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করে ওখান দিয়ে রেডিও অ্যান্টেনা তুলবার নির্দেশ দিয়েছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ। এফএসবি হেডকোয়ার্টার থেকে নাকি জরুরি মেসেজ আসবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরেও নীরব লুবিয়াঙ্কা, কোনও ট্রান্সমিশন পাঠাচ্ছে না। চলে যাবারও উপায় নেই, ওখান থেকে গো-কোড না পেলে সামনে এগোনোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আড়চোখে রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। মূর্তির মত বসে আছেন তিনি। ভিতরে ভিতরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও প্রকাশ করছেন না চেহারায়। একবার শুধু কবজিতে বাঁধা হাতঘড়ি দেখলেন।

'এর কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'ওমেগা স্টেশনে পৌঁছুতে আর মাত্র দু'দিন বাকি, এর মধ্যে কী এমন জরুরি ব্যাপার ঘটল যে নতুন

কোনও এক্সারসাইজ করতে হবে আমাদেরকে? নাকি আবার বরফের তলায় পুঁততে হবে মিটিয়োরোলজিক্যাল ইকুইপমেণ্ট?' শেষ কথাটা বলল জোর দিয়ে, কণ্ঠে সন্দেহের ছাপ স্পষ্ট। ক্যাপ্টেন এখনও ভাবছে ওগুলো আড়িপাতার যন্ত্র।

ভাবুক... কিছু যায়-আসে না। ভাবলেন নিকোলায়েভ।

ব্রিজে বিরাজ করছে থমথমে পরিবেশ। প্রুডো বে-র স্যাবোটাজের খবর শুনেছে সবাই রেডিওতে। এর পিছনের রহস্য জানা নেই ক্রু-দের, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে—এ-ঘটনার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে আমেরিকানদের মধ্যে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখবে ওরা সবাইকে। ড্রাকনকে পড়তে হতে পারে অযাচিত জটিলতার মুখে।

কবজিতে বাঁধা পোলারিস মনিটরের উপর চোখ বোলালেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। আগের মতই জ্বলজ্বল করছে পাঁচটা বিন্দু। অপেক্ষা করছে মাস্টার ট্রিগারের জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে। রাতে পোলারিস ডিভাইসের ডায়াগনস্টিক টেস্টিং সেরেছেন নিকোলায়েভ। ক্যালিব্রেশনের সূক্ষ্ম অ্যাডজাস্টমেণ্ট ছাড়া আর কোনও সমস্যা দেখতে পাননি। স্বস্তি অনুভব করছেন সে-কারণে। জানেন, অত্যাধুনিক সোনিক টেকনোলজির কারণে যে-কোনও মুহূর্তে সিগনাল রিসিভ করতে পারবে তাঁর মারণাস্ত্র। সোলার স্টর্ম বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হবে না। আনমনে একবার স্ক্রিনের কোনার হৃৎপিণ্ডের আইকনটার দিকে তাকালেন। রিয়ার অ্যাডমিরালের পালসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বলছে-নিভছে ওটা। চমৎকার!

'এক্সকিউজ মি, স্যর,' হঠাৎ বলে উঠল রেডিও অপারেটর। 'একটা ফ্ল্যাশ মেসেজ রিসিভ করছি আমরা... রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের জন্য।'

কয়েক মিনিট পরেই কয়েক হাত ঘুরে একটা ক্লিপবোর্ড

পৌঁছুল রিয়ার অ্যাডমিরালের কাছে। শান্ত ভঙ্গিতে মেসেজটা ডিকোড করলেন তিনি। সেটা এ-রকম:

টপ সিক্রেট।
ফ্রম এফএসবি টু ড্রাকন।
সাবজেক্ট: অপারেশন কনফার্মেশন।
পার্সোনাল মেসেজ ফর ফ্লিট কমাণ্ডার।

১. পিবি-তে সফল হয়েছে অভিযান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিপক্ষের।

২. এক নম্বর টার্গেট, ডেজিগনেশন ওমেগার জন্য গো-কোড অনুমোদন করা হলো। ওখানকার অপারেশন শেষ হবার পর দুই নম্বর টার্গেট, ডেজিগনেশন গ্রেণ্ডেলে যাবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে।

৩. প্রাইমারি অবজেকটিভ: গ্রেণ্ডেল সাইট থেকে ডেটা এবং আলামত সংগ্রহ। সেকেণ্ডারি অবজেকটিভ: সাইট পরিষ্কার করা।

৪. সতর্কতার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, টার্গেট এরিয়ার একটি ডেল্টা ফোর্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্টেল রিপোর্টে প্রকাশ, ওদের জন্যও একই ধরনের অবজেকটিভ নির্ধারণ করা হয়েছে। অপারেশন কন্ট্রোলারের খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ডেল্টা মিশনের রঙ কালো। রিপিট, কালো।

৫. গ্রেণ্ডেল স্টেশনের ডেটা বা আলামত কোনও অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। এ-ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবার অনুমোদন দেয়া হলো।

৬. এই মেসেজ রিসিভ করার পর থেকে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। চরম জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া কোনও ধরনের যোগাযোগ করা চলবে না।

৭. মেসেজ সমাপ্ত।

পুরো মেসেজ দু'বার পড়লেন নিকোলায়েভ। ডেল্টা মিশনের রঙ কালো... মানে ব্ল্যাক অপসের কথা বলা হয়েছে। গোপন অপারেশন—প্রকাশ্য অনুমোদন নেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে। একই কথা অবশ্য তাঁদের বেলাতেও খাটে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এ-ধরনের লড়াই বহুবার দেখেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল, প্রাণও বিপন্ন করেছেন বহুবার। অথচ পুরোটাই রাজনৈতিক চাল। গোপন এই যুদ্ধের খবর কোথাও ফাঁস হলে সরাসরি অস্বীকার করবে দুই দেশের সরকার। কাউকে বলির পাঁঠা বানিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে সব দোষ।

কেন?

কারণ অন্ধকার এক গোমর লুকিয়ে আছে এর পিছনে, সেইসঙ্গে আছে বিরাট কোনও প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা। কেউই এর অস্তিত্ব স্বীকার করবে না, তাই বলে একে ছেড়েও দেয়া যায় না। লাভ-ক্ষতির সমীকরণটা বড্ড ভারী। যারা জিতবে, তারা হাতে পাবে রিয়ার অ্যাডমিরালের প্রয়াত পিতার উত্তরাধিকার—এমন এক আবিষ্কার, যা দুনিয়াকে বদলে দিতে পারে।

কার হাতে পড়বে ওটা শেষ পর্যন্ত, কেউ বলতে পারে না। তবে মনে মনে কঠিন শপথ নিয়েছেন নিকোলায়েভ, প্রাণ থাকতে ওটা আমেরিকানদের দখলে যেতে দেবেন না।

পোলারিস মনিটরে আরেকবার নজর বোলালেন তিনি। গো-কোড পেয়ে গেছেন। এবার তাঁর নিজের খেলা শুরু করবার পালা। মনিটরের পাশের রুপালি একটা বোতাম টিপে ধরলেন

তিনি, পুরো ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্য। পাশে একটা লাল বোতাম আছে, তবে সতর্কভাবে এড়িয়ে গেলেন ওটাকে, খেয়াল রাখলেন যাতে চাপ না পড়ে।

রুপালি বোতামটা ত্রিশ সেকেণ্ড চেপে ধরে রাখলে অ্যাকটিভেট হবে পোলারিস। সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চাইলে এটুকুই সময়। অ্যাকটিভেট হয়ে যাবার পর ওটাকে ঘুম পাড়াবার আর কোনও উপায় নেই। নিকোলায়েভ তা জানেন, কিন্তু একচুল সরালেন না বোতামের উপর চেপে রাখা আঙুল। দৃঢ়, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ তিনি। মনের মধ্যে কোনওরকম দ্বিধা নেই।

দীর্ঘ জীবনে মাতৃভূমিকে বার বার বদলে যেতে দেখেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। রাজা-বাদশাহদের জারিস্ট রাষ্ট্র থেকে কমিউনিস্টদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল রাশা—হয়েছিল স্টালিনের হাতের মোয়া। তারপর আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গোটা দেশ। মহা-পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন নামকা ওয়াস্তে কিছু রাষ্ট্রের সমষ্টি—প্রতিটাই দরিদ্র, হতশ্রী, ধ্বংসপ্রায়। প্রতিটা পরিবর্তন দুর্বল করেছে তাঁর মাতৃভূমিকে, একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

বাকি পৃথিবীও তার ব্যতিক্রম নয়। যুগ-যুগান্তের হিংসা আর হানাহানির বেড়াজাল থেকে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশ্বের কোনও দেশ। সন্দেহ, অবিশ্বাস আর খুনোখুনির অতলে তলিয়ে গেছে প্রত্যেকটি দেশ, জাতি আর মানচিত্র। অসম্ভব হয়ে উঠেছে নিরীহ মানুষের বেঁচে থাকা। দিনে দিনে শুধু সমস্যা বাড়ছে, সমাধান হচ্ছে না। কেউ চেষ্টাও করছে না সমাধান করবার। পৃথিবী আর পৃথিবী নেই, হয়ে গেছে ময়লা ফেলার ডাস্টবিন।

বোতাম টিপে ধরে রাখলেন নিকোলায়েভ।

সময় এসেছে সবকিছু বদলে দেবার। পুরনো ইমারতের

জায়গায় নতুন ইমারত গড়তে চাইলে প্রথমে ভাঙতে হবে পুরনোটাকে। তা-ই করতে চলেছেন তিনি। পঙ্কিল দুনিয়ার অবসান ঘটাবেন। জঘন্য এই ইতিহাস ধুয়ে মুছে যাবে... নবজাতকের মত নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ এক পৃথিবী জন্ম নেবে নয়া বরফযুগ পেরিয়ে।

এটাই হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ্যালেরি নিকোলায়েভের উপহার।

ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে, পোলারিস মনিটরের পাঁচটা বিন্দু এবার পালাক্রমে জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। বোতামটা ছেড়ে দিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। ব্যস, কাজ হয়ে গেছে। অ্যাকটিভেট করে দিয়েছেন তিনি পোলারিসকে। বাকি শুধু মাস্টার ট্রিগার বসানো। এরপরেই সত্যি হবে তাঁর স্বপ্ন... ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। মাস্টার ট্রিগারের বোতামে চাপ দেবার পর হারমোনিক্স ওয়েভের ধ্বংসলীলা ঠেকাতে পারবে না কেউ। কোনও অ্যাবোর্ট বাটন নেই এই ডিভাইসের, নেই কোনও ফেইল-সেইফ।

রিয়ার অ্যাডমিরালের দিকে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন রুশকিন। 'স্যর?'

মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালেন নিকোলায়েভ। ক্যাপ্টেনকে বড্ড তুচ্ছ মনে হলো তাঁর কাছে। পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুই জানা নেই বেচারার। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। একটাই কাজ বাকি তাঁর—উদ্ধার করতে হবে পিতার মৃতদেহ। তাকে সমাহিত করতে হবে উপযুক্ত মর্যাদায়। আর কোনও কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয় এর চেয়ে।

'স্যর?' আবার ডাকল রুশকিন। 'কী হয়েছে?'

সংবিৎ ফিরে পেলেন নিকোলায়েভ। শান্ত গলায় বললেন, 'কিছুই না। নতুন অর্ডার এসেছে আমাদের জন্য। ইঞ্জিন চালু করো।'

ইউ.এস.এস. পোলার সেন্টিনেল।

এক নম্বর পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে রেখেছেন ক্যাপ্টেন গরডন, শান্তভাবে জরিপ করছেন চারপাশের অবারিত বরফের বিস্তার। দশ মিনিট হলো সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে সেন্টিনেল, বরফের ফাটল দিয়ে উপরে তোলা হয়েছে পেরিস্কোপ। মেঘলা আকাশ দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপ্টেন, বড়-সড় ঝড় হতে যাচ্ছে শীঘ্রি। কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন তিনি।

রাতভর ড্রিফট স্টেশন আর রাশান বেইসের চারদিকে টহল দিয়েছে সেন্টিনেল, চোখ-কান খোলা রেখেছে রাশান সাবমেরিনের খোঁজে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ছায়াও দেখা যায়নি ড্রাকনের। একদল বেলুগা তিমি ছাড়া আর কোনও সোনার কণ্ট্যাক্টও পাওয়া যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই এলাকায় সেন্টিনেলই একমাত্র জলযান।

তারপরেও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি ক্রু-দের। বিপদের আশঙ্কা করছে প্রতি মুহূর্তে। করবে না-ই বা কেন, নখদন্তহীন বাঘের দশা ওদের—কোনও ধরনের অস্ত্র ছাড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে রাশান নেভির অত্যাধুনিক একটা সাবমেরিনকে... বেঘোরে মারা পড়তে হবে লড়াই বেধে গেলে। *ড্রাকন*... মানে ড্রাগন... মনে মনে ভাবলেন ক্যাপ্টেন, নামের মধ্যেই আছে হিংস্রতার আভাস। আকুলা টু ক্লাস সাবমেরিন সম্পর্কে জানেন তিনি—অস্বাভাবিক দ্রুতগতির *স্কাভাল* টর্পেডো আর *এসএসএন-১৬* অ্যান্টি-সাবমেরিন মিসাইল থাকে ওগুলোয়... আমেরিকান ফ্লিটের সেরা সাবমেরিনের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারবে। যদি কোনও কারণে ড্রাকনের সঙ্গে লড়াই বাধে পোলার সেন্টিনেলের... তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে শক্তিশালী হাঙরের সঙ্গে পুঁটি মাছের লড়াইয়ের মত।

ডিউটি ওয়াচের রেডিওম্যান উদয় হলো ক্যাপ্টেনের পিছনে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। ডেডহর্সের কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। লাইনে আছেন উনি। তবে ট্রান্সমিশন খুব দুর্বল।'

পেরিস্কোপ ডেপথে উঠে আসার পর রেডিওম্যানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন—প্রুডো বে-র সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখতে। পরিস্থিতির হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানা দরকার তাঁর।

'অসুবিধে নেই।' পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরালেন ক্যাপ্টেন। হাতল ভাঁজ করে উপরে ঠেলে দিলেন পোলটাকে। নেমে এলেন পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে। 'চলো।'

ক্যাপ্টেনকে কমিউনিকেশন রুমে নিয়ে গেল রেডিওম্যান। বলল, 'তাড়াতাড়ি কথা বলবেন, স্যর। লাইনটা যে-কোনও মুহূর্তে কেটে যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিও সেটের দিকে এগোলেন ক্যাপ্টেন। টুলে বসে হেডসেট পরলেন। 'দিস ইজ ক্যাপ্টেন গরডন।'

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন! কমাণ্ডার ট্যানার বলছি।' খসখসে একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। ভলিউম ওঠানামা করছে অবিরাম। 'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় খুব ভাল হলো।'

'সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ কেমন এগোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন গরডন।

'এখনও সার্কাস চলছে এখানে। তবে আগুনটা ঠেকাতে পেরেছি আমরা। সম্ভবত স্যাবোটিয়ারদের ব্যাপারে কিছুটা ক্লু-ও পাওয়া গেছে।'

'তা-ই? ওদের পরিচয় জানা গেছে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল ট্যানার। তারপর বলল, 'আমি আশা করছি, জবাবটা আপনার কাছে পাওয়া যাবে।'

'আমার কাছে!' বিস্মিত হলেন গরডন।

'হ্যাঁ। আপনি যোগাযোগ করার আগে আমরা ওমেগা স্টেশনকেই ডাকাডাকি করছিলাম। আসলে... ব্যাপার হয়েছে কী... ঘণ্টাখানেক আগে বেনামী একটা প্যাকেজ পেয়েছি আমরা, ওর ভিতর একটা ভিডিও ফুটেজের ডিস্ক ছিল। ওতে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের ঠিক আগ-মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিমান উড়ছিল এক নম্বর গ্যাদারিং স্টেশনের উপর দিয়ে। ভিডিওটা অবশ্য অস্পষ্ট... মনে হচ্ছে নাইটভিশন ক্যামেরা দিয়ে শূট করা হয়েছে।'

'এর সঙ্গে ওমেগা স্টেশনের সম্পর্ক কোথায়?'

'আপনার সিকিউরিটি টিম আজ সকালে যোগাযোগ করেছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, খোঁজ নিয়েছে একটা বিমান আর চারজন আরোহী সম্পর্কে। বাপ-সহ জনৈক শেরিফ, নুমার এক প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর জনৈক রিপোর্টার। ভিডিও ফুটেজ থেকে বিমানের কলসাইন উদ্ধার করেছি আমরা, নিজেরাও যোগাযোগ করেছিলাম ফেয়ারব্যাঙ্কসে। তখুনি জানলাম—দুটো একই বিমান!'

'কোথায় এখন ওই বিমান?' জানতে চাইলেন গরডন। জবাবটা আন্দাজ করতে পারছেন।

'আজ ভোরে ওটা ওমেগা স্টেশনের পাশে ল্যাণ্ড করেছে। প্যাসেঞ্জারদের আটকে রেখেছে আপনার সিকিউরিটি।'

নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করলেন ক্যাপ্টেন। রাতভর জেগে ছিলেন, ভেবেছিলেন এখন একটু ঘুমিয়ে নেবেন, তা আর হলো না।

কমাণ্ডার ট্যানার বলল, 'অলরেডি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছি আমি। বন্দিদেরকে ডেডহর্সে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।'

'আপনি কি ভাবছেন, ওরাই হামলা করেছে পাম্প স্টেশনে?'

'এখুনি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। নিশ্চিত হবার জন্যই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছি। আসল ঘটনা যা-ই হোক, আপাতত ওদেরকে বৈরি ধরে নেয়া ভাল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন গরডন। যুক্তি আছে কমাণ্ডারের কথায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাম্প স্টেশনের হামলাকারীরা ওমেগা স্টেশনে কেন গেছে? ওরা যদি হামলাকারী না-ও হয়, ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স বলে মানতে পারছেন না। একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে—প্রথমে প্রুডো বে-তে বিস্ফোরণ, তারপর রাশানদের সন্দেহজনক আচরণ, সবশেষে ওমেগায় অবাঞ্ছিত অতিথি... এতগুলো ঘটনা কাকতাল হতে পারে না কিছুতেই। নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে সবগুলোর মাঝে। কী সেটা?

'বন্দি হস্তান্তরের আগে ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে আমাকে,' ট্যানারকে বললেন তিনি। 'তার আগ পর্যন্ত দেখেশুনে রাখব ওদের, কিচ্ছু ভাববেন না।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। গুড হান্টিং!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ট্যানার।

হেডসেট খুলে রাখলেন গরডন। ঘুরলেন রেডিওম্যানের দিকে। 'ওমেগা স্টেশনে পৌঁছুনোমাত্র অ্যাডমিরাল বেকেটের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, স্যর। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

কমিউনিকেশন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন, ফিরে গেলেন ব্রিজে।

কমাণ্ডার ফিশার জিজ্ঞেস করল, 'কিছু জানা গেল, স্যর?'

'হুঁ। মনে হচ্ছে উড়ে এসে ঝামেলাটা এখন আমাদের কোলের মধ্যে পড়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল ফিশার। 'মানে, স্যর?'

'মানে হচ্ছে আমাদেরকে এখুনি ফিরতে হবে ড্রিফট স্টেশনে।

নতুন কিছু অতিথি এসেছে, ওদেরকে খাতিরদারি করা দরকার।'

'রাশানরা?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। নির্দেশ দিলেন, 'ওমেগা স্টেশনের দিকে কোর্স সেট করো।'

'আই, আই, ক্যাপ্টেন।' বলে চলে গেল ফিশার।

নিজের চেয়ারে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। মেলাতে চেষ্টা করলেন ধাঁধাটা। কিন্তু অনেক কিছুই এখনও অস্পষ্ট। কয়েক দফা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। খামোকা মগজকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। যথাসময়ে জানা যাবে সব। ক্লান্তি অনুভব করছেন, ড্রিফট স্টেশনে পৌঁছুনোর আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি, থেমে গেলেন সোনার ওয়াচের সুপারভাইজরের কণ্ঠ শুনে।

'উই হ্যাভ আ কণ্ট্যাক্ট, ক্যাপ্টেন!'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল সবার। ত্রস্ত পায়ে সোনার স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল কমাণ্ডার ফিশার, যোগ দিল সুপারভাইজর আর টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে। চোখ বোলাল মনিটরে ভাসতে থাকা ডেটার উপরে।

একটু পর ঘাড় ফেরাল সে। বলল, 'আরেকটা সাবমেরিন, ক্যাপ্টেন। আকারে বেশ বড়।'

'ড্রাকন।' শান্ত গলায় বললেন গরডন।

'আমারও তা-ই ধারণা,' থমথম করছে কমাণ্ডার ফিশারের কণ্ঠ। 'কারণ ওটা সরাসরি ওমেগা স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে।'

একুশ

আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল।

স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে এসে গায়ের পারকা খুলে ফেলল শ্যারন। স্টেশনের মূল অংশে আগের মতই গরম বিরাজ করছে। সেইসঙ্গে ভ্যাপসা বাতাস, শরীরে ঘাম ঝরার মত অবস্থা। কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগল না ওর। দ্বীপের হৃৎপিণ্ডের কনকনে ঠাণ্ডায় অনেকটা সময় কাটানোর পর উত্তাপটা বড় আরামদায়ক মনে হচ্ছে। স্নেক পিটের দরজার পাশের একটা হুকে ঝুলিয়ে রাখল পারকা।

ড. মিকেলসেনও বেরিয়ে এসেছেন ওর সঙ্গে। জ্যাকেট খুললেন না তিনি। শুধু চেইন খুললেন, আর মাথা থেকে নামিয়ে রাখলেন হুড। হাতের গ্লাভস খুলে পকেটে ভরে ফেললেন, দুই তালু ঘষলেন গরম করে নেবার জন্য। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করবেন আপনি?'

'ওমেগায় ফিরে যাব,' বলল শ্যারন। 'ঝড় আসছে বলে খবর পেয়েছি, তার আগেই পৌঁছুতে চাই ওখানে। নইলে এখানে দু-তিনদিনের জন্য আটকা পড়ে যাব।'

'সেটা উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন গরডন ফিরলে একসঙ্গে বসা দরকার আপনাদের। এখানকার আবিষ্কার সম্পর্কে এখনও কিছু জানেন না উনি।'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। ওখানেই কথা হবে ওঁর সঙ্গে।'

উল্টো দিকের বন্ধ দরজাটার উপর দৃষ্টি আটকে গেল বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের। প্রহরীর সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে, এখন মাত্র একজন সিম্যান পাহারা দিচ্ছে ওখানে। বাড়তি সমস্ত লোক ফিরে গেছে পোলার সেণ্টিনেলে।

'কী ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

'কী আছে ওই দরজার পিছে... আমাকে জানানো যায় না?' মৃদু গলায় বললেন মিকেলসেন।

'না জানাই মঙ্গল আপনার জন্য,' ইতস্তত করে বলল শ্যারন।

'আমি বিজ্ঞানী,' বললেন মিকেলসেন। 'অজানাকে জানাই আমার নেশা। মানা করলেও ওটার কথা না ভেবে পারছি না।'

'সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরবার পরামর্শ দেব আপনাকে। একটা না একটা সময় ঠিকই জানতে পারবেন সব।'

'কখন সেটা?' ভুরু নাচালেন মিকেলসেন। 'রাশানরা আসার পর?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল শ্যারন। 'ব্যাপারটা আমার হাতে নেই।' তিক্ততা ফুটল ওর গলায়। সহকর্মীদের কাছে কোনও কিছু গোপন রাখার পক্ষপাতী নয় ও, রাজি নয় কোনও কিছু ধামাচাপা দিতে। বন্ধ দরজার ওপারে যা লুকিয়ে আছে, তার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে। শাস্তি পাওয়া উচিত তাদের। অথচ রহস্যটা গোপন করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে সরকার!

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে শুরু করল শ্যারন, পিছু পিছু ড. মিকেলসেন। হঠাৎ কম্পন অনুভব করল পায়ের তলায়। শুনতে পেল মোটরের আবছা আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই এলিভেটরের লোহার খাঁচাটা ওদেরকে পেরিয়ে উঠে গেল উপরে।

'এলিভেটর ঠিক হয়ে গেছে নাকি?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'ফস্টারের কাজ,' নাসার ইঞ্জিনিয়ারের নাম বললেন মিকেলসেন। 'দিনরাত খাটছে বেইসের পুরনো মেশিনারি নিয়ে। যেন নতুন খেলনা পেয়েছে একটা বাচ্চা!'

'ভালই তো!' হাসল শ্যারন। উঠতে থাকল উপরে।

টপ লেভেলে পৌঁছে বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফারের কাছ থেকে বিদায় নিল ও। যে-কামরায় রাত কাটিয়েছে, চলে গেল ওখানে। গুছিয়ে নিল নিজের জিনিসপত্র। এরপর পরতে শুরু করল থারমাল রেসিং সুট। আইস বোট নিয়ে ফিরে যাবে ওমেগায়। জিয়োলজিস্ট আর বায়োলজিস্টদের মধ্যকার ঝামেলা মিটে যাওয়ায় আগামী দুটো দিন শান্তিতে কাটাতে পারবে বলে আশা করছে।

কামরা থেকে বেরুতেই নেভির ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ের মুখোমুখি হলো শ্যারন। লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্স—গ্রেণ্ডেল স্টেশনে মোতায়েন হওয়া নেভাল টিমের একমাত্র নারী-সদস্য। সুন্দর চেহারা, কিন্তু রুক্ষ। দেহ বেশ লম্বা-চওড়া। মাথায় ববকাট চুল। দেখলেই কিংবদন্তির আমাজন নারী-যোদ্ধাদের কথা মনে পড়ে যায়। এমনিতে অবশ্য লিসা খুবই অমায়িক মেয়ে। শ্রদ্ধাশীলও বটে।

'এক্সকিউজ মি, ড. বেকেট,' বলল সে। 'ওমেগা থেকে *একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য।'*

ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। আবার কী হলো? জিজ্ঞেস করল, 'কী মেসেজ?'

'বিমান নিয়ে কয়েকজন সিভিলিয়ান আজ ভোরে ল্যাণ্ড করেছে ওখানে। সিকিউরিটির লোকেরা আটক করেছে ওদেরকে।'

বিস্ময় ফুটল শ্যারনের চেহারায়। 'কতজন এসেছে? কী ওদের পরিচয়?'

'মোট চারজন। একজন আলাস্কার শেরিফ, সঙ্গে তাঁর বাবা। এ ছাড়া নুমার একজন অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর একজন

সাংবাদিক আছে ওঁদের সঙ্গে। সবার পরিচয় ভেরিফাই করে দেখা হয়েছে।'

'তা হলে আটকে রাখার দরকার কী?'

ইতস্তত করল লিসা। 'ইয়ে... প্রুডো বে-র ঘটনার পর থেকে...' কথা শেষ করল না। কাঁধ ঝাঁকাল।

'হুম!' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল শ্যারন, কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। 'কেন এসেছে ওরা, কিছু বলেছে?'

'ওরা এই স্টেশনের... মানে গ্রেগুলের খবর জানে।'

'কী! কীভাবে?'

'বলেনি,' মাথা নাড়ল লিসা। 'শুধু বলছে, ঝামেলা দেখা দিতে চলেছে এখানে। পাইপলাইনে স্যাবোটাজের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক আছে এর। এর বেশি আর কিছু বলতে রাজি হয়নি। অথোরিটি আছে, এমন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্যাপ্টেন গরডনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

বুঝল শ্যারন, ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে ওকেই এখন সামলাতে হবে ব্যাপারটা। বলল, 'আমি এখুনি ফিরছি ওমেগা স্টেশনে। ওখানে গিয়ে কথা বলব। খবরটা জানিয়ে দিতে পারো।'

ঘুরতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল লিসার ডাক শুনে।

'আরেকটা ব্যাপার, ড. বেকেট! এখানে আসতে চাইছে ওরা। খুব চেঁচামেচি জুড়েছে এ-নিয়ে।'

মানা করে দিতে যাচ্ছিল শ্যারন, কিন্তু মত বদলাল পরমুহূর্তে। একটু আগেই বিতৃষ্ণা অনুভব করছিল এখানকার রহস্য ধামাচাপা দেওয়া নিয়ে। নিজে তাতে তাল মেলায় কীভাবে? ভালমত ভেবে দেখল ব্যাপারটা। একজন সাংবাদিক এলে মন্দ হয় না, সবকিছু টুকে নিতে পারবে... সময়-সুযোগমত প্রকাশ

করতে পারবে সব সারা পৃথিবীর সামনে। সঙ্গে যদি একজন শেরিফ আর নুমার মত বিখ্যাত সংগঠনের স্টাফ সাক্ষী হিসেবে থাকে...

আরেকটু ভাবল শ্যারন। এখন যদি ওমেগায় ফিরে যায় ও, নিঃসন্দেহে ঝড়ের কারণে আটকা পড়ে যাবে কয়েকদিনের জন্য। এর মাঝে ফিরে আসবেন ক্যাপ্টেন গরডন, কিছুতেই তিনি কোনও বহিরাগত মানুষকে গ্রেণ্ডেল স্টেশনে আসতে দেবেন না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, ওপরমহল থেকে কড়া নির্দেশ আছে তাঁর উপরে। কিন্তু অমন কোনও বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ নয় শ্যারন। বড় করে শ্বাস নিল ও। ছোট্ট একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সত্যকে বাইরের দুনিয়ায় পৌঁছে দেবার, এমন সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

লিসার দিকে ফিরল ও। নির্দেশ দিল, 'বন্দিদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।'

'জী?' লিসা মনে হলো কথাটা বুঝতে পারেনি।

'এখানেই ওদের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

একটা ভুরু উঁচু করল লিসা। 'আমার মনে হয় না লেঃ কমাণ্ডার রাইট তাতে রাজি হবেন।'

'ওদেরকে এখানেও তো আটকে রাখা যাবে,' যুক্তি দেখাল শ্যারন। 'রাইটকে বলো, নিরাপত্তার জন্য যত খুশি লোক পাঠাতে পারে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঝড় শুরু হবার আগেই ওদেরকে এখানে চাই আমি। দ্যাটস্ অ্যান অর্ডার!'

শ্যারনের দৃঢ় গলা শুনে একটু সিঁটিয়ে গেল লিসা। ক্যাপ্টেন গরডন এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের অনুপস্থিতিতে ড. বেকেটই যে সবকিছুর ইনচার্জ, তা মনে পড়ে গেল। 'ইয়েস, ম্যা'ম!' গোড়ালি ঠুকে বলল সে। চলে গেল রেডিওরুমের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কামরায় আবার ফিরে গেল শ্যারন।

নামিয়ে রাখল জিনিসপত্র। সোজা হতেই হকচকিয়ে গেল দরজায় ড. জেফরি বেনটনকে দেখতে পেয়ে। বধির হবার এই এক সমস্যা। পায়ের আওয়াজ শোনা যায় না।

'কিছু হয়েছে, জেফরি?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

চেহারায় উদ্বেগ ফুটে আছে বেনটনের। ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... মেগানকে দেখেছেন আপনি, ড. বেকেট?'

'মেগান গুড? আপনার অ্যাসিসটেন্ট?'

মাথা ঝাঁকাল বেনটন।

নাক চুলকাল শ্যারন। 'যদ্দূর মনে পড়ে, স্নেক পিটে ঢুকেছিল আমার পিছু পিছু। হাতে স্কেটস দেখেছি ওর। হয়তো প্র্যাকটিস করছে ওখানে।'

ঘড়ি দেখল বেনটন। 'এক ঘণ্টা আগে ফেরার কথা ছিল ওর। একসঙ্গে আমাদের... ইয়ে... কিছু ডেটা নিয়ে বসার কথা।'

'টানেলে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে দেখিনি ওকে।'

উদ্বেগের ছায়াটা আরও গাঢ় হলো বেনটনের মুখে।

'হারিয়ে-টারিয়ে যায়নি তো?' অনুমান করল শ্যারন। 'স্নেক পিটের ভিতরটা তো রীতিমত গোলকধাঁধা।'

'আমি বরং গিয়ে দেখি,' বলল বেনটন। 'ওর রুট আমি চিনি।' উল্টো ঘুরে হনহন করে চলে গেল সে।

'কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান,' পিছন থেকে বলে দিল শ্যারন।

হাত নাড়ল বেনটন। পরামর্শটা গ্রহণ করল না প্রত্যাখ্যান করল, বোঝা গেল না। তার অপসৃয়মাণ অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্যারনও আক্রান্ত হলো উৎকণ্ঠায়। মেগানের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা আছে ওর, বেশ পছন্দ করে মেয়েটাকে। আহত-টাহত হয়ে কোথাও পড়ে নেই তো? চিন্তিত মুখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও।

ডাইনিং স্পেসে একটা টেবিলে বসে আছেন ড. মিকেলসেন।

শ্যারনকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন। সেদিকে এগিয়ে গেল ও।

'আপনি এখনও এখানে?' বিস্মিত গলায় বললেন বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। 'যাননি?'

'প্ল্যানে সামান্য রদবদল করতে হয়েছে,' হালকা গলায় বলল শ্যারন। 'যাব না ঠিক করেছি।'

'হুম! এনিওয়ে, মরিসের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি,' টেবিলে উপবিষ্ট দ্বিতীয় মানুষটার দিকে ইশারা করলেন মিকেলসেন। ড. মরিস রেনার্ড—কানাডিয়ান আবহাওয়াবিদ। 'বাইরে কিছু সেন্সর বসিয়েছে ও। ওগুলো থেকে পাওয়া ডেটা বলছে, ঝড়টা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে অলরেডি ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে বইছে বাতাস।'

মাথা ঝাঁকাল রেনার্ড। 'ছোটখাট প্রলয় বলতে পারেন। এখানে ভালমতই আটকা পড়ব আমরা।'

গম্ভীর হয়ে গেল শ্যারন। নবাগতদের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেছে। বিপদ দেখা দিতে চলেছে আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা এমন কিছু জানে, যা এখানকার লোকেরা জানে না। বিপদ বলতেও কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বোঝায়নি।

'কোনও সমস্যা, ড. বেকেট?' জিজ্ঞেস করল রেনার্ড। 'আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'না,' তাড়াতাড়ি বলল শ্যারন। 'কিছু না।'

ওমেগা ড্রিফট স্টেশন।

বাড়তি কোল্ড গিয়ার সরবরাহ করেছে নেভির লোকেরা, সেখান থেকে একটা পারকা গায়ে চড়াল রানা, মাথায় পরল উলের ক্যাপ, হাতে মোটা গ্লাভস। ওর সঙ্গীরাও ব্যস্ত কাপড়

পরায়। আড়চোখে প্রহরীদের দিকে তাকাল ও।

'সানগ্লাসও লাগবে আপনাদের,' বলে উঠল লেঃ কমাণ্ডার রাইট।

'আমার কাছে সানগ্লাস নেই,' নিজের ব্যাকপ্যাক ঘেঁটে জানাল ম্যাসন। একটু আগে বিমান থেকে প্যাকটা এনে দিয়েছে এক নাবিক।

বিরস মুখে পকেট থেকে নিজের সানগ্লাসটাই তার হাতে তুলে দিল রাইট, আপাতত ওমেগাতেই থাকবে সে, সানগ্লাসের প্রয়োজন নেই। আচরণে বিরক্তি চাপা থাকল না। ড. বেকেটের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারেনি, মন খুঁতখুঁত করছে অচেনা মানুষগুলোকে রাশান বেইসে পাঠানোর ব্যাপারে। নির্দেশটা অন্য কোনও সিভিলিয়ানের কাছ থেকে এলে হয়তো বা প্রতিবাদই করে বসত। কিন্তু প্যাসিফিক সাবমেরিন ফ্লিটের কমাণ্ডার অ্যাডমিরাল হেনরি বেকেটের মেয়েকে খেপিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চায়নি। বলা যায় না, বাপের কাছে অভিযোগ করে হয়তো বা তার চাকরিই গরম করে দিল মেয়েটা!

হাঁটু গেড়ে বসে লোবোকে আলিঙ্গন করল অ্যাবি, হাত বুলিয়ে দিল মাথায়। 'লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকিস,' কুকুরটাকে বলল ও। 'আমরা খুব শীঘ্রি ফিরব।'

মন খারাপ ওর। সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে রাইট—রাশান বেইসে কুকুর নেয়া যাবে না, ওকে রেখে যেতে হবে এখানে। অপরিচিত মানুষের মাঝে প্রিয় কুকুরটাকে ফেলে যেতে মন চাইছে না অ্যাবির। কিন্তু উপায়ও নেই।

পিছন থেকে অল্পবয়েসী এক নাবিক এগিয়ে এল। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, ম্যা'ম। আপনার কুকুরটাকে ভালমতই দেখেশুনে রাখব আমি।'

উঠে দাঁড়িয়ে নাবিকের মুখোমুখি হলো অ্যাবি। স্থানীয়

চেহারা। নেমটালি পড়ল—জিম পাটইয়াক। বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি ইনুইট?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' মাথা ঝোঁকাল নাবিক। 'এনসাইন জিম পাটইয়াক... অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।'

'পাটইয়াক?' ভুরু কোঁচকালেন রিচার্ড। এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। 'তুমি জন পাটইয়াকের ছেলে নও তো?'

'জী, স্যর। আপনি চেনেন আমার বাবাকে?'

'চিনি না মানে!' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিচার্ডের। 'ও তো আমার পুরনো বন্ধু! অনেকদিন দেখা নেই। অ্যাবি, তুইও তো দেখেছিস ওদেরকে ছোটবেলায়। মনে হয় ভুলে গেছিস। তারপর? কেমন আছে জন?'

'বয়স হয়ে গেছে, আগের চেয়ে দুর্বল। সময় করে দেখে আসেন না কেন ওঁকে?'

'যাব... নিশ্চয়ই যাব।'

'অ্যাই!' খেঁকিয়ে উঠল রাইট। 'তোমাদের রি-ইউনিয়ন বন্ধ করো। ঝড় আসতে বেশি দেরি নেই।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল অ্যাবি। জিমকে বলল, 'আমরা তা হলে আসি। পরে কথা হবে। খেয়াল রেখো লোবোর দিকে।'

'একদম চিন্তা করবেন না ওকে নিয়ে।' হাসল জিম। 'যান।'

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল রাইট। 'তা হলে রওনা হয়ে যান। এসকর্ট থাকছে আপনাদের সঙ্গে। প্লিজ, ওদের অবাধ্য হবেন না। যখন যে-নির্দেশ দেয়া হবে, সেটাই পালন করবেন। নইলে কঠোর হতে বাধ্য হবে ওরা।'

'ইটস্ ওকে, লেঃ কমাণ্ডার,' রানা বলল। 'আমাদেরকে শত্রু ভাবার কোনও দরকার নেই।'

'আমি শুধু সাবধান থাকতে চাইছি,' গম্ভীর গলায় বলল রাইট। 'দয়া করে রওনা হন এবার। দেরি করলে ঝড়ের কবলে

পড়বেন।'

অস্ত্রধারী চারজন প্রহরী এগিয়ে এল। ইশারা করল ওদেরকে এগোবার জন্য। মেস হল থেকে বেরিয়ে এল দলটা, হাঁটতে শুরু করল করিডোর ধরে।

রানার পাশে চলে এল অ্যাবি। বলল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না তোমার? আমাদেরকে রাশান বেইসে যেতে দিচ্ছে?'

'সিদ্ধান্তটা এখানকার রিসার্চ টিম লিডারের,' রানা বলল। 'শুনলাম কোন্ এক অ্যাডমিরালের মেয়ে। তাই বোধহয় ঘাঁটাবার সাহস পায়নি তাকে।'

'তারপরেও...'

'কথা নয়, প্লিজ,' পিছন থেকে বলে উঠল এক এসকর্ট। 'দ্রুত পা চালান।' অনুরোধের মত শোনালেও, আসলে আদেশ দেয়া হলো ওদেরকে।

চুপচাপ জেমসওয়ে হাট থেকে বেরিয়ে এল দলটা। বাইরে পা রাখতেই চরম আক্রোশ নিয়ে হামলা চালাল ঠাণ্ডা বাতাস। হাত-পা জমে যাবার জোগাড়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উন্মুক্ত চামড়া আর কাপড়-চোপড়ের উপর জমে গেল বরফের পরত। আকাশের সূর্যও ম্লান হয়ে গেছে, চারদিকে গোধূলির মত অন্ধকার। তুষারঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ।

স্টেশনের পাশে পার্ক করে রাখা হয়েছে দুটো স্নোক্যাট। সেদিকে ওদেরকে নিয়ে চলল এসকর্টরা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে কড়-কড়-কড়াৎ আওয়াজ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল ম্যাসন। জিজ্ঞেস করল, 'কীসের আওয়াজ?'

'বরফ ভাঙছে,' বলল রানা। 'এখানকার বাতাস অত্যন্ত শক্তিশালী। সারফেস আর প্রেশার রিজের গা থেকে ভেঙেচুরে তুলে আনছে বরফ।'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এ-সবের সঙ্গে পরিচিত।'

'আর্কটিকে আগেও এসেছি আমি। বহুবার।'

আবারও বজ্রপাতের মত আওয়াজ হলো। কপালে চিন্তার রেখা ফুটল রানার। বোঝা যাচ্ছে, চরম আকার ধারণ করতে চলেছে ঝড়। রীতিমত তাণ্ডব বাধিয়ে দেবে বরফদ্বীপের উপর। ওমেগা স্টেশনের দিকে চাইল—জেমসওয়ে হাটগুলো যথেষ্ট মজবুত, কিন্তু প্রকৃতির আক্রোশ পাহাড়কেও টলিয়ে দিতে পারে, মানুষের তৈরি ক'টা কুঁড়েঘর তো কোন্ ছার! আশা করল, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে বিকল্প শেল্টার নেবার ব্যবস্থা আছে বিজ্ঞানীদের।

স্নোক্যাটের পাশে পৌঁছুল দলটা। অ্যাবি আর রিচার্ডকে একটায় ওঠাল এসকর্টরা। অন্যটার দিকে নিয়ে চলল রানা আর ম্যাসনকে। রাইটের কৌশল বুঝতে কষ্ট হলো না রানার। বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে ওদের চারজনকে—মানুষ যত কম, পাহারা দিতে তত সুবিধে। এর মানে হলো, সামান্য এক বিন্দু বিশ্বাসও করছে না সে অতিথিদেরকে।

ওদিকে প্রথম স্নোক্যাটের সামনে, ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসেছেন রিচার্ড আর অ্যাবি। অস্ত্রসহ দু'জন এসকর্ট উঠল পিছনে। ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, হিটার চালাতে পারছি না। ত্রিশ মাইল যেতে হবে আমাদেরকে, তেল বাঁচানো দরকার।'

'অসুবিধে নেই,' বলল অ্যাবি। 'আমরা আলাস্কার মানুষ, ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত।' স্নোক্যাটের ভিতরটা বাইরের তুলনায় গরম, খারাপ লাগছে না ওর।

মাথা ঝাঁকিয়ে গিয়ার বদলাল ড্রাইভার। বরফের বুকে কামড় বসাল ট্র্যাক, মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল স্নোক্যাট। দ্বিতীয়টা আগেই রওনা হয়েছে, ওটার পিছু পিছু এগোল। কিছুদূর এগিয়েই ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম চাপল ড্রাইভার, নিচু লয়ের গান

ভেসে এল স্পিকার থেকে।

'ধ্যাত্তেরি!' পিছন থেকে বলে উঠল এক এসকর্ট। 'কী এক মরা গান লাগিয়েছ! ভাল কিছু নেই?'

'খবরদার!' হুঁশিয়ার করল ড্রাইভার। 'ঘ্যান ঘ্যান করলে কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজাব!'

'না, না, কোনও দরকার নেই। অপূর্ব তোমার রুচি। খুব সুন্দর গান বাজাচ্ছ।'

হেসে ফেলল অ্যাবি। চোখ ফেরাল বাইরে। দ্রুত পিছে পড়ে যাচ্ছে ওমেগা স্টেশন। সিকি মাইল যেতেই জমাট কুয়াশার আড়ালে আবছা হয়ে এল। সোজা হতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে। স্টেশন থেকে খানিক দূরে আলোড়ন উঠেছে বরফের গায়ে, ফুলে উঠছে সারফেস। হঠাৎ সশব্দে বিস্ফোরিত হলো, সেখান দিয়ে উদয় হলো কালচে একটা আকৃতি। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল অ্যাবি, জিনিসটা কী বুঝতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্ত পরে বাতাসের তোড়ে একটু হালকা হয়ে এল কুয়াশা, উঁচু হয়ে থাকা কোনিং টাওয়ার চিনতে পারল ও। বরফ ভেদ করে উঠে এসেছে একটা সাবমেরিন। খোলের বিভিন্ন ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাষ্পের ধারা, যেন ওটা কোনও জীবন্ত প্রাণী। হ্যাচ খুলে যেতে দেখল ও। দ্রুতগতিতে অনেক মানুষ নেমে আসছে সাবমেরিন থেকে।

'ওটা কি আপনাদের সাবমেরিন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাবি।

একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল তিন নৌ-সদস্য। ড্রাইভারের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে প্রখর। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! এ তো দেখছি রাশানরা!!'

ব্রেক কষে স্নোক্যাট থামিয়ে ফেলল সে। সামনে তাকাল অ্যাবি। রানাদের স্নোক্যাট এগিয়ে যাচ্ছে আগের গতিতে। একটু

পরেই কুয়াশার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাবমেরিনটা সম্ভবত লক্ষ করেনি ওরা।

স্নোক্যাটের বাকি আরোহীরা তখনও তাকিয়ে আছে পিছনদিকে। শান্ত গলায় রিচার্ড বললেন, 'সাদা পারকা পরেছে ওরা। ক্যামোফ্লাজ।'

ঠিকই বলছেন ভদ্রলোক, একমত হলো নৌ-সদস্যরা। দরজা খুলে অস্ত্র হাতে নেমে পড়ল একজন এসকর্ট।

'কোথায় যাচ্ছেন?' বলল অ্যাবি। 'ফিরে আসুন।'

কথা শুনল না সে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওমেগা স্টেশনের দিকে মুখ করে। গম্ভীর চোখে জরিপ করছে রাশান সাবমেরিন আর ছোটাছুটি করতে থাকা মানুষগুলোকে।

কুয়াশার মাঝে লেজার সাইটের ঝলকানি দেখা গেল। এর খানিক পরেই বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল সাবমেরিনের আপার ডেক থেকে। বাতাস ভেদ করে ছুটে গেল একটা রকেট, সরাসরি গিয়ে আঘাত হানল ড্রিফট স্টেশনের বাইরের দিককার একটা হাটে। লাল-কমলা শিখা ছড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল হাট, বরফের গায়ে সৃষ্টি হলো দশ ফুট চওড়া একটা গর্ত।

'ওহ্ গড!' গুঙিয়ে উঠল পিছনের সিটে বসা দ্বিতীয় এসকর্ট। 'স্যাটেলাইট অ্যারে উড়িয়ে দিয়েছে ওরা!'

অ্যাবি লক্ষ করল, লাল রঙের একটা লেজার পয়েন্টার নাচানাচি করছে বরফের উপর, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই স্থির হলো স্নোক্যাটের গায়ে। ওদেরকে দেখে ফেলেছে শত্রুরা!

'মুভ!' চেঁচাল ও।

নড়ল না ড্রাইভার। বসে আছে হতভম্বের মত। শরীর মুচড়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল অ্যাবি, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। গিয়ার দেয়াই ছিল, ঝাঁকি খেয়ে আগে বাড়ল স্নোক্যাট।

'করছেন কী আপনি?' রাগী গলায় বলল ড্রাইভার। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল অ্যাবির পা।

'কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছেন না?' খ্যাপাটে গলায় বলল অ্যাবি। 'আপনাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। ভেবেছেন আমাদেরকে যেতে দেবে?'

ওর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্যই বুঝি দূর থেকে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। বরফ ছিটকাল স্নোক্যাটের দু'পাশে। নিজের রাইফেল তুলে পাল্টা গুলি চালাল বাইরে দাঁড়ানো এসকর্ট। চেঁচাল, 'মুভ, গড ড্যাম ইট! মুভ!!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিল ড্রাইভার, তবে জোরে ছুটল না। সঙ্গীকে তুলে নেবার ইচ্ছে।

আরেকবার গুলি করল প্রথম এসকর্ট। তারপর উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল ধাবমান বাহনের পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো লেজার পয়েন্টার জ্যান্ত হয়ে উঠল। এরপর ছুটে এল বুলেটের অঝোর ধারা। দৌড়ের মধ্যেই হুমড়ি খেলো এসকর্ট, মুখ থুবড়ে পড়ল বরফের উপর। পায়ের নীচটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'ফার্নান্দেজ!' সঙ্গীর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল দ্বিতীয় এসকর্ট। এক লাফে নেমে গেল স্নোক্যাট থেকে। দৌড়ে আহত মানুষটার কাছে গেল ও, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে শুরু করল বাহনের দিকে।

ব্রেক কষল ড্রাইভার। হামাগুড়ি দিয়ে পিছনের সিটে চলে গেল অ্যাবি। কয়েক মুহূর্ত পর সাহায্য করল ফার্নান্দেজকে ভিতরে ওঠাতে।

'আগে বাড়ো!' ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচাল ফার্নান্দেজ। 'এখানে বসে থাকলে খতম হয়ে যাব।' উরুতে গুলি লেগেছে তার। হাবভাবে মনে হলো, ভয় বা ব্যথার চাইতে ক্রোধই বেশি

অনুভব করছে সে।

গিয়ার পাল্টে ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ড্রাইভার। বিশ্রী আওয়াজ তুলে মরিয়ার মত ছুটল স্নোক্যাট। অ্যাবি তখন ফার্নান্দেজের পায়ে রুমাল বাঁধায় ব্যস্ত।

সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রিচার্ড। রানাদের স্নোক্যাট অদৃশ্য হয়ে গেছে কুয়াশার আড়ালে। নিজেরাও যদি পারতেন! ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল বাতাসে শিস কাটার আওয়াজ। মাথার উপর দিয়ে উড়ে কী যেন একটা আছড়ে পড়ল সামনের বরফে।

'যাশ্‌শালা!' গাল দিয়ে উঠল ড্রাইভার।

পরক্ষণেই ঘটল বিস্ফোরণ। আকাশের পানে লাফ দিল সামনের বরফ, শকওয়েভের ধাক্কায় চৌচির হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ড। কানে তালা লেগে গেল আরোহীদের। সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইন্সটিঙ্কটের বশে একদিকে স্নোক্যাটকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল ড্রাইভার। ভারী বাহনটার একদিক উঁচু হয়ে গেল, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে।

মাথা ঝনঝন করছে অ্যাবির, একটু উঁচু হয়ে চেষ্টা করল কী ঘটছে সেটা দেখতে। বরফের ধারা আর ধোঁয়ার ফাঁকফোকর দিয়ে চোখে পড়ল বিশাল এক গর্ত, বিস্ফোরকের ধাক্কায় সৃষ্টি হয়েছে, ভিতরে টলটল করছে আর্কটিকের হিম-শীতল পানি। গর্তটাকে এড়াবার জন্য যুঝছে ড্রাইভার।

খুব একটা লাভ হলো না। গর্তের কিনারায় ঠিকমত কামড় বসাতে পারছে না ট্র্যাক, পিছল খেয়ে বাহনটা নেমে যাচ্ছে নীচে। বানের মত খিস্তিখেউড় বেরুল ড্রাইভারের মুখ দিয়ে, গিয়ার বদলে সর্বোচ্চ শক্তি বের করে নিতে চাইল ইঞ্জিন থেকে। চোখ বন্ধ করে ফেলল অ্যাবি, অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে, কিছুতেই আর বাঁচা সম্ভব নয়। অন্যদেরও কমবেশি একই অবস্থা।

হঠাৎ ঝাঁপ দিল স্নোক্যাট, ঠিক যেভাবে আহত সিংহ ঝাঁপ দেয়... উঠে এল কয়েক ফুট। কীভাবে যেন গর্তের কিনারায় আটকে গেছে চাকার ট্র্যাক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে আসতে শুরু করল মৃত্যুকূপ থেকে। উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল পিছনের সিটের দুই নৌ-সদস্য।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। সবে সোজা হতে শুরু করেছে স্নোক্যাট, এমন সময় নীচ থেকে ভেসে এল মড়মড় আওয়াজ। ভারী বাহনটার ওজনে আর্তনাদ করছে গর্তের কিনারের ঠুনকো বরফ। ঝট্ করে ডোর-হ্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াল অ্যাবি, চেষ্টা করবে দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবার... পারল না।

আচমকা অবলম্বন হারাল স্নোক্যাট, বরফধসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল নীচে। ঝপাস করে আছড়ে পড়ল মৃত্যুশীতল পানিতে।

বাইশ

পোলার সেন্টিনেলের কন্ট্রোল ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গরডন। আশপাশে ভিড় জমিয়েছে ক্রু-রা। সবার চোখ চুম্বকের মত সেঁটে আছে সামনের মনিটর আর ইকুইপমেন্টে। বাইরের একটা ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে আসছে ফিড, দেখা যাচ্ছে আধমাইল দূরে মাথা জাগানো রাশান সাবমেরিন ড্রাকনকে। শুভ্র পটভূমিতে আবছাভাবে ফুটে উঠেছে ওটার আকৃতি। হাবভাবে

মনে হচ্ছে না পোলার সেন্টিনেলের অস্তিত্বের ব্যাপারে ওরা সচেতন।

'ক্যাপ্টেন!' ফায়ার কন্ট্রোল স্টেশন থেকে ফিসফিসিয়ে ডাকল কমাণ্ডার ফিশার। কানে একজোড়া হেডফোন লাগিয়ে রেখেছে সে। 'হাইড্রোফোনে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছি আমরা।'

'ড্যাম ইট!' সখেদে বললেন ক্যাপ্টেন।

তাঁর দিকে ফিরল ফিশার। 'আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি আমরা, ক্যাপ্টেন।'

ঠোঁট কামড়ালেন গরডন। করণীয় সম্পর্কে ভাবছেন। সোনার কণ্ট্যাক্ট পাবার পর থেকে রাশান ডুবোজাহাজটাকে অনুসরণ করছেন তাঁরা—নিঃশব্দে এবং দ্রুতগতিতে। যুদ্ধাস্ত্র নেই সেন্টিনেলে, তাই ড্রাকনকে বাধা না দেয়াই উত্তম বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। সারফেসে না ভেসে ওমেগা স্টেশনকেও সতর্ক করে দেয়া সম্ভব ছিল না। অগত্যা ছায়ার মত পিছে লেগে থেকেছেন ড্রাকনের... চেষ্টা করেছেন ওটার সেন্সরগুলোকে এড়িয়ে যেতে। এখন কী করবেন?

'রকেট ফায়ারিং ডিটেক্ট করছি আমি, ক্যাপ্টেন!' হঠাৎ বলে উঠল সোনার সুপারভাইজর।

স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরালেন ক্যাপ্টেন। সাদা একটা রেখা ফুটে উঠেছে আকাশে। বক্রাকার একটা পথে স্টেশনে এসে পৌঁছুল ক্ষেপণাস্ত্র, আঘাত হানল ছোট একটা কুটিরের গায়ে। হাইড্রোফোনের দরকার হলো না, খালি কানেই শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। তারপর নেমে এল নীরবতা।

'সম্ভবত স্যাটেলাইট অ্যারে-তে হিট করেছে ওটা,' ফিসফিস করল ফিশার।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। ড্রিফট স্টেশনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছে রাশানরা। স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার আর

রিসিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাইরের দুনিয়া থেকে ওমেগা স্টেশন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখন যদি পোলার সেন্টিনেলেরও কিছু হয়, সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

'কী করব আমরা, ক্যাপ্টেন?' অস্থির গলায় জানতে চাইল ফিশার।

'আপাতত কিছুই করার নেই আমাদের, রি-ইনফোর্সমেন্ট দরকার। কিন্তু এখানে কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা উঁচু করলে টের পেয়ে যাবে শত্রুরা।' কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন গরডন। তারপর বললেন, 'কমাণ্ডার, জাহাজের মুখ ঘোরাও। রাশান স্টেশনটায় নিয়ে চলো আমাদের। ওখান থেকে ব্রডকাস্ট করব আমরা। সিভিলিয়ানদেরকেও তুলে নেব জাহাজে। সন্দেহ নেই, ওমেগা স্টেশন দখলের পর ওদিকেই যাবে ড্রাকন।'

'আই, আই, স্যর।'

নিচু গলায় অর্ডার ইস্যু করল ফিশার। নিঃশব্দে পানিতে ডুব দিল সেন্টিনেল। হেলমসম্যান আর প্লেইনসম্যান মিলে নাক ঘোরাল ডুবোজাহাজের। ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজের সঙ্গে সচল হলো সাবমেরিন। দ্রুত সরতে শুরু করল ড্রাকনের নাগাল থেকে।

হাইড্রোফোনে এখনও ভেসে আসছে উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ আর বিস্ফোরণের আওয়াজ। শব্দের সেই জঞ্জালের ভিতর হারিয়ে গেল সেন্টিনেলের আওয়াজ, সহজ হলো পিঠটান দেয়া। অবশ্য বাইরের আওয়াজ না থাকলেও খুব একটা অসুবিধে হতো না। নতুন প্রোপালশান সিস্টেম, এবং খোলের গায়ে সোনার-ওয়েভ গিলে খাবার মত প্রলেপ থাকার ফলে প্রচলিত যে-কোনও ডিটেকশন সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে পারে সেন্টিনেল।

'বত্রিশ মিনিটের মধ্যে রাশান স্টেশনে পৌঁছুব আমরা,' ডাইভিং স্টেশন থেকে রিপোর্ট দিল কমাণ্ডার ফিশার।

'খুব ভাল,' বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। চোখ

বোলালেন ব্রিজ ক্রু-দের উপর। হতাশা বাসা বেঁধেছে সবার চেহারায়... সেইসঙ্গে চাপা ক্ষোভ। লড়াই থেকে পালিয়ে আসার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু এ-ও ঠিক, জয়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না তাঁদের। ঢাল-তলোয়ার ছাড়া রণক্ষেত্রে নামা হতো বোকামি। তারচেয়ে রাশান স্টেশন থেকে যে-ক'জনকে উদ্ধার করা যায়, তা-ই ভাল।

হঠাৎ শ্যারনের কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের। গতকাল গ্রেণ্ডেলে গেছে সে—দু'দল বিজ্ঞানীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য। এর মধ্যে কি ফিরেছে ওমেগায়? নাকি এখনও রয়ে গেছে ওখানে? মেয়েটার অমঙ্গল আশঙ্কায় শুকিয়ে গেল বুক। শ্যারনের কিছু হয়ে গেলে কী জবাব দেবেন তিনি অ্যাডমিরাল বেকেটের কাছে?

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল কমাণ্ডার ফিশার। নিচু গলায় বলল, 'ওমেগা স্টেশন দখল করতে খুব বেশি সময় লাগবে না রাশানদের। ওদেরকে বাধা দেবার মত তো কেউই নেই ওখানে! এর অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, স্যর? খুব শীঘ্রি আমাদের পিছু পিছু ধেয়ে আসবে ওরা।'

তিক্ততায় ভরে গেল ক্যাপ্টেনের মন। তাঁর এক্স.ও. ঠিকই বলেছে। খুব বেশি সময় পাবেন না তিনি ইভ্যাকুয়েশনের জন্য। হতাশা চাপা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'একটা কুইক রেসপন্স টিম রেডি করো, ফিশার। তুমিই নেতৃত্ব দেবে ওটার। সমস্ত গিয়ার নিয়ে তৈরি থাকা চাই। সারফেস হবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে তোমরা।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। ইভ্যাকুয়েশনের জন্য কতটা সময় পাব, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

দ্রুত হিসাব কষলেন গরডন। মাথায় রাখলেন দুই জাহাজের স্পিড আর অন্যান্য বিষয়। আর যা-ই হোক, ড্রাকনের সামনে

পড়ার ঝুঁকি নেয়া চলবে না তাঁর। বললেন, 'পনেরো মিনিট। পনেরো মিনিটের মধ্যে আবারও ডাইভ দিতে চাই আমি।'

'পনেরো মিনিট! বড্ড কম হয়ে গেল না?'

'কম-বেশি বুঝি না। দরকার হলে ঘাড় ধরে ন্যাংটো অবস্থায় বের করে আনো সবাইকে... আমি পরোয়া করি না। কাপড়-চোপড়, ইকুইপমেন্ট, সাপ্লাই... কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই, শুধু মানুষগুলোকে চাই আমি।'

'যেমনটা আপনার ইচ্ছে।' স্যালিউট ঠুকে চলে গেল ফিশার।

আপন চিন্তায় আবার ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন গরডন। শ্যারনের কথা ভাবছেন। কোথায় ও? কী করছে এখন?

স্নেক পিটের গভীরতম অংশে ড. বেনটনকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে শ্যারন। ওমেগা স্টেশনে উদয় হওয়া চার আগন্তুককে গ্রেণ্ডেলে নিয়ে আসার নির্দেশ দেবার পর কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল ও। যদিও জানে, সরাসরি কোনও আদেশের বিরোধিতা করেনি... তারপরেও কাজটা হয়েছে এক ধরনের নীরব বিদ্রোহের মত। চার নম্বর লেভেলের রহস্য লুকিয়ে রাখার জন্যই চলছে হাজার রকমের কড়াকড়ি, অথচ ওখানেই ও নিয়ে আসছে চারজন অজানা-অচেনা মানুষকে। বুঝতে পেরেছে, ওর আচরণে অসন্তুষ্ট হবেন ক্যাপ্টেন গরডন। শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ, ঠিক ওর বাবার মত—নিয়ম-কানুনের ব্যত্যয় একেবারেই পছন্দ করেন না। কিন্তু নিজের নীতির প্রতিও অবিচল থাকতে চায় শ্যারন। চায় এখানকার সব ঘটনার নিরপেক্ষ কিছু সাক্ষী থাকুক। সেজন্যেই ঝুঁকিটা নিতে পিছপা হয়নি।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। চুপচাপ বসে থাকার মত মনের অবস্থা ছিল না। ঠিক করেছে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত রাখবে নিজেকে, চলে এসেছে স্নেক পিটে। দেখা যাক,

মেগান গুডকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না। কপাল ভাল, টানেলে ঢুকতেই দেখা পেয়ে গেছে ড. বেনটনের। জুতোর সঙ্গে ক্র্যাম্পন আটকাচ্ছিল সে, রওনা হবার প্রস্তুতি। আর কেউ ছিল না সঙ্গে। শ্যারনের পরামর্শ উপেক্ষা করেছে লোকটা, একাই বেরুচ্ছিল উদ্ধার অভিযানে।

'সবাই ব্যস্ত,' অজুহাতের সুরে বলেছে সে। 'তা ছাড়া... ওয়াকি-টকি আছে আমার সঙ্গে।'

বলা বাহুল্য, তাকে একা ছাড়েনি শ্যারন। থারমাল রেসিং সুট পরাই ছিল, শুধু একজোড়া ক্র্যাম্পন লাগিয়ে নিতে হয়েছে জুতোর নীচে। এরপর একসঙ্গে রওনা হয়েছে দু'জনে।

শ্যারনের সামনে হাঁটছে বেনটন। মাথায় একটা মাইনিং হেলমেট পরেছে, পার হবার আগে হেডল্যাম্পের আলোয় দেখে নিচ্ছে প্রতিটা শাখা-টানেল আর গুহামুখ। খানিক পর পর মুখের কাছে তুলছে দু'হাত। ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না, তারপরেও শ্যারন বুঝতে পারছে, মেগানের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে সে।

উত্তেজিত না হয়ে শান্ত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে শ্যারন। দু'জনের মধ্যে অন্তত একজনকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বেনটনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ক্ষণে ক্ষণে উৎকণ্ঠা বাড়ছে তার। তাই শান্ত থাকার ভূমিকাটা নিতে হচ্ছে শ্যারনকে। হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে ওর, কাঁধে ঝুলছে দড়ির গোছা। আলো ফেলে বার বার দেখে নিচ্ছে আশপাশ, ফেরার পথে যাতে পথ ভুল না করে। স্নেক পিটের অচেনা একটা অংশে এসে পড়েছে ওরা—এদিকটার ম্যাপিং করা হয়নি এখনও। চারপাশটা গোলকধাঁধার মত। যেদিকে তাকায় সেদিকেই নজরে পড়ে গুহামুখ, ছোট-বড় টানেল আর দেয়ালের গায়ে নানা আকারের ফাটল।

বরফের গায়ে স্প্রে-পেইণ্টে আঁকা একটা তীরচিহ্ন স্পর্শ করল বেনটন। ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে শ্যারন—ওগুলো

মেগানের আঁকা। তীরচিহ্ন দিয়ে নিজের স্কেটিঙের কোর্স ঠিক করেছে সে। অবশ্য মেয়েটাকে খোঁজার জন্য ওই তীরচিহ্নের প্রয়োজন নেই। টানেলের মেঝেতে স্পষ্টভাবে ফুটে আছে ওর স্কেটসের গভীর দাগ। এই দাগ অনুসরণ করেই তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা।

ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে দু'জনে, একই সঙ্গে চলছে ডাকাডাকি। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না মেগানের। বিশ মিনিট হলো ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা। হঠাৎ মেঝের দাগে একটু বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল শ্যারন।

'জেফরি?' ডেকে উঠল ও।

ঘুরল বেনটন। 'কী হয়েছে?'

মেঝের দিকে ইশারা করল শ্যারন। 'এখান থেকে কোর্স ছেড়েছে মেগান।' আঙুল তুলল ডানদিকে। 'ওদিকে গেছে।'

দেয়ালের মাঝে চওড়া একটা ফাটল দেখতে পেল ওরা, ওটার ভিতরে ঢুকে গেছে স্কেটসের দাগ। অনুসরণ করল দু'জনে। এদিককার মেঝে অত্যন্ত পিচ্ছিল, ক্র্যাম্পন বিঁধিয়ে হাঁটতেও রীতিমত কসরত করতে হলো। কিছুদূর এগোতেই সংকীর্ণ হয়ে উঠল টানেল, ছাত আর দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা বরফ-গজালের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই মুশকিল। কিন্তু থামেনি মেগান... ট্র্যাক বলছে—এর মাঝ দিয়েই এগিয়েছে ও। কারণ কী!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেনটন। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল। যেন কিছু দেখার চেষ্টা করছে। শ্যারন প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল।

'কীসের যেন আওয়াজ শুনলাম পিছন থেকে,' বলল বেনটন।

'মেগান?'

'উঁহুঁ। মানুষের গলা না। অন্য কিছু।'

আঁতিপাঁতি করে ফেলে আসা পথের উপর দৃষ্টি বোলাল বেনটন। খাড়া রাখল কান। কিন্তু না, দেখা গেল না কিছু... শোনাও গেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার সামনে পা বাড়াল সে।

একটু পরেই একটা খাদের কিনারে পৌঁছে গেল দু'জনে। ওখানে পৌঁছে থামল বেনটন। হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর আলো ফেলল ভিতরে। পরমুহূর্তে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার। তাড়াতাড়ি শ্যারনও উঁকি দিল নীচে।

কালচে হয়ে আসা রক্তের পোঁচ দেখা যাচ্ছে খাদের তলায়। একপাটি স্কেটস্ পড়ে আছে তার পাশে... আর পড়ে আছে একটা মাইনিং হেলমেট—হেডল্যাম্প ভাঙা।

'ও...ওগুলো মেগানের!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল বেনটন।

নীচে মেয়েটার দেহ দেখা যাচ্ছে না, তবে রক্তের দাগটা চলে গেছে একপাশে... ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে।

'ওখানে নামতে হবে আমাকে!' হড়বড় করে বলল বেনটন। 'নীচ দিয়ে হয়তো বেরুবার অন্য কোনও পথ আছে... মেগান হয়তো ওখান দিয়ে গেছে...'

তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবার খাদের তলায় তাকাল শ্যারন। জমাট রক্তের পরিমাণ দেখে আশাবাদী হতে পারছে না; তাই বলে মনে আঘাত দেয়া যায় না বেনটনের। কাঁধ থেকে দড়ির কুণ্ডলী খুলল ও। বেনটনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমিই বরং নামি। ওজন কম আমার। আপনি সাপোর্ট দিতে পারবেন। আপনার বেলায় সেটা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল বেনটন, কিন্তু শ্যারনের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারল না। মিনমিন করে বলল, 'ঠিক আছে।'

হাত বাড়িয়ে দড়ি নিল সে। একটা লুপ বানিয়ে বগলের তলায় আটকে ফেলল। দড়ির অন্যপ্রান্ত খাদের ভিতরে ফেলে দিল শ্যারন। বেনটনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

রেডি?'

'হ্যাঁ। জলদি যান। খুঁজে বের করুন মেগানকে।' অস্থিরতা ফুটল বেনটনের গলায়।

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। ফ্ল্যাশলাইট গুঁজল পকেটে, তারপর দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। খাদের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে র‍্যাপলিং করে নামছে। একটু পরেই পা ঠেকল তলায়। দড়ি ছেড়ে চেঁচাল, 'পৌঁছে গেছি!'

পায়ের আওয়াজ হলো, খাদের কিনারায় এসে উঁকি দিল বেনটন। দড়ির বাঁধন খোলেনি। কী যেন বলল শ্যারনকে উদ্দেশ করে, কিন্তু চোখের উপর তার হেডল্যাম্পের আলো পড়ায় ঠোঁটের নড়াচড়া বুঝতে পারল না ও। হাত নাড়ল কেবল।

পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল শ্যারন। মেঝেতে আলো ফেলতে শুরু করেছে, এমন সময় টের পেল—উৎকট একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে—বদ্ধ গুহা, বা সুড়ঙ্গে যে-রকম ভাসে। গুমোট, ভারী, দম আটকে আসা। জোরে জোরে শ্বাস টানল ও, চেষ্টা করল বাড়তি অক্সিজেন পেতে। খুব একটা লাভ হলো না। গন্ধ ভুলে মনোযোগ দিল হাতের কাজে।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে এগোল ও। কিছুদূর গিয়েই ওটা মিশে গেছে দেয়ালের গায়ে। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল শ্যারন। না, মেশেনি দাগ। বড়সড় একটা খোঁড়লের মত দেখা যাচ্ছে, ওটার ভিতরে গেছে রক্তটা। আলো ফেলে ভালমত দেখল। না, খোঁড়লও নয়। ছোট একটা সুড়ঙ্গ—ঢালু, নেমে গেছে নীচে। দেখতে অনেকটা সুয়ারেজের ড্রেনের মত।

মুখের কাছে হাত তুলল শ্যারন। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মেগান! আছ তুমি ওখানে?'

জবাব এসেছে কি না বোঝার উপায় নেই, কানে শোনে না ও। উপরদিকে মুখ তুলে তাকাল। মেগান যদি জবাব দেয়,

বেনটন শুনতে পাবে। কিন্তু লোকটাকে অন্যদিকে মনোযোগী মনে হলো। খাদের তলায় আর তাকিয়ে নেই, মাথা ঘুরিয়ে রেখেছে পিছনদিকে... দেখতে চাইছে কী যেন।

কয়েক পা এগোল শ্যারন, পরক্ষণে থেমে গেল। কী যেন বাড়ি খেয়েছে জুতোর সঙ্গে। আলো ঘোরাল মেঝের দিকে। মেগানের জুতোটা দেখতে পেল, ওর পায়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেছে দেয়ালের দিকে। দু'পাক খেয়ে থামল। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল শ্যারন।

খালি নয় জুতোটা। তাজা মাংস আর হাড্ডি বেরিয়ে আছে উপর দিয়ে! ভিতরে রয়ে গেছে গোড়ালি-সহ মেগানের পায়ের নীচের অংশ!

আতঙ্কে চিৎকার করল শ্যারন। কোনও আওয়াজ বেরুল না মুখ দিয়ে। অথবা হয়তো বেরুল, কিন্তু নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই ওর। সভয়ে পিছিয়ে গেল, পিঠ ঠেকাল উল্টোদিকের দেয়ালে। তাড়াতাড়ি আবার উপরে তাকাল, কিন্তু কেউ নেই ওখানে।

'জেফরি!' ডাকল শ্যারন।

সাড়া দিল না জিয়োলজিস্ট। তার হেডল্যাম্পের আলো দেখতে পাচ্ছে ও—নেচে বেড়াচ্ছে টানেলের দেয়াল আর ছাতের গায়ে। একই সঙ্গে নাচছে খাদের ভিতরে ঝুলতে থাকা দড়িটাও। করছে কী লোকটা!

'জেফরি!!' আবার ডাকল শ্যারন। এবার আগের চেয়ে জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আলোর নাচ, টানেলের ছাতে স্থির হলো ওটা। স্থির হয়ে গেল দড়িটাও। কিন্তু খাদের কিনারায় উঁকি দিল না বেনটন। বুকের ভিতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকল শ্যারনের। গলার ভিতরে দলা পাকিয়ে উঠেছে কী যেন। দুই

চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইল উপর দিকে।

হঠাৎ একটা ছায়া সরে গেল বেনটনের হেডল্যাম্পের সামনে দিয়ে। বিশাল... কুঁজো একটা আকৃতি...

ফ্ল্যাশলাইটটা অস্ত্রের মত দু'হাতে বাগিয়ে ধরল শ্যারন। কিন্তু প্রবল আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে পুরো দেহ। ফ্ল্যাশলাইটটা ভীষণভাবে নড়তে থাকল হাতের ভিতরে।

আবারও দেখা গেল ছায়াটা। ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে... তারমানে এগিয়ে আসছে খাদের দিকে। সমস্ত সাহস উবে গেল শ্যারনের। পাশ ফিরে ছুটতে শুরু করল ও। খোঁড়লের কাছে গিয়ে ডাইভ দিল। ঢুকে পড়ল ভিতরে। হামাগুড়ি দিচ্ছে পাগলের মত। একটাই চিন্তা মাথায়—পালাতে হবে... পালাতে হবে ওকে!

কিছুদূর যেতে হাত-পা ফসকাল, ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে পিছলে নামতে শুরু করল ও। গতি বাড়ছে প্রতিমুহূর্তে। চেষ্টা করেও থামাতে পারল না নিজেকে। কতক্ষণ ওভাবে কাটল বলতে পারবে না, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল দেহটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, আবার সমান্তরাল হয়ে এসেছে সুড়ঙ্গ। কয়েক গজ দূরে ওটার অন্যপ্রান্তের মুখ।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল শ্যারন। বরফের গভীরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠে এসে পৌঁছেছে। ছাত বেশি উঁচু নয়। দাঁড়াতে গেলে মাথা বাড়ি খাবে উপরে। দাঁড়াল না ও। ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল চারদিকে। পরিণত হলো পাথরে।

এ কোথায় এসেছে ও!

ছোট্ট প্রকোষ্ঠের পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অগণিত হাড়। কিছু ধবধবে সাদা, কিছু আবার কালচে হয়ে এসেছে কালের প্রবাহে। বীভৎসভাবে পড়ে আছে মানুষ আর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মাথার খুলি, বুকের খাঁচা, আর হাত-পায়ের হাড্ডি! চকচক করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

একটাই অর্থ হতে পারে এর। মাংসাশী, হিংস্র কোনও পশুর গুহা এটা!

প্রকোষ্ঠের এককোণে লাল-নীল রঙ চোখে পড়ল শ্যারনের। আলোটা ওখানে ফেলতেই দৃশ্যমান হলো দলা পাকানো তাজা একটা দেহ—রক্তে ভিজে একাকার, পরনে স্কিন সুট।

ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন। পেয়েছে ও মেগানকে।

তেইশ

স্নোক্যাটের পিছনের সিটে দুই এসকর্টের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে রানা। 'মুখ ঘোরান স্নোক্যাটের!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

কনুইয়ের এক গুঁতো খেল ও নাকের উপর। চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল তারা। জোর গুঁতো খেয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখমণ্ডল, সিটের উপর নেতিয়ে পড়ল ও।

'চুপচাপ বসে থাকুন, নইলে আপনাকে হ্যাণ্ডকাফ পরাতে বাধ্য হব আমরা,' ডানপাশ থেকে হুমকির সুরে বলল লেফটেন্যান্ট মাইকেল গ্রিন—প্রথম এসকর্ট।

দ্বিতীয় এসকর্ট বসে আছে রানার অন্যপাশে। গাঁটাগোট্টা শরীরের এক নাবিক, নাম ডেভ পার্ল... ইতিমধ্যে পিস্তল বের করে ফেলেছে সে হোলস্টার থেকে। অস্ত্রটার মুখ স্নোক্যাটের ছাতের দিকে তোলা, তাই বলে হুমকিটা দুর্বল হলো না একটুও।

'শান্ত হোন, মি. রানা,' সামনের সিটে থেকে বলল ম্যাসন।

'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই কোনও।'

'কীভাবে শান্ত থাকব, বলতে পারেন?' রাগী গলায় বলল রানা। 'পিছনের ওরা বিপদে পড়েছে... সাহায্য দরকার ওদের!'

'কিচ্ছু করার নেই,' বলল গ্রিন। 'আমরা অন্যরকম অর্ডার পেয়েছি।'

কয়েক মিনিট আগে রেডিওতে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে লেঃ কমাণ্ডার রাইট। ওমেগা স্টেশনে আক্রমণের খবর জানিয়েছে, তারপর নির্দেশ দিয়েছে—যেভাবে হোক, রাশান বেইসে পৌঁছে সতর্ক করে দিতে হবে সবাইকে। স্যাটেলাইট অ্যারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ড. শ্যারন বেকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

মেসেজ শেষ করতে পারেনি রাইট, অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণের আওয়াজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ। দূরে চলতে থাকা গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে স্নোক্যাটের আরোহীরা, অ্যাবি আর রিচার্ডের জন্য সেজন্যেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। পিছনে দেখা যাচ্ছে না কোনও কিছু, কুয়াশা আর তীব্র বাতাসে উড়তে থাকা তুষারের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে প্রকৃতি। চেষ্টা করেও রেডিওতে পাওয়া যায়নি দ্বিতীয় স্নোক্যাটটাকে। উল্টো ঘুরে খোঁজ নিতে চাইছিল রানা, কিন্তু গ্রিন রাজি হয়নি। অগত্যা গায়ের জোরে বাহনের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছিল ও।

মাথা ঝনঝন করছে রানার। মুখের ভিতর রক্তের স্বাদ পাচ্ছে। বড় একটা ঢোঁক গিলে বলল, 'আরেকবার ডেকে দেখুন ওদেরকে। প্লিজ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিওর মাউথপিস মুখের কাছে তুলল ওদের ড্রাইভার। 'ক্যাট টু... দিস ইজ ক্যাট ওয়ান। রেসপণ্ড প্লিজ। ওভার।'

নিরুত্তর রইল স্পিকার।

'হতে পারে ব্যাপারটা স্রেফ কমিউনিকেশন ফেইলিওর,' কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'ওরা যে বিপদে পড়েছে, এমন কোনও প্রমাণ পাইনি আমরা।'

তার কথা বিশ্বাস করল না রানা। প্রমাণের দরকার নেই, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানাচ্ছে—বিপদে পড়েছে অ্যাবি আর রিচার্ড। অথচ সাহায্য করবার উপায় নেই। প্রকট হয়ে উঠল নিজের অসহায়ত্ব। অন্তত দু'মাইল এগিয়ে গেছে ওরা। এখন যদি উল্টো ঘোরেও, প্রতিপক্ষের আগে পৌঁছুতে পারবে না সঙ্গীদের কাছে।

'সাহস রাখুন, মি. রানা,' নরম সুরে বলল ম্যাসন। 'কিচ্ছু হবে না ওঁদের।'

আশ্বাসে কাজ হলো না। কিন্তু রানা নিরুপায়। মূর্তির মত বসে রইল ও। তুষারের পর্দা ভেদ করে এগিয়ে চলল ওদের স্নোক্যাট।

চেসিসের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়েছিল অ্যাবি, জ্ঞান ফিরল ঠাণ্ডা পানির কনকনে স্পর্শে। ইন্সটিঙ্কটের বশে হাত-পা ছুঁড়ল, মাথা তুলল পানির উপর। দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে।

উল্টে গেছে স্নোক্যাট। কেবিনের অর্ধেকটা ভরে গেছে পানিতে, বাড়ছে দ্রুত। ইঞ্জিন এখনও গর্জন করছে, তার কারণে কাঁপছে বাহনটা। ছাতের লাইট জ্বলছে পানির নীচে, ম্লান আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কেবিনের অভ্যন্তরে।

ভুস করে পাশে ভেসে উঠল একটা মাথা। রিচার্ড ম্যানিটক। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন।

'বাবা!' ডেকে উঠল অ্যাবি। এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

'আ... আমি ঠিক আছি,' বললেন রিচার্ড। 'কাঁধে শুধু একটু ব্যথা পেয়েছি। বাকিদের কী অবস্থা?'

ড্রাইভারের দিকে তাকাল অ্যাবি। নিস্পন্দভাবে পানিতে ভাসছে সে। মাথাটা হেলে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে—নিশ্চয়ই ঘাড় ভেঙে গেছে। দুই এসকর্ট অবশ্য ঠিক আছে। টানা-হেঁচড়া করছে দরজার হাতল নিয়ে।

দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকাল ফার্নান্দেজ, ধাক্কা দিল কয়েকবার। কিন্তু অনড় রইল পাল্লা। 'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল সে, পিছিয়ে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে অবিরাম, লাল হয়ে যাচ্ছে পানি। 'জানালা ভাঙতে হবে আমাদেরকে। দেখো কিছু পাওয়া যায় কি না, পাওয়েল।' সঙ্গীর উদ্দেশে বলল সে।

এগিয়ে গেল অ্যাবি। 'পেয়েছি!' বলে হাত বাড়িয়ে দিল। পাওয়েল নামের দ্বিতীয় এসকর্টের হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল। 'সরে দাঁড়ান আপনারা।'

ঘুরে উইণ্ডশিল্ডের দিকে পিস্তল তাক করল ও। টিপে দিল ট্রিগার। বদ্ধ জায়গায় কানে তালা লাগার মত আওয়াজ হলো, পরক্ষণে শোনা গেল কাঁচ ভাঙার শব্দ। প্রবল বেগে আর্কটিকের স্রোত ঢুকতে শুরু করল কেবিনের ভিতর।

'হ্যাঁ, ওতেই চলবে,' বলল ফার্নান্দেজ।

রাগী ভঙ্গিতে অ্যাবির কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিল পাওয়েল।

'ওর আচরণে কিছু মনে করবেন না,' ফার্নান্দেজ বলল। 'ওর জিনিসে অন্য কেউ হাত লাগাক, স্রেফ পছন্দ করে না পাওয়েল।'

'এসব কথাবার্তা পরে বললেও তো চলে, নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল অ্যাবি। 'বেরুতে পারি আমরা?'

'লেডিজ ফার্স্ট।'

তর্কে গেল না অ্যাবি। ডুব দিল পানিতে, হাত-পা ছুঁড়ল, বেরিয়ে এল উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক গলে। এবার ভালমত হামলা চালাল শীতল পানি। খুলির ভিতর যেন হাজারটা সুচ বিঁধতে শুরু করল ওর, প্রতিটা অস্থিসংযোগে কেউ ছুরিকাঘাত করছে একই সঙ্গে। অসাড় হয়ে যাচ্ছে পুরো শরীর। জামাকাপড় ভিজে যেন ভারী হয়ে গেছে কয়েক টন, ওকে টেনে নীচে নিয়ে যাচ্ছে। দুই পা দিয়ে পরস্পরকে খোঁচা মেরে বুটদুটো খুলে ফেলতে সক্ষম হলো অ্যাবি, পতনের গতি কমল খানিকটা। হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল ও, কিছুদূর উঠে তাকাল পিছনদিকে।

ওর পিছু পিছু বাকিরাও বেরিয়ে এসেছে স্নোক্যাট থেকে। ফার্নান্দেজকে সাহায্য করছে পাওয়েল, ওদের ঠিক পিছনে রয়েছেন রিচার্ড। ওরা বেরিয়ে আসতেই আচমকা যেন খসে পড়ল স্নোক্যাট, নেমে যেতে শুরু করল সুনীল সাগরের গভীরে। চকিতের জন্য ড্রাইভারের প্রাণহীন মুখটা দেখতে পেল অ্যাবি, একটু পরে বাহনসহ অদৃশ্য হয়ে গেল দেহটা।

দ্রুত পানির উপরে ভেসে উঠল অ্যাবি, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাকিরাও মাথা তুলল। গর্তের একপাশের ভাঙাচোরা কিনার লক্ষ্য করে এগোল সবাই, এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের খাঁজে হাত-পা বাধিয়ে উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

পানি ছেড়ে একে একে উঠে পড়ল ওরা। প্রথমে পাওয়েল, তারপর ফার্নান্দেজ আর রিচার্ড, সবশেষে অ্যাবি। দলবদ্ধভাবে বাইতে শুরু করল দেয়াল। একে অন্যকে সাহায্য করছে উপরে উঠতে। সামান্য উচ্চতা, কিন্তু সেটাই হয়ে উঠল অসম্ভব একটা কাজ। চোখের পলকে ভেজা কাপড় পরিণত হলো বরফে, ভেজা

চুল জমে সেঁটে গেল খুলির সঙ্গে, তাপ হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইল পেশি।

স্রেফ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উপরদিকে উঠে চলল চারজন। যেন অনন্তকাল পর দেখা পেল বরফের উপরিভাগের। হাঁপাতে হাঁপাতে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। আর চলছে না দেহ।

বাতাসের তোড় বেড়ে গেছে, নিশ্চল দেহগুলোর উপর আছড়ে পড়ছে তুষারকণা। বুঝে গেল অ্যাবি, মরতে চলেছে ওরা। সলিলসমাধির বদলে বেছে নিয়েছে ঠাণ্ডা বরফের কবর। চোখ মুদল ও।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে এলেন রিচার্ড। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। নিজ শরীরকে বর্ম বানিয়ে রক্ষা করতে চাইছেন মেয়েকে। কতকাল পর এভাবে পিতার আলিঙ্গন পেল, বলতে পারবে না অ্যাবি। তবে সেই ছোটবেলার মত অনুভূতিরই সৃষ্টি হলো এবারও। মনে হলো আর কোনও ভয় নেই... এই তো, ওর পাশেই আছে বাবা।

চোখ থেকে পানি বের হয়ে এল অ্যাবির। গালের উপর জমাট বাঁধল অশ্রুধারা। ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, আমি...'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুললেন রিচার্ড। 'কথা বলিস না। শক্তি সঞ্চয় কর্।'

'কীসের জন্য?' বলতে চাইল অ্যাবি। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

চব্বিশ

ইউ.এস.এস পোলার সেন্টিনেল।

'স্কাইলাইট অ্যাহেড!' চড়া গলায় রিপোর্ট দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'চল্লিশ ডিগ্রি পোর্টসাইডে।' এর অর্থ, বরফের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে।

'বাঁচা গেল,' বিড়বিড় করলেন ক্যাপ্টেন গরডন। দ্রুত ঘোরালেন পেরিস্কোপের মুখ। রাশান বেইসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তাঁরা, মাথা তোলার মত পলিনিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাওয়ায় খুব ভাল হলো। সারফেসে প্রতি মুহূর্তে খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। যত দেরি করবেন, ততই বাধাগ্রস্ত হবে তাঁদের রেসকিউ অপারেশন।

স্কোপে বরফের কালচে ছাত দেখলেন ক্যাপ্টেন, পানিও মিশমিশে কালো; তবে যে-দিকটা ইঙ্গিত করেছে চিফ অভ দ্য ওয়াচ, সেখান দিয়ে চোখে পড়ছে এক চিলতে আলো... পানির ওখানে দেখা যাচ্ছে নীলচে আভা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড! ইটস্ আ পলিনিয়া!' তাড়াতাড়ি জারি করলেন নির্দেশ, 'পোর্ট ইঞ্জিন, অ্যাহেড ওয়ান-থার্ড। স্টারবোর্ড ইঞ্জিন, ব্যাক ওয়ান-থার্ড। ডানদিকে ফুল রাডার! হেলমস্ম্যান, ওই স্কাইলাইটের তলায় নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

মৃদু ঝাঁকুনির সঙ্গে সাড়া দিল সেন্টিনেল। ধীরে ধীরে মুখ ঘোরাল। ইঞ্জিনের পাওয়ার একটু বাড়াবার নির্দেশ দিলেন

ক্যাপ্টেন, ডুবোজাহাজকে নিয়ে চললেন পলিনিয়ার দিকে।

'উপরের রিডিং কেমন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ভাল, স্যর,' জবাব দিল চিফ অভ দ্য ওয়াচ। 'পলিনিয়ার সারফেসে তিন থেকে ছ'ইঞ্চি বরফের আস্তর পড়েছে, তবে ওটা আমাদের জন্য কোনও সমস্যা না।'

কপাল ভাল বলতে হবে। স্কোপে পলিনিয়ার আশপাশের বরফ দেখলেন গরডন, ওগুলো অনেক পুরু। হাঙরের দাঁতের মত নেমে এসেছে পানির গভীরে। জলাশয়টা বুজেও যেতে পারত!

'স্কাইলাইটের তলায় পৌঁছেছি আমরা,' একটু পরে ডাইভিং-স্টেশন থেকে রিপোর্ট দিল কমাণ্ডার ফিশার।

'অল স্টপ! রাডার অ্যামিডশিপস্!' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। থেমে গেল সাবমেরিন। পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে নিলেন তিনি। নিশ্চিত হলেন, ভেসে ওঠার সময় কোথাও ঘষা খাবে না সেন্টিনেল। সন্তুষ্ট হয়ে পেরিস্কোপের গ্রিপ ভাঁজ করলেন। হাইড্রোলিক কন্ট্রোল রিঙে চাপ দিয়ে হাউজিঙের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললেন পেরিস্কোপ। 'ওকে, চলো ভেসে ওঠা যাক। এক্স.ও., সাবধানে উপরদিকে ওঠাও আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নতুন নির্দেশ প্রচার করল ফিশার। পাম্প চালু হবার আওয়াজ পাওয়া গেল, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে পানি। মন্থর গতিতে উপরদিকে রওনা হলো ডুবোজাহাজ।

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল ফিশার। বলল, 'রাশানরা আমাদের ব্যালাস্টের আওয়াজ পাবে।'

'কিছুই করার নেই,' শ্রাগ করলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার ইভ্যাকুয়েশন টিম রেডি তো?'

'জী, স্যর। পোশাক পরে অপেক্ষা করছে। আশা করছি দশ মিনিটের মধ্যে বের করে আনতে পারব সবাইকে।'

'কাউকে ফেলে এসো না,' বললেন ক্যাপ্টেন। মনে মনে শ্যারনের কথা ভাবছেন।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যর।' আশ্বাস দিল ফিশার।

'রেডি ফর আইস!' হাঁক ছাড়ল চিফ অভ দ্য ওয়াচ।

পরমুহূর্তে জলাশয়ের জমাট সারফেসে আঘাত হানল সেণ্টিনেলের কোনিং টাওয়ার। ঝাঁকি খেলো পুরো ডুবোজাহাজ, উপরে ওঠার গতিতে সামান্য ছন্দপতন ঘটল, তবে এরপরেই শোনা গেল বরফ ভাঙার শব্দ। পলিনিয়ার মাঝখানে অতিকায় তিমির মত ধীরে ধীরে শরীর জাগাল সেণ্টিনেল।

'সমস্ত হ্যাচ খুলে দাও,' আদেশ দিল ফিশার। 'শোর টিমকে জড়ো হতে বলো হ্যাচের তলায়।' আদেশ শেষ করে সে নিজেও ছুটল।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বাইরের হিমেল হাওয়া ঢুকে পড়ল সাবমেরিনের অভ্যন্তরে। পারকা পরে ফরোয়ার্ড হ্যাচের নীচে ইভ্যাকুয়েশন টিমের সঙ্গে যোগ দিল কমাণ্ডার ফিশার। দ্রুত চেক করে নিল সমস্ত অস্ত্র। দলের সবাই রাইফেল আর সাইড আর্মস বহন করছে। বিপদ দেখা দিলে সঙ্কেত দেবার জন্য নেয়া হয়েছে সিগনাল ফ্লেয়ার।

'ও.কে,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল ফিশার। 'মুভ করো সবাই।'

ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল দলের সদস্যরা। ক্যাপ্টেন গরডন এসেছেন ওদেরকে বিদায় দিতে। ফিশারকে বললেন, 'পনেরো মিনিট, ভুলে যেয়ো না।'

'যথেষ্ট সময়,' শুকনো একটা হাসি ফুটল ফিশারের ঠোঁটে। ক্যাপ্টেনকে স্যালিউট করে ল্যাডারে উঠে গেল সে। সবাই বেরিয়ে যাবার পর বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাচ।

ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। পেরিস্কোপ তুললেন। বুকের ভিতর অনুভব করলেন প্রবল অস্থিরতা। ইভ্যাকুয়েশনের কাজটা

নিজে তদারক করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু জাহাজ ছেড়ে বেরুনো চলবে না তাঁর। পেরিস্কোপে চোখ রেখে বাইরের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন। ছোট্ট স্কোপে বেশি কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই কয়েক মিনিট পরেই নেমে এলেন পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে।

'চিফ, ব্রিজ এখন তোমার দায়িত্বে,' বললেন তিনি। 'আমি সাইক্লপসে যাচ্ছি। শোর টিম যোগাযোগ করলে ওখানকার ইণ্টারকমে মিলিয়ে দিয়ো।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

ব্রিজ ছেড়ে ডুবোজাহাজের নাকের দিকে এগোলেন ক্যাপ্টেন গরডন। আশা করছেন সাইক্লপস্ থেকে ভালমত দেখতে পাবেন বাইরের দৃশ্য। প্যাসেজ ধরে একটু পরেই পৌঁছুলেন ওখানে। ভিতরে কেউ নেই। স্বচ্ছ দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খোলের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে পলিনিয়ার পানি, ছলাৎছল শব্দ তুলছে। তার ওপাশের দুনিয়া অস্পষ্ট। উড়ন্ত তুষার ঢেকে দিয়েছে বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তর। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে আইস স্টেশনে ঢোকার প্রবেশপথ। বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে কমাণ্ডার ফিশারের টিম। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল ওরা।

খড়খড় করে উঠল ইণ্টারকম। শোনা গেল চিফ অভ দ্য ওয়াচের কণ্ঠ। 'ক্যাপ্টেন গরডন, দিস ইজ ব্রিজ।'

ইণ্টারকমের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন ক্যাপ্টেন। 'গো অ্যাহেড, ব্রিজ।'

'স্যর, আমাদের রেডিওম্যান জানাল, ন্যাভস্যাট নাকি কাজ করছে না। সম্ভবত আবারও শুরু হয়েছে সোলার স্টর্ম। আমরা এ-মুহূর্তে কোনও ব্রডকাস্ট করতে পারছি না।'

ঠোঁট কামড়ালেন ক্যাপ্টেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বোধহয়

একেই বলে। ন্যাভস্যাট চালু না হলে রি-এনফোর্সমেন্ট চাইতে পারছেন না ওঁরা। 'কতক্ষণ বন্ধ থাকবে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'বলা মুশকিল, স্যার। রেডিওম্যান বলছে, কপাল ভাল হলে মাঝে মধ্যে ইন্টারফ্যারেন্স কমে যেতে পারে, কিন্তু সেটা কখন বা কতক্ষণের জন্য ঘটবে, তা বোঝার উপায় নেই। ধরে নেয়া ভাল, সন্ধ্যা নামার আগে থামছে না সোলার স্টর্ম।'

'আর কোনও বিকল্প?'

'আপনি বললে ইউএইচএফ দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আয়োনোস্ফিয়ারে বাউন্স করে হয়তো কিছুদূর যাবে আমাদের ট্রান্সমিশন, কিন্তু এই আবহাওয়ায় ওটা কেউ রিসিভ করতে পারবে কি না কে জানে। প্রুডো বে-র সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে ওভাবে।'

'ঠিক আছে, যতক্ষণ আমরা ভেসে আছি, রেডিওম্যানকে চেষ্টা চালাতে বলো। সেইসঙ্গে একটা *স্লট* রেডি করতে বলো ওকে, বরফের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে যাব। সূর্য ডোবার পরে ট্রান্সমিট করবে ওটা।' স্লট, বা এসএলওটি-র অর্থ, সাবমেরিন লঞ্চড্ ওয়ানওয়ে ট্রান্সমিটার। এক ধরনের কমিউকেশন ডিভাইস। মেসেজ রেকর্ড করে রাখা যায়, ট্রান্সমিশনের সময়টা ঠিক করে দেয়া যায় টাইমারে... অনেকটা অ্যালার্ম ঘড়ির মত।

'আই, আই, ক্যাপ্টেন।'

ঘড়ি দেখলেন গরডন। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেছে। সামনে আবার নজর দিলেন তিনি। বেড়ে গেছে তুষারপাত। দূরের প্রেশার রিজগুলোর অবয়ব দেখা যাচ্ছে কোনোমতে, ডিটেইলস বোঝার উপায় নেই। তারপরেও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। আরও এক মিনিট পেরুল। হঠাৎ দেখা গেল ভূতের মত কিছু ছায়ামূর্তি, দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে সেন্টিনেলের

দিকে। উদ্ধারকৃতদের প্রথম গ্রুপ।

হ্যাচ খুলে যাবার শব্দ পেলেন ক্যাপ্টেন। বিজ্ঞানী আর রিসার্চারদেরকে সাবমেরিনে ঢোকাতে শুরু করেছে তাঁর নাবিকেরা। ততক্ষণে আরও মানুষ উদয় হয়েছে প্রথম গ্রুপের পিছু পিছু। কতজন আসছে, গোনার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। তুষারের আড়ালে ঘোলাটে দেখাচ্ছে সবগুলো আকৃতি। কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

আবারও আওয়াজ করল ইন্টারকম। 'ক্যাপ্টেন, দিস ইজ ব্রিজ। কমাণ্ডার ফিশার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

স্ট্যাটিকের খসখসানি চলল কয়েক মুহূর্ত, এরপর শোনা গেল এক্স.ও.-র দুর্বল গলা। 'ক্যাপ্টেন? আমরা বেইসের সবগুলো লেভেল ক্লিয়ার করেছি। বাকি আছে শুধু স্নেক পিট... মানে টানেল নেটওয়ার্ক। বুলহর্ন নিয়ে আমার দু'জন লোক ঢুকেছে ওখানে। যারা ভিতরে আছে, তাদেরকে বের করে আনবে।'

শ্যারনের কথা জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 'ড. বেকেটের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছ?'

'আমাদেরকে বলা হয়েছে উনি এখানেই আছেন। ওমেগায় ফিরে যাননি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গরডন। যাক, শ্যারন তা হলে রাশানদের হামলার মুখে পড়েনি। কিন্তু ফিশারের পরের কথায় স্বস্তিটা উবে গেল।

'...কিন্তু স্যার, ওঁকে অনেকক্ষণ থেকে দেখেনি কেউ। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, একজন জিয়োলজিস্টের সঙ্গে স্নেক পিটে ঢুকেছেন উনি—নিখোঁজ এক রিসার্চারের সন্ধানে।'

'ফিশার, ড. বেকেটকে খুঁজে বের করো। কাউকে ফেলে এসো না।'

'রজার দ্যাট, স্যার।'

ঘড়ি দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন। 'আর সাত মিনিট আছে তোমার হাতে।'

ফিশার জবাব দেবার আগেই ট্রান্সমিশনে নাক গলাল ব্রিজ। চিফ অভ দ্য ওয়াচ বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। গত কয়েক মিনিট থেকে হাইড্রোফোনে গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে। সোনারেও শোনা যাচ্ছে সন্দেহজনক ইকো—এয়ার ভেন্টিং, প্রোপালশনের আওয়াজ, ইত্যাদি। মনে হচ্ছে রাশান সাবমেরিনটা ডাইভ দিচ্ছে, স্যর।'

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। সময় ফুরিয়ে গেছে। আইস স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ড্রাকন। ওটা আসার আগেই গা-ঢাকা দিতে হবে তাঁদেরকে।

'ফিশারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও আবার,' বললেন তিনি।

'ইয়েস, স্যর।'

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার শোনা গেল এক্স.ও.-র গলা। 'ফিশার বলছি।'

'কমাণ্ডার, আমাদের বন্ধুরা রওনা হয়ে গেছে,' বললেন গরডন। 'এক্ষুণি বেরিয়ে এসো ওখান থেকে!'

'কিন্তু আমরা তো এখনও স্নেক পিট খালি করতে পারিনি!'

'ঠিক তিন মিনিট সময় পাচ্ছ। এরপর তোমার চেহারা দেখতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

চোখ মুদে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বেরিয়ে এলেন সাইক্লপস্ থেকে। ফিরে এলেন ব্রিজে। উদ্ধারকৃত বিজ্ঞানীরা ভিড় জমিয়েছে ওখানে, সবার চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না।

ক্যাপ্টেনকে দেখে ভিড় থেকে এগিয়ে এলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি ব্যস্ত, ক্যাপ্টেন।

কিন্তু...'

'কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন, ড. মিকেলসেন। ভূমিকার দরকার নেই।'

'ড. বেকেট... উনি এখনও রয়ে গেছেন স্নেক পিটে।'

'হ্যাঁ... জানি,' আবেগহীন গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। দুশ্চিন্তা অনুভব করছেন, কিন্তু সেটা ফুটতে দিলেন না চেহারায়।

'ওঁকে বের করে আনছেন তো?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করছি।'

উত্তরটায় সন্তুষ্ট হলেন না বৃদ্ধ ওশনোগ্রাফার। শ্যারনকে আপন মেয়ের মত স্নেহ করেন তিনি, ওর জন্য উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে যাচ্ছে বুক।

'ক্যাপ্টেন?' চিফ অভ দ্য ওয়াচ ডাকল। 'কমাণ্ডার ফিশার আবার যোগাযোগ করেছেন।'

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে। ফিশার এখনও ফেরেনি কেন? রেডিওর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। মাউথপিস তুলে রাগী গলায় বললেন, 'ফিশার, ওখানে কী করছ তুমি এখনও?'

'সরি, স্যর। কয়েকজন সিভিলিয়ানের খোঁজ পাইনি এখনও। লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্সকে নিয়ে স্নেক পিটে ঢুকেছি। যদি অনুমতি দেন তো এখানে থেকে যেতে চাই... নিখোঁজ সিভিলিয়ানদের নিরাপত্তার জন্য। ওদেরকে খুঁজে বের করব, তারপর ভাল কোনও জায়গায় গা-ঢাকা দেব বলে ভাবছি। আশা করি ধরা পড়ব না।'

কী বলবেন ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল নাসা থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ার মাইলস্ ফস্টার। ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কমাণ্ডারকে পুরো বেইসের নকশা দিয়ে এসেছি আমি। অ্যাক্সেস টানেল থেকে শুরু

করে পুরনো কনস্ট্রাকশন শাফট পর্যন্ত সবকিছু মার্কিং করা আছে ওতে। লুকানোর জায়গা খুঁজে নিতে পারবেন।'

ঠোঁট কামড়ে একটু চিন্তা করলেন ক্যাপ্টেন, একই সঙ্গে চোখ বোলালেন বিজ্ঞানীদের উপর। সবাই ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, সিদ্ধান্ত জানতে উন্মুখ। তবে চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পিছনে রয়ে যাওয়া সহকর্মীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ওরা, চাইছে তাদের বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা নিন ক্যাপ্টেন।

গলা খাঁকারি দিলেন গরডন। তারপর রেডিওতে বললেন, 'কমাণ্ডার ফিশার, আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দেরি করলে সবাই বিপদে পড়ব।'

'আমি জানি, স্যর,' বলল ফিশার।

'বাকিদের খুঁজে বের করো। নিরাপদে রেখো ওদের। আমরা সময়-সুযোগমত ফিরে আসব তোমাদেরকে তুলে নিতে।'

'রজার, স্যর। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাউথপিস নামিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন ড. মিকেলসেন। বললেন, 'ওদেরকে ফেলে যাবেন আপনি?'

'আর কোনও উপায় নেই।' চিফ অভ দ্য ওয়াচের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। এক শব্দে দিলেন পরের নির্দেশ। 'ডাইভ!'

হাপরের মত ওঠানামা করছে শ্যারনের বুক, গুটিসুটি হয়ে বসে আছে ও অচেনা জানোয়ারের গুহাটাতে। পচা রক্তমাংসের গন্ধে ভারী হয়ে আছে ওখানকার বাতাস। আতঙ্কিত চোখে মেগানের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যারন। দেহ তো নয়, যেন একটা ভাঙাচোরা ম্যানিকিন। বীভৎস। হিংস্র কোনও পশুর নৃশংস আক্রমণের চিহ্ন ফুটে রয়েছে মেয়েটির শরীরে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশটা—দলা পাকানো অবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছে,

হাড়গোড় একটাও আস্ত নেই, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। মুখমণ্ডলও থেঁতলানো। সম্ভবত ওর নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য বরফের উপর বারবার আছাড় মারা হয়েছিল।

মেগানের পেটের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল শ্যারন। হাঁ হয়ে আছে ওখানটা—খেয়ে ফেলা হয়েছে নাড়িভুঁড়ি, লিভার আর কিডনি। পেটের গহ্বরটা এখন শূন্য, রক্তের হালকা ধারা চুইয়ে পড়ছে গুহার মেঝেতে। এমন দৃশ্য বনে-জঙ্গলে দেখেছে শ্যারন। নেকড়ের পাল তাদের শিকারের পেটের অংশ খায় আগে। কিন্তু বরফ-দ্বীপের এত গভীরে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?

না, নেকড়ে নয়। অন্য কোনও মাংসাশী জানোয়ার। মেরু ভালুক? তা-ও বিশ্বাস করতে পারল না। টানেলের কোথাও ভালুকের চিহ্ন দেখেনি বিজ্ঞানীরা। তারমানে অন্য কোনও প্রাণী। কী ওটা?

ডিপআই সোনারে দেখা সেই ঘোলা আকৃতিটার কথা মনে পড়ল শ্যারনের। এখন ও নিশ্চিত, ওটা সোনার ওয়েভের প্রতিবিম্ব ছিল না। সত্যি কোনও প্রাণীকে ডিটেক্ট করেছিল যন্ত্রটা। ওটাও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল সোনার ওয়েভের প্রবাহ, পালিয়ে গিয়েছিল সে-কারণেই। কিন্তু এমন কোন্ প্রাণী আছে, যেটা সোনার ওয়েভ ডিটেক্ট করতে পারে? ভাল করে ভাবল শ্যারন। বাদুড়, ডলফিন... আর তিমি!

মেগানের পেটকাটা লাশের দিকে তাকাল শ্যারন, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দৃশ্য ভেসে উঠল মানসপটে। বরফের তালের উপরে পেটকাটা অবস্থায় পড়ে থাকা আরেকটা প্রাণী। ড. কনওয়ের অ্যাম্বিউলোসিটাস নেটানস্। আধুনিক তিমির পূর্বপুরুষ। ওয়াকিং ওয়েইল... কিংবদন্তির গ্রেণ্ডেল!

চমকে উঠল শ্যারন। এ কি সত্যি হতে পারে? জমাট

স্পেসিমেনের পাশাপাশি একটা জ্যান্ত গ্রেণ্ডেলও কি থাকতে পারে এই বরফ-দ্বীপের ভিতরে? শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল ওর। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য... কিন্তু আর কোনও ব্যাখ্যাও তো নেই। নেকড়ে হতে পারে না... ভালুক হতে পারে না... তা হলে কীসে খুন করল মেগানকে? কে খেয়েছে ওর নাড়িভুঁড়ি?

আচমকা পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শ্যারন। গ্রেণ্ডেল হোক বা অন্য কিছু... হিংস্র একটা জানোয়ারের গুহায় আটকা পড়েছে ও। ঢোকা এবং বেরুনোর রাস্তা একটাই। সবচেয়ে বড় কথা, জানোয়ারটা কোথায়, তা বোঝার কোনও উপায় নেই ওর। ওটা বাইরে ঘুরছে, নাকি এ-মুহূর্তে গুহাতেই ফিরছে, তা জানে না ও। বধির হবার কারণে আগাম সঙ্কেতও পাওয়া সম্ভব নয়। শ্বাস ফেলার আওয়াজ, গর্জন, বা সুড়ঙ্গ ধরে আসার সময় খসখসানি... কোনও কিছুই শুনতে পাবে না।

সুড়ঙ্গের ভিতরটা চকিতে দেখে নিল শ্যারন। শূন্য। ওপাশ থেকে ড. বেনটনের হেডল্যাম্পের আলো আবছাভাবে ঢুকছে সুড়ঙ্গে। বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবে কি না, ভাবল একবার। পরক্ষণে মত পাল্টাল। সুড়ঙ্গের ওপাশে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে জানোয়ারটা।

বিকল্প পথের খোঁজে গুহার দেয়ালে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল শ্যারন। আর কোনও সুড়ঙ্গ নেই, তবে ছোট-বড় হাজারো ফাটল দেখা যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে—প্রেশারের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কোনোটাই খুব একটা বড় নয়। কাজেই ওখানে আশ্রয় পাবার আশা করা বৃথা। বসে থাকতে হবে এখানেই।

আবারও সুড়ঙ্গে উঁকি দিল শ্যারন। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল বুক। বেনটনের হেডল্যাম্পের আলো ঠিকমত ঢুকছে না সুড়ঙ্গে। বিশাল একটা ছায়া গতিরোধ করেছে আলোর। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ছায়াটা।

ঝটপট হাতের ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে ফেলল শ্যারন। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল সুড়ঙ্গের কাছ থেকে। একটু পরেই ওখান দিয়ে মাথা বের করল সাদাটে একটা আকৃতি... গুহায় ঢুকছে। আলোর অভাবে বোঝা যাচ্ছে না কী ওটা।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল শ্যারন। হাত বাড়াতেই দেয়ালের গায়ে একটা ফাটলের অস্তিত্ব অনুভব করল। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ওটায়। সরু ফাটল, ঠিকমত ঢোকা গেল না। কসরত শুরু করল ও। শরীরের অর্ধেকটা ঢোকাতেই দম আটকে এল, চাপ পড়ছে বুকের উপরে। গুঙিয়ে উঠল।

সুড়ঙ্গের মুখে থেমে গেল প্রাণীটা। সন্দিহান হয়ে উঠেছে। দেরি করল না শ্যারন, ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ছুঁড়ে দিল মেগানের লাশের পাশে, যাতে ওদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় জানোয়ারটার। তারপর শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে আবারও ঢুকতে শুরু করল ফাটলের ভিতরে। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। অন্ধকারে কীভাবে দেখে ওটা? বডি হিট? ভাইব্রেশন? নাকি বিড়ালের মত চোখ আছে ওটার?

মাথায় সুটের হুড তুলে দিল শ্যারন। বরফ-দেয়ালের গায়ে হাতের তালু ঘষল, ভেজা হাতে মুছল উন্মুক্ত মুখমণ্ডল। ওর ইনসুলেটেড রেসিং সুট শরীরের উত্তাপকে ঢেকে রাখবে, মুখ ভিজিয়ে চামড়ার তাপও কমিয়েছে। দেখা যাক এতে কাজ হয় কি না। ভাইব্রেশন এড়ানোর জন্য স্থির হয়ে গেল, শ্বাস ফেলল খুব আস্তে। তারপর চোখ ফেরাল সুড়ঙ্গের মুখের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির থাকার পর আবারও ঢুকতে শুরু করেছে প্রাণীটা। ফ্ল্যাশলাইটের আভায় পরিষ্কার দেখা গেল চেহারা। বেলুগা তিমির সঙ্গে মিল আছে—তেমনি ফ্যাকাসে সাদা চামড়া, গোল মাথা, আর লম্বা চোয়াল। লম্বা দেহ, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত অন্তত দশ ফুট দৈর্ঘ্য। আধ টনের কম হবে না ওজন।

তিমির সঙ্গে পার্থক্য হলো, হাত আর পা দেখা যাচ্ছে প্রাণীটার শরীরে।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল শ্যারনের।

ওটা একটা গ্রেণ্ডেল। জ্যান্ত!

হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় ঢুকেছে দানবটা। চোয়াল সামান্য হাঁ হয়ে আছে, ক্ষুরধার দাঁতের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তাজা রক্ত... জেফরি বেনটনের রক্ত! চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো শ্যারনের, পারল না।

ওটাকে নাক টানতে দেখল ও। গন্ধ শুঁকছে, বোধহয় টের পেয়েছে কেউ অনুপ্রবেশ করেছে তার গুহায়। সরীসৃপের মত ঘুরতে শুরু করল ভিতরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করছে মসৃণ চামড়া—পানির তলায় টর্পেডোর মত ছুটতে, কিংবা বরফের টানেলে পিছলে চলার জন্য আদর্শ। কুঁৎকুতে কালো চোখজোড়া কুঁচকে রেখেছে, যেন সহ্য করতে পারছে না আলো।

শ্যারনের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল দানবটা, মনোযোগ আটকে আছে জ্বলতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের দিকে। ওর কয়েক গজ দূরে গিয়ে থামল। উঠে দাঁড়াল আলোর দিকে মুখ করে। টান টান হলো দুই পা, নখ বসে গেল মেঝের বরফে, ঘাড় আর হাতের সংযোগস্থলে উঁচু হলো কাঁধ। দু'পায়ে ভর দিয়েই লেজের ঝাপটা মারল, তার ধাক্কায় এদিক-ওদিক ছিটকে গেল হাড়ের স্তূপ।

একটু সময় স্থির রইল গ্রেণ্ডেল, তারপরেই সিংহের মত ঝাঁপ দিল, আছড়ে পড়ল মেগানের লাশের উপরে। এরপর পাগলের মত দুই হাত চালাল, ধারালো নখের আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করতে থাকল লাশটাকে। বাড়ি খেয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা উড়ে গেল একপাশে।

বীভৎস এই দৃশ্য দেখে বমি পেল শ্যারনের। কোনোমতে মুখের সামনে হাত এনে চিৎকার ঠেকাল নিজের।

লাশের উপর তাণ্ডব শেষ করে ফ্ল্যাশলাইটের পিছনে লাগল গ্রেণ্ডেল। থাবা দিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ওটাকে। শেষ পর্যন্ত দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেল কাঁচ, নিভে গেল বালব। গাঢ় আঁধারে ছেয়ে গেল গুহার অভ্যন্তর।

দম আটকে অপেক্ষা করছে শ্যারন। এরপর কী ঘটবে কে জানে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে আসা আলোর আভায় সামান্য পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। চোখে পড়ল দানবটার অবয়ব। আলোছায়ার মাঝে ভূতের মত লাগছে সাদা দেহটাকে।

গুহার ভিতরে আবারও চক্কর দিতে শুরু করল ওটা। একবার, দু'বার। নিশ্চয়ই টের পেয়েছে শ্যারনের উপস্থিতি। কয়েক দফা ঘোরাঘুরি করে গুহার ঠিক মাঝখানে স্থির হলো। এবার চুপচাপ মাথা ঘোরাচ্ছে। সময় নিয়ে তাকাচ্ছে দেয়ালের প্রতিটা ফাটল আর গর্তের দিকে। শরীরের সবক'টা লোম দাঁড়িয়ে গেল শ্যারনের। কপাল বেয়ে ভুরুর উপরে নেমে এল এক ফোঁটা ঘাম।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল গ্রেণ্ডেল। জোরে জোরে নাক টানছে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্যারনের ফাটলটার দিকে। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দশা হলো ওর। চিৎকার করবারও আর শক্তি নেই।

তাতে লাভও হবে না কোনও।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল দানবটা। খুলে গেল চোয়াল, বেরিয়ে এল ধারালো দাঁতের সারি।

পঁচিশ

বেঁচে আছে অ্যাবি... যদি এটাকে বেঁচে থাকা বলে আর কী। ঠাণ্ডায় সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে শরীর, কোনও অনুভূতি নেই দেহের কোথাও। ঘোর লাগা একটা অবস্থা, সবকিছুই কেমন যেন স্বপ্নের মত লাগছে।

ওর গায়ের উপরে পড়ে আছেন রিচার্ড, আলিঙ্গন ছাড়েননি... পড়ে আছেন চোখ মুদে, জীবনের সাড়া নেই। নড়তে পারছে না অ্যাবি, তা হলে পালস চেক করে দেখত। ইতিমধ্যে জমে জোড়া লেগে গেছে পিতা-কন্যার পোশাক, দু'জনকে এক করে দিয়েছে। তুষারের পুরু আস্তর পড়তে শুরু করেছে দুজনের গায়ে। খুব শীঘ্রি বরফের নীচে ঢাকা পড়বে শরীরদুটো।

নড়তে চাইল অ্যাবি, কিন্তু পারল না। হাত-পা অনুভূতি হারিয়েছে। শুরুতে শীতে কাঁপছিল, এখন থেমে গেছে তা-ও। হৃৎপিণ্ড আর রক্ত সঞ্চালন করছে না শরীরের আনাচে-কানাচে। সার্ভাইভাল মোডে চলে গেছে দেহযন্ত্র, চেষ্টা করছে শুধু ভিতরটাকে গরম রাখতে। ঠাণ্ডা-গরম কিছুই আর টের পাচ্ছে না ও, নিথর লাগছে পুরো পৃথিবী। জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তবু চোখ মুদল না। ঘুমালে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

এভাবে মরতে চায় না অ্যাবি। ডাকতে চাইল বাবাকে... চাইল কাঁদতে। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয়—আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুখের পেশি, জমে গেছে অশ্রুগ্রন্থি। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুক

দুমড়ে-মুচড়ে যেতে চাইল। কত কী স্বপ্ন ছিল জীবনে, ছিল কত আশা-আকাঙ্ক্ষা... সব বুঝি এভাবেই শেষ হয়ে যাবে!

আর পারছে না অ্যাবি, ধীরে ধীরে এক হতে শুরু করল দু'চোখের পাতা। হঠাৎ চমকে উঠল। দুম দুম করে শব্দ হচ্ছে কাছে কোথাও। তারপরেই আতশবাজির মত আকাশে উঠে গেল অনেকগুলো জ্বলজ্বলে জিনিস, উপরে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো। তুষারঝড় অগ্রাহ্য করে আলোকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সিগনাল ফ্লেয়ার!

চোখ পিটপিট করল অ্যাবি। ফ্লেয়ারের আলোয় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গুমগুম আওয়াজ শুনল এরপর। তুষারের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এল কালো কয়েকটা আকৃতি। দেখতে অনেকটা স্নোমোবিলের মত, কিন্তু স্নোমোবিল নয়। ওদের খুব কাছে এসে থামল ওগুলো। এবার বাহনগুলোকে চিনল অ্যাবি। ছোট আকারের এক্সপেরিমেণ্টাল হোভারক্র্যাফট—মাত্র দু'জন আরোহী চড়তে পারে। খানা-খন্দঅলা বরফ প্রান্তরের উপর দিয়ে চলাচলের জন্য স্নোমোবিলের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

লাফ দিয়ে কয়েকজন লোক নেমে এল হোভারক্র্যাফট থেকে। সবার পরনে সাদা পারকা, হাতে রাইফেল। সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল পড়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে। পাশে এসে পা দিয়ে গুঁতো দিল, তারপর নিচু হয়ে পরীক্ষা করল নাড়ি। রাশান ভাষায় তাদেরকে কথা বলতে শুনল অ্যাবি। দু'জন ওর দিকে এগিয়ে এল, টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিল রিচার্ডের আলিঙ্গন থেকে। তারপর ধরাধরি করে নিয়ে চলল হোভারক্র্যাফটের দিকে।

সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ আবার যখন চোখ খুলল অ্যাবি, তখন নাকে-মুখে লাগছে ঠাণ্ডা বাতাস আর তুষারের তীব্র ঝাপটা। দেখল, একটা হোভারক্র্যাফটের পিছনের সিটে

পড়ে আছে ও, বেল্ট দিয়ে আটকানো অবস্থায়। ঠিক সামনেই বসে আছে চালক—তার গায়ে উলের সোয়েটার ছাড়া কিছু নেই। বিস্মিত হয়ে অ্যাবি লক্ষ করল, লোকটার পারকা ওর নিজের পরনে। পশমি হুড তুলে দেয়া হয়েছে মাথায়। মাথা একটু কাত করে সামনে তাকাল ও। ড্রিফট স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে হোভারক্র্যাফট।

দ্বিতীয়বারের মত জ্ঞান হারাল অ্যাবি।

তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে চেতনা ফিরল ওর। যেন জ্যান্ত ঝলসানো হচ্ছে ওকে, পুরো শরীরে ঢালা হচ্ছে অ্যাসিড! মনে হলো চামড়া খুলে পড়বে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরুল না গলা দিয়ে। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল, আর তখুনি টের পেল—একজোড়া হাত ধরে রেখেছে ওকে পিছন থেকে।

'শান্ত হোন, মিস ম্যানিটক,' হাতের মালিক বলল পিছন থেকে। নারীকণ্ঠ। 'কোনও ভয় নেই।' কার উদ্দেশে যেন নির্দেশ দিল সে, 'আরেকটু গরম পানি ছাড়ো।'

পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল অ্যাবি। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ও। ধূমায়িত পানির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে। এতক্ষণে কথা বলার শক্তি খুঁজে পেল। বলল, 'আ... আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছে!'

'পানিটা আসলে অত গরম না,' বলল কণ্ঠটা। 'আপনার চামড়ায় আবার রক্ত চলাচল শুরু হচ্ছে, সেজন্যেই ব্যথা পাচ্ছেন। কয়েক জায়গায় ফ্রস্টবাইটও আছে। সামান্য মরফিন দেয়া হয়েছে আপনাকে পেইনকিলার হিসেবে।'

মাথা ঘুরিয়ে বক্তার দিকে তাকাল অ্যাবি। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে... আমেরিকান। নিশ্চয়ই ওমেগা স্টেশনের কোনও রিসার্চার। তা হলে এখানেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে ওদের?

'হাই!' বলল মেয়েটা। 'আমি ড্রুসিলা কোল।'

‘পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,’ শুকনো হাসি দিয়ে বলল অ্যাবি।

শাওয়ারের নীচে আরও পাঁচ মিনিট কাটানোর পর তোয়ালে জড়িয়ে বের করে আনা হলো ওকে। পাশে আরেকটা শাওয়ার দেখতে পেল অ্যাবি, ওটার ভিতরে গোসল করানো হচ্ছে আরেকজনকে। দরজা ফাঁক হয়ে আছে... পাওয়েলের চেহারা দেখল ও।

অ্যাবিকে হাঁটতে সাহায্য করল ড্রুসিলা, বাথরুম থেকে নিয়ে এল বড় একটা কামরায়। ইউনিফর্ম পরা নেভির লোকজন অলসভাবে শুয়ে-বসে আছে ওখানে। অ্যাবিকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, এগিয়ে এল কাছে। লেঃ কমাণ্ডার রাইট।

‘কেমন বোধ করছেন?’ জিজ্ঞেস করল সে। গলায় আন্তরিকতা।

জবাব দিল না অ্যাবি। কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘আমার বাবা...’

‘ভাল আছেন। ওই তো... আগুন পোহাচ্ছেন।’ আঙুল তুলে কামরার একপ্রান্তে ফায়ারপ্লেস দেখাল রাইট। তার সামনে হাত মেলে বসে আছেন বৃদ্ধ ইনুইট। ‘টাফ ওল্ড গাই! নাকের ডগায় সামান্য ফ্রস্টবাইট ছাড়া আর কিচ্ছু হয়নি। শরীরটা বরফের তৈরি নির্ঘাত!’

বুকের উপর থেকে এক মণ পাথর যেন নেমে গেল অ্যাবির। এগোতে চাইল বাবার দিকে, কিন্তু শরীরে কাঁপুনি ওঠায় সামনে যাওয়া সম্ভব হলো না। অগত্যা বসে পড়ল একটা বেঞ্চে। কাঁপুনি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। বাড়তে শুরু করেছে দেহের ভিতরকার তাপ—কাঁপুনি তারই প্রতিক্রিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সাড়া ফিরতে শুরু করল হাত-পায়ে। প্রতিটা লোমকূপে হাজারো সুঁই ফোঁটানোর মত অনুভূতি হলো। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল ও।

প্রায় মিনিটপাঁচেক চলল এই অত্যাচার, এরপর কমতে শুরু করল ব্যথাবোধ। লেঃ কমাণ্ডার রাইটের দিকে তাকাল ও। বলল, 'পাওয়েলকে দেখতে পেয়েছি শাওয়ারে। কিন্তু ফার্নান্দেজ...'

'দুঃখিত। রাশান প্রহরীরা পৌঁছুনোর আগেই মারা গেছে ও।'

মন খারাপ হয়ে গেল অ্যাবির। উঠে দাঁড়াল ও। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না, এগিয়ে গেল পিতার দিকে। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন রিচার্ড। মেয়েকে দেখে হাসি ফুটল মুখে।

'এসে গেছিস?' বললেন তিনি। 'আয়, আমার পাশে বোস।'

একটা চেয়ার টেনে বসল অ্যাবি।

'কপাল ভাল আমাদের,' বললেন রিচার্ড, 'বেঁচে গেছি।'

'এটাকে বেঁচে যাওয়া বলছ?' ম্লান শোনাল অ্যাবির কণ্ঠ। 'কোথায় আটকা পড়েছি, সে-খেয়াল আছে?'

'মরে গেলেই বা কী লাভ হতো? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

হাতে একটা কফির মগ নিয়ে অ্যাবির কাছে এল রাইট। বাড়িয়ে ধরে বলল, 'খান এটা। কফি খেলে শরীর গরম হবে।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কফি নিল অ্যাবি। মগে চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলাল চারপাশে। ড্রিফট স্টেশনের একটা ডরমিটরিতে বন্দি হয়ে আছে ওরা। দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি চারপায়া খাট, মাঝখানে কিছু চেয়ার-টেবিল আর বেঞ্চ। আটকা পড়া বিজ্ঞানী, রিসার্চার আর নেভির লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে সবখানে।

রাইটের দিকে ফিরল ও। 'কী ঘটেছে, একটু খুলে বলবেন?'

'খুলে বলার কিছু নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রাইট। 'রাশানরা গায়ের জোরে এই ওমেগা স্টেশন দখল করে নিয়েছে।'

'সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন?'

'আমি শিয়োর না,' বলল রাইট। 'সম্ভবত পুরনো রাশান স্টেশন, যেখানে আপনাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর। যদ্দূর বুঝেছি, কিছু লুকানো আছে ওখানে... রাশানরা সেটা হাতে পেতে চাইছে। আমাদের সবাইকে পালা করে জেরা করছে ওরা, জানার চেষ্টা করছে—কে কী জানি। আপনাদেরকেও উদ্ধার করে এনেছে সে-কারণে। ভেবেছিল কিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন আপনারা। আমি অবশ্য জানিয়ে দিয়েছি, আপনারা আইস স্টেশন বা সাবমেরিনের কেউ নন।'

'কী খুঁজছে ওরা, কোনও আইডিয়া করতে পারেন?'

'দুঃখিত। ওই বেইসের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। ওখানকার অপারেশন চলছে নিড-টু-নো বেসিসে।'

'নিড-টু-নো?'

'হ্যাঁ। সিনিয়ররা বোধহয় ভেবেছেন আমাকে কোনও কিছু না জানালেও চলে।'

'এখন তা হলে কী করবেন?'

'করার কিছু নেই, ম্যা'ম,' হতাশা ফুটল রাইটের গলায়। 'আমার সিকিউরিটি টিম খুবই ছোট, তার মধ্যে পাঁচজনকে খুন করেছে রাশানরা। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই আমরা। এরপর সিভিলিয়ানদের সঙ্গে এখানে বন্দি করা হয়েছে আমাদেরকে। বাইরে পাহারা আছে, উল্টোপাল্টা কিছু করতে গেলেই খুন হয়ে যেতে হবে। বলা হয়েছে—যদি সহায়তা করি, তা হলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে।'

'বিশ্বাস করেছেন কথাটা?'

জবাব দিল না রাইট, নীরব হয়ে গেল।

রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য স্নোক্যাটটার কোনও খবর জানেন? যেটায় রানা আর ম্যাসন গেল?'

'ধরা পড়েনি, এটুকু বলতে পারি। ওদের সঙ্গে কথা হয়েছিল

আমার। বলে দিয়েছিলাম, রাশান বেইসে গিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিতে। পেরেছে কি না জানি না।'

রানা ধরা পড়েনি শুনে স্বস্তি অনুভব করল অ্যাবি। কফিতে আরেকটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাকি সবাই এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল রাইট। 'যারা বেঁচে আছে আর কী।'

ভুরু কুঁচকে কামরার ভিতরে দৃষ্টি বোলাল অ্যাবি, বিশেষ একজনকে খুঁজছে। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। 'এনসাইন পাটইয়াক কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'এখানে নেই,' বলল রাইট। 'কয়েকজনের খোঁজ পাইনি আমরা। পাটইয়াক একজন... আর কিছু সিভিলিয়ান। কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে, বলা মুশকিল। গুরুতর আহত কয়েকজনকে হসপিটাল উইঙে নিয়ে গেছে রাশানরা, ওদের ভিতর থাকতে পারে।'

পিতার সঙ্গে চোখাচোখি করল অ্যাবি। লোবোর জন্য দুশ্চিন্তা অনুভব করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন রিচার্ড, ধরলেন মেয়ের হাত। চাপ দিয়ে বোঝালেন, সাহস হারালে চলবে না। এরপর রাইটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আটচল্লিশ ঘণ্টা, না? এরপর সত্যিই ওরা ছেড়ে দেবে সবাইকে?'

'আমি জানি না, মি. ম্যানিটক।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অ্যাবি। 'তার মানে ছাড়বে না।'

'যা খুশি ভাবতে পারেন,' বলল রাইট। 'কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ-মুহূর্তে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সংখ্যার দিক থেকে... অস্ত্রের দিক থেকে। আমাদের কাছে একটা ছুরিও নেই।'

'কিন্তু আপনাদের তো একটা সাবমেরিন আছে!'

'পোলার সেন্টিনেল স্রেফ একটা রিসার্চ সাবমেরিন, ম্যা'ম। কোনও আর্মামেন্ট নেই ওটাতে। ওটা সম্ভবত সাহায্যের আশায়

এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। মানে... যদি রাশান সাবমেরিনটার কবলে না পড়ে থাকে আর কী।'

'তা হলে কী করব আমরা? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? ভরসা করব রাশানদের কথার উপরে?'

'না!' নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

একসঙ্গে ওদিকে মাথা ঘোরাল সবাই। এসে পড়েছে পাওয়েল, শাওয়ার নেয়া শেষ হয়েছে তার। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ফায়ারপ্লেসের সামনে। তারপর বলল, 'ফার্নান্দেজকে খুন করেছে ওরা; সবাইকেই করবে। চুপচাপ বসে থাকা মানে চুপচাপ মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া।'

গম্ভীর হয়ে গেল সবাই। কেউ কোনও কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙে অ্যাবি বলল, 'সেক্ষেত্রে একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

ছাব্বিশ

কমাণ্ডার ফিশার নিশ্চিত, পথ হারিয়েছে ওরা। আশঙ্কাটা মাথায় চাপার সঙ্গে সঙ্গে খিচড়ে গেছে মেজাজ। এমনিতে শান্ত স্বভাবের মানুষ সে, কিন্তু এই টানেলের গোলকধাঁধা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে নিঃসন্দেহে। এমন বিতিকিচ্ছিরি জায়গা আগে কোনোদিন দেখেনি সে। যেদিকে তাকায় শুধু বরফ আর বরফ।

সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে... সবখানে একই দৃশ্য। দিক ঠিক রাখা দায়।

ফিশারের ঠিক সামনে হাঁটছে লেফটেন্যান্ট লিসা ইভান্স। হাবভাবে ঘাবড়ে যাবার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাথরের তৈরি নার্ভ নাকি? মেয়েটা নতুন একটা টানেলে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে হাঁক ছাড়ল কমাণ্ডার, 'লিসা! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

দেয়ালের উপর আলো ফেলল লিসা। বেগুনি রঙের একটা প্রতীক দেখা যাচ্ছে ওখানে। বলল, 'মার্কিং করা এরিয়ার মধ্যে এটাই শুধু দেখা বাকি, স্যর। শুনেছি এদিককার গুহায় কাজ করে বিজ্ঞানীরা।'

'মার্কিং ছাড়া এলাকাও আছে নাকি?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল ফিশার।

'জী, স্যর। ওই অংশ আরও বড়। এখানে শেষ করে ওদিকে যাব নাহয়। বাড়তি কিছু পেইন্ট ক্যান নিতে হবে তখন—দেয়ালে দাগ দেবার জন্য। নইলে পথ হারাবার ভয় আছে।'

'এখনও পথ হারাইনি বলতে চাইছ?'

হেসে উঠল লিসা। 'কী যে বলেন না! এদিকের সব দেয়ালে মার্কিং আছে, দেখতে পাচ্ছেন না? চাইলেও তো পথ হারাতে পারবেন না।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকে এগোবার ইশারা করল ফিশার।

ইভ্যাকুয়েশনের সময় দলের দু'জন সদস্যকে স্নেক পিটে পাঠিয়েছিল সে। বুলহর্ন নিয়ে হাঁকডাক করেছে তারা, সবাইকে বের হয়ে আসতে বলেছে। তাড়াহুড়োয় সব জায়গায় ঠিকমত ঢুঁ মারতে পারেনি তারা; যাদেরকে বের হতে দেখেছে, তাদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। কিন্তু পরে... হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখা গেল বেশ ক'জন নিখোঁজ। এদের মধ্যে একজন হলো ড. শ্যারন বেকেট—ওমেগা স্টেশনের প্রধান। ওই পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে

পারেনি ফিশার, পিছনে রয়ে গেছে কর্তব্যের তাগিদে। স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে লেঃ লিসা। রাশান স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল সে, অপরাধবোধে ভুগছিল সবাইকে সরাতে না পারায়।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটার কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করল কমাণ্ডার মনে মনে। জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে এমনটা সচরাচর দেখা যায় না... তাও আবার মেয়েদের মধ্যে। চমৎকার মেয়ে এই লিসা, চোখ দিয়ে মাপল তাকে ফিশার। লম্বা-চওড়া দেহ আর ববকাট চুল মিলিয়ে জাত-যোদ্ধার মত লাগছে। আসলেও তা-ই। মেয়েলিপনা নেই এই মেয়ের মধ্যে, আচার-আচরণ খাঁটি নেভাল অফিসারের মত।

টানেলের দিকে চোখ ফেরাল ফিশার। মনে পড়ে গেছে দায়িত্বের কথা। নিখোঁজ বিজ্ঞানীদের খুঁজে বের করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে তাদের নিরাপত্তা। মুখের সামনে বুলহর্ন তুলে সুইচ টিপল। উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'দিস ইজ কমাণ্ডার টিমোথি ফিশার। কেউ আমার কথা শুনতে পেলে সাড়া দিন!'

টানেলের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি উঠল। বুলহর্ন নামিয়ে একটু অপেক্ষা করল ফিশার জবাব শোনার আশায়। অবশ্য জবাব পাবে বলে আশা করছে না। আধঘণ্টা যাবৎ স্নেক পিটের এখানে-ওখানে হাঁক ছাড়ছে সে, এখন পর্যন্ত সাড়া দেয়নি কেউ। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। দূর থেকে কে যেন পাল্টা চিৎকার করে উঠল। দূরত্বের কারণে অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজ।

দাঁড়িয়ে গেল লিসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ওদিক থেকে এসেছে।' আঙুল তুলল ফিশার। 'মুভ!'

পাশের একটা টানেলে ঢুকে পড়ল দু'জনে। এগোল দ্রুত

পায়ে। একটু পরেই বিশাল একটা গুহায় বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল ফিশার। জমাট বাঁধা একটা জলাশয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে। পুরো গুহা জুড়ে পড়ে আছে জেনারেটর আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। একপাশে ভলকানিক পাথরের বিশাল এক ক্লিফ ফেস—উদ্ভাসিত হয়ে আছে কৃত্রিম আলোয়।

'ক্রাইস্ট!' ফিসফিস করে বলল কমাণ্ডার ফিশার।

বেঁটেখাটো, টাক মাথার এক বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। সঙ্গে অল্পবয়েসী দুই অ্যাসিসটেন্ট। ওদেরকে দেখে লিসা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'ড. কনওয়ে! আপনি এখনও এখানে কেন? ইভ্যাকুয়েশনের খবর পাননি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' বিরক্ত গলায় বললেন কনওয়ে। 'কিন্তু আমার কাজের সঙ্গে পলিটিক্সের কোনও সম্পর্ক নেই। দিস ইজ সায়েন্স। স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ যার হাতেই থাকুক, কিছু যায়-আসে না। আমার স্পেসিমেনগুলো ঠিক থাকলেই হয়। যত বিপদই আসুক, ওগুলোকে ফেলে যেতে পারব না আমি... বিশেষ করে এমন একটা স্পর্শকাতর মুহূর্তে। থঅয়িং প্রসেস প্রায় শেষ—বরফ গলিয়ে স্পেসিমেনগুলোকে বের করে আনছি আমরা।'

'স্পেসিমেন! থঅয়িং!!' হতভম্বের মত বলল ফিশার। 'কী বলছেন এসব?'

'ওগুলোকে রক্ষা করতে হবে!' জোর গলায় বললেন কনওয়ে। 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন... ডেটা কোরাপশনের ঝুঁকি নিতে পারি না আমি!'

দুই অ্যাসিসটেন্ট নার্ভাস ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, খেয়াল করল ফিশার। সম্ভবত বসের যুক্তি মেনে নিতে পারছে না ওরা। বয়স বেশি না ওদের—জীবনের বহু সাধ-আহ্লাদ মেটানো বাকি। পাগলাটে এক বিজ্ঞানীর জন্য প্রাণের উপর ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয়?

'আসুন আপনাদের দেখাই,' বললেন কনওয়ে। 'ই.ই.জি. অ্যাক্টিভিটি ডিটেক্ট করছি আমরা।' কথা শেষ করেই উল্টো ঘুরে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁকে অনুসরণ করল বাকিরা।

'ড. বেকেটও কি এখানে?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'না তো!' বললেন কনওয়ে। 'কেন... এখানে থাকার কথা নাকি?'

'এদিকেই কোথাও আছেন উনি। ড. বেনটনের সঙ্গে এসেছেন জিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের এক জুনিয়র রিসার্চারকে খুঁজতে।'

'এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। গতকাল থেকে এখানে কাজ করছি আমরা, বাইরে যাইনি। খাওয়া-দাওয়াও সেরেছি এখানেই।'

ক্লিফ ফেসের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। ফাটল ধরে ওপাশের গুহায় সঙ্গীদের নিয়ে চললেন কনওয়ে। কিছুদূর যেতেই শোনা গেল মেঝেতে বয়ে যাওয়া পানির উপর ছপছপ আওয়াজ—অন্যপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসছে কে যেন। হালকা-পাতলা গড়নের এক তরুণী উদয় হলো কয়েক সেকেণ্ড পর। বাইশ-তেইশের বেশি হবে না বয়স। ড. কনওয়ের আরেক অ্যাসিসটেন্ট। হাঁপাচ্ছে।

'থামো, থামো!' হাত তুলে বলে উঠলেন কনওয়ে। 'এভাবে ছুটছ কেন, লিলি?'

'প্রফেসর!' ভয়ার্ত গলায় বলল লিলি নামের মেয়েটা। 'ওখানে... ওখানে...'

'কী হয়েছে?'

পিছনদিকে ইশারা করল লিলি, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ভীষণ ভয় পেয়েছে, বিস্ফারিত হয়ে আছে দু'চোখ।

'কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন কনওয়ে।

প্রথমে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিলি, তারপর আবার ইতিবাচকভাবে।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তি প্রকাশ করলেন কনওয়ে। 'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো আমার সঙ্গে।'

সামনে পা বাড়ালেন তিনি। প্যাসেজ পেরিয়ে বেরিয়ে এলেন ছোট গুহাটায়। পিছু পিছু বাকিরা। ভিতরে পা দিয়েই নাক-মুখ কুঁচকে ফেলতে বাধ্য হলো ফিশার আর লিসা। বিচ্ছিরি বোটকা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। গন্ধটা আসছে গুহার মাঝখানে পড়ে থাকা একটা পেটকাটা অদ্ভুত জন্তু থেকে।

শুধু ওটাই নয়, অক্ষত অবস্থায় আরও ছ'টা স্পেসিমেন দেখতে পেল ফিশার—মেঝের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, আশপাশে গলা-আধগলা বরফের টুকরো। বরফ গলিয়ে বের করে আনা হয়েছে ওগুলোকে। দুটো প্রাণীর শরীরের সঙ্গে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের ওয়ায়্যার লাগিয়েছে বায়োলজিস্টরা—অন্যপ্রান্তে ভিডিও মনিটর। পর্দায় ওঠানামা করছে সবুজ রেখা।

গুহার ভিতরে নজর বোলালেন কনওয়ে। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কই... কিছুই তো দেখছি না।' লিলির দিকে ফিরলেন। 'তুমি অমন করলে কেন?'

হাত তুলে একটা প্রাণীকে দেখাল লিলি। পেটকাটা স্পেসিমেনের পাশে পড়ে আছে ওটা। বলল, 'ওটাকে নড়তে দেখেছি আমি!'

'নেশা করেছ? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই আলো-ছায়ার কারসাজিতে ভয় পেয়েছ।'

ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল মেয়েটা। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস হয়নি তার।

ফিশার আর লিসার দিকে ফিরলেন কনওয়ে। বললেন, 'ই.ই.জি. রিডিং দেখে ঘাবড়ে গেছে ও। অভিজ্ঞতা কম কি না!'

'ই.ই.জি.? মানে ব্রেনওয়েভের কথা বলছেন?' বিস্ময় প্রকাশ করল ফিশার। হেঁটে মনিটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'ঠিক ব্রেনওয়েভ না,' এগিয়ে এসে বললেন কনওয়ে। 'ই.ই.জি. হলো ব্রেনের মধ্যকার এক ধরনের ইলেকট্রিকাল পালস। স্পেসিমেনগুলোর মধ্যে এর নমুনা পেয়েছি আমরা।'

ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হলো ফিশার। 'বলতে চাইছেন এগুলো জ্যান্ত?'

'না, না। তা হবে কেন? স্পেসিমেনগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো। তবে হঠাৎ করে যদি কোনও জ্যান্ত প্রাণী বরফে জমাট বেঁধে যায়, তা হলে এ-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। মগজের কেমিকালগুলোও জমাট বেঁধে যায় সেক্ষেত্রে, নষ্ট হবার সময় পায় না। পরে যখন দেহটাকে গরম করতে শুরু করবেন আপনি, কেমিকালগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। কিছুটা সময়ের জন্য নিউরো-কেমিকাল রিঅ্যাকশনও চলতে থাকবে। তবে প্রাণীটা যেহেতু মৃত, ওই রিঅ্যাকশন বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। আস্তে আস্তে থেমে যাবে। কেন আমি এখান থেকে নড়ছি না, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? থেমে যাবার আগেই প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণীগুলোর নিউরো-কেমিকাল ডেটা সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। এ-ধরনের অ্যাক্টিভিটি গত পঞ্চাশ হাজার বছরে কেউ দেখেনি!'

'যা-ই বলুন, দানবগুলো মরে পড়ে থাকলেই খুশি হব আমি,' অস্বস্তিভরা গলায় বলল ফিশার।

যেন তার কথা শুনেই আচমকা ঝাঁকি খেলো একটা স্পেসিমেনের দেহ। কুণ্ডলী খুলে সোজা হতে শুরু করল ওটা, লেজের আঘাতে পড়ে গেল একটা লাইট-পোল। চমকে উঠল সবাই... এমনকী ড. কনওয়েও। চরম অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল দানবটার দিকে।

ধীরে ধীরে পুরো সোজা হয়ে গেল ওটার শরীর। তারপরেই

শুরু হলো শরীর মোচড়ানো। ডাঙায় তোলা মাছের মত মেঝেতে লাফ-ঝাঁপ দিতে থাকল। খিঁচুনি হচ্ছে গোটা শরীরে—কখনও টান টান হয়ে যাচ্ছে চামড়া, কখনও বা শিথিল।

মোহগ্রস্তের মত প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলেন কনওয়ে। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ও! অবিশ্বাস্য!!'

'ডক্টর!' পিছন থেকে ডাক দিল ফিশার।

আর তখুনি বিজ্ঞানীর দিকে ঝাঁপ দিল দানব। চোয়াল খুলে গেছে, উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে ধারালো দাঁতের সারি। খপ্ করে তাঁর কলারের পিছনটা চেপে ধরল ফিশার, একটানে সরিয়ে আনল পিছনে। বিজ্ঞানীর নাগাল না পেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল দানব, শরীর মোচড়ানো থামেনি।

ঝট্ করে রাইফেল তুলল ফিশার। তাক করল প্রাণীটার দিকে। ট্রিগার চাপার আগেই বোঁ করে উঠল মাথা, গলার কাছে উঠে এল বমি। চোয়ালের হাড়ে অনুভব করল অদ্ভুত কম্পন। একই অবস্থা বাকি সবার—দু'হাতে কান চেপে ধরেছে। কী ঘটছে, সেটা সাবমেরিনার হবার সুবাদে পরিষ্কার বুঝতে পারল কমাণ্ডার।

আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ড! বেরিয়ে আসছে দানবটার মুখ দিয়ে!

'দেখুন!' কনওয়ের এক অ্যাসিসটেন্ট চেঁচিয়ে উঠল, হাত তুলে রেখেছে ই.ই.জি. মেশিনগুলোর দিকে।

ঘাড় ফেরাল ফিশার, স্ক্রিনের দিকে তাকাল। এতক্ষণের অলস সবুজ রেখা এখন রীতিমত লাফালাফি করছে পুরো স্ক্রিন জুড়ে। বেড়ে গেছে মস্তিষ্কের অ্যাক্টিভিটি। মেশিনদুটোর সঙ্গে জোড়া দেয়া স্পেসিমেনগুলোও এখন কাঁপতে শুরু করেছে। ঝট্ করে খুলে গেল আরও একটা কুণ্ডলী পাকানো দেহ।

'মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার। সবাইকে নিয়ে ছুটল ফাটলের ভিতরে। ড. কনওয়ে নড়তে চাইছিলেন না, তাঁকে একরকম

টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হলো। পিঠটান দেয়াই উচিত, কিন্তু কৌতূহলের সামনে হার মানল আতঙ্ক। ফাটলে ঢুকে থেমে গেল সবাই। ওখান থেকে উঁকি দিল এরপর কী ঘটে তা দেখার জন্য।

'ইটস্ আমেইজিং!' বলে উঠলেন কনওয়ে। 'পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ওরা!'

'আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডের সাহায্যে?' প্রশ্ন ফিশারের।

'পুরনো আমলের তিমির গান,' বললেন কনওয়ে। 'অ্যাম্বিউলোসিটাসরা আধুনিক তিমির পূর্বপুরুষ, ওদের কাছ থেকেই হয়তো গান গাওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে আজকের তিমিরা। যদ্দূর বুঝলাম, ওই আল্ট্রাসোনিকস্ এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ট্রিগার... সবাইকে জাগিয়ে তুলছে শীতনিদ্রা থেকে। এক ধরনের ডিফেন্স মেকানিজম... নিরাপত্তার জন্য একাট্টা হতে চাইছে ওরা।'

প্রথম যে-দানবটা জেগে উঠেছে, ওটার খিঁচুনি থেমে যেতে দেখল ওরা। মেঝেতে শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে এখন ওটা, ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাস ফেলছে। ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে উঠছে চেহারা। বিপদের আভাস পেল কমাণ্ডার ফিশার। প্রাণীটার দিকে রাইফেল তুলল সে।

খপ্ করে রাইফেলের ব্যারেল ধরে ফেললেন ড. কনওয়ে, নামিয়ে দিলেন নীচে। চাপা গলায় বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে, কমাণ্ডার? স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আমাদের সামনে... আর আপনি ওটাকে গুলি করতে চাইছেন?'

'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর,' চাঁছাছোলা গলায় বলল ফিশার। 'যা করছি, বুঝেশুনেই করছি আমি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি—দানবগুলো বিপজ্জনক। এমনিতেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছি সবাই, নতুন বিপদ ঘাড়ে নেবার প্রয়োজন দেখছি না।'

'তাই বলে আপনাকে আমি গুলি চালাতে দেব না,' গোঁয়ারের মত বললেন কনওয়ে।

‘বেশ, তা হলে আপনার আবিষ্কার এখানেই থাকুক। আমরা বরং কেটে পড়ি। আসুন।’ ফাটল থেকে বেরুবার জন্য ইশারা করল কমাণ্ডার।

‘কিন্তু... কিন্তু আমার স্পেসিমেনগুলোর প্রোটেকশন দরকার!’

‘ভাল করে তাকান ওদের দিকে। আপনার সাহায্য দরকার নেই ওদের; নিজেরাই নিজেদের প্রোটেকশন দিতে পারবে... কোনও সন্দেহ নেই তাতে।’ বাঁকা সুরে বলল ফিশার। ‘আর কোনও কথা নয়, ডক্টর। হাঁটুন! লিসা, সবাইকে বের করো এখান থেকে।’

খেদিয়ে সবাইকে ফাটল থেকে বের করে আনল দুই নেভাল অফিসার। আইস রিঙ্কের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। যত দ্রুত সম্ভব স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

‘রাশানরা নিশ্চয়ই জানে এই স্পেসিমেনগুলোর কথা,’ বলে উঠলেন ড. কনওয়ে। ‘সেজন্যেই বেইসের দখল নেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। জ্যান্ত অ্যাম্বিউলোসিটাস আবিষ্কারের ক্রেডিট নিতে চায় ওরা!’

কমাণ্ডার ফিশার জানে, তাঁর ধারণা ভুল। অল্প যে-ক’জন মানুষ বেইসের চার নম্বর লেভেলের রহস্য জানে, তার মধ্যে সে একজন। বৈজ্ঞানিক কোনও আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ নেই রাশানদের, ওরা আসছে এখানকার সবকিছু ধামাচাপা দেবার জন্য।

আইস রিঙ্কের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল লিসা। ‘কমাণ্ডার! আমাদের পিছনে!!’

পাঁই করে ঘুরল ফিশার। চোখ বড় হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ক্লিফ ফেসের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা দানব। তার পিছনে আরেকটা বেরুল... তারপর আরও একটা ..! দু’পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। হাঁটছে টলমল পায়ে... নির্দিষ্ট

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। লোভীর মত হাঁ হয়ে আছে সবগুলো প্রাণীর মুখ। পঞ্চাশ হাজার বছরের অভুক্ত, খাবারের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে ওরা।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করলেন কনওয়ে।

'জলদি হাঁটুন!' চেঁচিয়ে উঠল ফিশার। 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!!'

চিৎকারটা বেরুতেই ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরে গেল তিন দানবের মুখ। চোয়ালে আবারও আল্ট্রাসোনিকসের কম্পন অনুভব করল কমাণ্ডার। সোনারের মত শব্দতরঙ্গ ছুঁড়ছে দানবগুলো... ট্র্যাক করছে ওদেরকে!

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ফিশার। ওদেরকে ধরতেই উঠে এসেছে প্রাণীগুলো!

নতুন দুটো মুখ উদয় হলো ক্লিফের ফাটল থেকে। সেদিকে তাকিয়ে ফিশার নির্দেশ দিল, 'লিসা, সবাইকে নিয়ে যাও এখান থেকে। পথ তো চেনো... যা-ই ঘটুক, থামবে না কিছুতেই। মেইন বেইসে পৌঁছুতে হবে তোমাদেরকে। বুঝতে পেরেছ?'

'আর আপনি, স্যর?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'আমি তোমাদের পিছনেই আছি। চেষ্টা করব জানোয়ার-গুলোকে দূরে রাখতে। নাউ মুভ!'

রাইফেল উঁচু করল ফিশার।

'না... প্লিজ, কমাণ্ডার!' অনুনয় করলেন কনওয়ে।

'দুঃখিত, ডক্টর,' রুক্ষ গলায় বলল ফিশার। 'আমি নিরুপায়।'

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

সাতাশ

পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে রানার। গত একঘণ্টা ধরে আইস ক্যাপের রুক্ষ প্রান্তরের উপর দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে স্নোক্যাট চালাচ্ছে বাহনটার ড্রাইভার—পেটি অফিসার টমাস লয়েড। পরোয়া করছে না খানাখন্দের। ফলে ঝালমুড়ির ডাব্বার মত অবিরাম ঝাঁকি খাচ্ছে স্নোক্যাট। ঝড় বয়ে যাচ্ছে আরোহীদের উপর দিয়ে। পুরো শরীর টনটন করছে রানার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। তুষারপাত সামান্য কমেছে, তবে কমেনি বাতাসের তাণ্ডব। প্রবল আক্রোশ নিয়ে আছড়ে পড়ছে ছোট্ট স্নোক্যাটের গায়ে।

অনেকক্ষণ আগেই সঙ্গীদেরকে বোঝানোর চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে রানা। নৌ-সদস্যরা রাশান বেইসে পৌঁছুনোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর, কিছুতেই উল্টো ঘুরে কাউকে সাহায্য করতে যাবে না। রানার অনুরোধে দ্বিতীয় স্নোক্যাটকে রেডিওতে কয়েক দফা ডাকাডাকি করেছিল ড্রাইভার। কিন্তু কোনও জবাব আসেনি। আসবে বলে মনেও হয় না। রাশান বেইসকেও শর্ট ব্যাণ্ডে ডেকেছিল ড্রাইভার, ওখানেও কেউ সাড়া দেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, শুভ্রতার এই রাজত্বে ওরা সম্পূর্ণ একা।

অ্যাবি আর রিচার্ডকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছে রানা। কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে কে জানে! বন্দি হয়েছে? নাকি তার চেয়েও খারাপ কিছু? ভাবতে চাইছে না ও, কিন্তু মাথা থেকে তাড়াতেও পারছে না বন্ধুদের অমঙ্গলের আশঙ্কা। কীভাবে ওদেরকে সাহায্য

করা যায়, এ-নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে কিছুক্ষণ, তবে কোনও পথ দেখতে পায়নি। রাশান বেইসে পৌঁছুনোর পর হয়তো সুযোগ আসবে... সে-আশায় ধৈর্য ধরেছে ও।

'ওই তো স্টেশনটা!' হঠাৎ বলে উঠল পেটি অফিসার লয়েড। ইঙ্গিত করল সামনের দিকে। কণ্ঠে স্বস্তির সুর। 'যাক, অন্তত বাতি জ্বেলে রেখেছে ওরা।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, চোখ পিটপিট করে বোঝার চেষ্টা করল বেইসটা কোথায়। বিশাল এক প্রেশার রিজ চোখে পড়ল ওর, ওটার গায়ে বাতাসে ভেসে আছড়ে পড়ছে তুষারের ধারা, পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না কিছু। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পরে গোড়ার কাছে আবছা একটা আলোর আভা সনাক্ত করতে পারল।

'কই... কোথায় স্টেশন?' বলে উঠল ম্যাসন। রানার মত তীক্ষ্ণ নয় তার দৃষ্টি। 'আমি তো কিছুই দেখছি না!'

'বরফের নীচে,' বলল লয়েড। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড বেইস ওটা।'

ঝাঁকুনি খেতে খেতে আলো লক্ষ্য করে এগোল স্নোক্যাট। কিছুদূর যেতেই পার্ক করে রাখা আরও কিছু বাহন দেখতে পেল রানা—স্কি-ডু আর স্নোক্যাট... খোঁড়লে ঢোকানো একটা আইসবোটও আছে। প্রেশার রিজের আড়ালে থাকায় বাতাসের ঝাপটা কম লাগছে ওগুলোর গায়ে, তারপরেও অন্তত ছ'ইঞ্চি তুষার জমে গেছে সবগুলোর উপরে।

পার্কিং এরিয়া পেরিয়ে এল লয়েড, সোজা বেইসের এণ্ট্রান্স টানেলের দিকে স্নোক্যাট ছোটাচ্ছে। হঠাৎ গাল দিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট গ্রিন।

একসঙ্গে ঘুরে গেল স্নোক্যাটের সব আরোহীর মুখ। তুষারের পর্দা ভেদ করে অদ্ভুত এক দৃশ্য ফুটে উঠেছে। বরফের আস্তর ভেঙেচুরে মাথা তুলেছে অতিকায় এক সাবমেরিনের কোনিং

টাওয়ার!

'এসে পড়েছে রাশানরা!' উত্তেজিত গলায় বলল ডেভ পার্ল।

রানা লক্ষ করল, পলিনিয়াটা বড্ড ছোট হয়ে গেছে বিশাল আকুলা ক্লাস সাবমেরিনের জন্য। কোনিং টাওয়ার তুলবার পর চারপাশে খুব একটা জায়গা নেই, খোলের অনেকখানিই ঢাকা পড়ে আছে পুরু বরফের তলায়। তার মানে একসঙ্গে আপার ডেকের সবক'টা হ্যাচ খুলতে পারবে না ওরা। কোনিং টাওয়ারের হ্যাচ দিয়ে বের হয়ে আসতে হবে সবাইকে। কিছুটা সময় পাবে ওরা সটকে পড়ার জন্য।

'এগোন!' লয়েডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ও। ব্রেক কষে স্নোক্যাটি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। 'দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'আমাদের ফিউয়েল প্রায় শেষ,' হতাশ গলায় বলল লয়েড। 'পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারব না।'

লোকটাকে বোঝাবার চেষ্টা বৃথা, তাতে খামোকা সময় নষ্ট হবে। ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকল রানা, ধাক্কা দিয়ে লয়েডকে সরিয়ে দিল ড্রাইভিং সিট থেকে, নিজে বসে পড়ল স্টিয়ারিঙের পিছনে।

'অ্যাই!' গর্জে উঠল গ্রিন। 'কী করছেন আপনি?'

'সবার প্রাণ বাঁচাচ্ছি,' বলল রানা। 'হাতের কাছে যা পান শক্ত করে ধরুন।'

সগর্জনে স্নোক্যাটকে আগে বাড়াল ও। কাভার দরকার ওদের, বাইরে থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। হাইড্রোফোনে নিশ্চয়ই স্নোক্যাটের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে রাশানরা, খুব শীঘ্রি ছুটে আসবে ওদেরকে বাধা দিতে। তার আগেই পৌঁছুতে হবে আইস বেইসে—ওটাই এ-মুহূর্তে একমাত্র আশ্রয়।

প্রবেশপথের টানেলের দিকে বাহনকে ছুটতে দেখে রানার

পরিকল্পনা বুঝে নিল লেফটেন্যাণ্ট গ্রিন। প্রতিবাদ করল না আর। শরীর বাঁকিয়ে পিছনে নজর দিল। কোনিং টাওয়ার বেয়ে নামতে শুরু করেছে রাশানরা। সবার পরনে সাদা পারকা, হাতে অটোমেটিক ফায়ার আর্মস্। মাটিতে পা রেখেই অস্ত্র তাক করল ধাবমান স্নোক্যাটের দিকে।

'বেরিয়ে এসেছে ওরা!' চেঁচাল গ্রিন। 'ফায়ার ওপেন করতে যাচ্ছে!'

'ধৈর্য ধরুন!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা। 'আর একটু...'

লাফঝাঁপ দিতে দিতে বরফের উপর দিয়ে ছুটছে স্নোক্যাট। পিছনে গর্জে উঠল রাশানদের আগ্নেয়াস্ত্র। ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। স্নোক্যাটের পিছনে ইস্পাতের ফুলকি উড়ল, ভেঙে পড়ল কাঁচ, গুলির আঘাতে রিয়ার-এণ্ড ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে বাহনটার।

'মাথা নামিয়ে রাখুন সবাই!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সিটের উপর প্রায় শুয়ে পড়ল সবাই।

আঁকাবাঁকা পথে ছুটছে স্নোক্যাট, দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে লক্ষ্যভেদ কঠিন হয়ে উঠছে রাশানদের জন্য। একটু পরে পৌঁছে গেল ওরা আইস স্টেশনের প্রবেশপথের সামনে। স্পিড কমাল না রানা, অ্যাকসেলারেটর চেপে বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে চলল সামনে।

'ওহ্ গড!' ওর মতলব বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ম্যাসন।

'হোল্ড অন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে টানেলে ঢুকে গেল স্নোক্যাট। দু'পাশের দেয়াল আর ছাত একেবারে চেপে বসেছে চেসিসের গায়ে, ঘষা খেতে খেতে এগিয়ে চলল বাহনটা।

'মি. রানা!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ম্যাসন।

তার ডাক শুনে ছাতের দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল রানা। স্নোক্যাটের ঠেলা-ধাক্কায় টানেলের কাঠামো দুর্বল হয়ে গেছে। চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য ফাটল। খসে

পড়তে যাচ্ছে পুরো টানেলটা। দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরে রাখল ও। নেমে আসতে থাকা বরফের টুকরো পিষে ছুটে চলল স্নোক্যাট। পিছনে ভয়ানক আওয়াজ হলো, টানেল ধসে পড়তে শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন জীবনবাজি রেখে ছুটছে স্নোক্যাট। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে বাহনের উপর আছড়ে পড়তে থাকা বরফের পরিমাণ, বড় চাঁই নেমে আসাটা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

তাও হাল ছাড়ল না রানা, অ্যাকসেলারেটর চেপে এগিয়ে নিয়ে চলল বাহনটাকে। পঞ্চাশ গজের মত যেতেই স্টিলের ভারী একজোড়া দরজা পড়ল, মরিয়ার মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্নোক্যাট। ধাতব সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ হলো, তুবড়ে গেল স্নোক্যাটের নাক, কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো দরজার পাল্লাদুটো। বেঁকে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত, কবজা থেকে ছিঁড়ে ছিটকে গেল দূরে। ড্যাশবোর্ড আর চেসিসের গায়ে বাড়ি খেয়ে তখন আরোহীদের অচেতন দশা।

কয়েক মিনিট পর সচেতন হয়ে উঠল রানা। উঠে বসল সিটে। থেমে গেছে টানেলধসের বুক-কাঁপানো আওয়াজ। যক্ষ্মারোগীর মত অনবরত কেশে চলেছে শুধু ওদের বাহন। ইগনিশন-কি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও। তাকাল পিছনে।

শেষ হয়েছে টানেলের ধস। পেরিয়ে আসা পঞ্চাশ গজ জায়গা এখন পুরোপুরি বরফের দখলে। কপালে হাত দিল রানা, স্টিয়ারিঙের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ফুলে গেছে একটা পাশ। বাকিদের দিকে ফিরল। 'সবাই ঠিক আছেন?'

'কীসের ঠিক?' ককিয়ে উঠে বলল ম্যাসন। কপালের ব্যাণ্ডেজ চুইয়ে রক্ত পড়ছে তার। 'আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'উঁহুঁ, দুঃসাহসী,' পিছন থেকে বলল গ্রিন। 'নাইস জব, মি. রানা।'

'প্রশংসা-ট্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বিব্রত কণ্ঠে বলল রানা। 'চলুন আগে বেরোই এখান থেকে।'

উইণ্ডশিল্ড ভেঙে গেছে সংঘর্ষে, ওখানকার ফাঁক গলে হুডের উপর দিয়ে পিছলে নেমে এল সবাই। পিছনদিকে তাকাল ডেভ পার্ল। শিস দিয়ে বলল, 'চমৎকার! এখানে পৌঁছুতে হলে যথেষ্ট খাটতে হবে ওই শুয়োরগুলোকে!' রানার দিকে ফিরল। 'ধসটা কি ইচ্ছে করে নামিয়েছেন?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা স্রেফ ভাগ্য।'

'যা-ই হোক, কাজের কাজ হয়েছে একটা।'

'চলুন এগোনো যাক,' বলল গ্রিন। 'রেকেজটা রাশানদের ঠেকিয়ে রাখবে বটে, কিন্তু অনন্তকাল নয়। তার আগেই ভাল দেখে একটা ডিফেন্সিভ পজিশনে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। বেইসের লোকজনকেও সরিয়ে নিতে হবে নিরাপদ জায়গায়।'

প্যাসেজ ধরে পা চালাল পাঁচজনে। রানার পাশে চলে এল গ্রিন। ইতিমধ্যে দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। ওর হাতে একটা নাইন মিলিমিটার বেরেটা পিস্তল গুঁজে দিয়ে বলল, 'চালাতে জানেন তো?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি আর্মিতে ছিলাম... রিটায়ার্ড মেজর।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গ্রিন। 'তাই তো বলি... এনিওয়ে, আপনি সঙ্গে থাকায় খুব ভাল লাগছে এখন।'

'শুনে খুশি হলাম।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। যাক, এখন আর ওকে শত্রু ভাবছে না লোকটা।

প্যাসেজ পেরিয়ে একটু পরেই টপ লেভেলের বৃত্তাকার কমন এরিয়ায় বেরিয়ে এল ওরা। সবকিছু অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে ওখানে। টেবিলের উপরে আধ-খাওয়া প্লেট-গ্লাস... উল্টে পড়ে আছে কতগুলো চেয়ার। দ্রুত আশপাশের সবগুলো কামরা

চেক করা হলো। শূন্য। কেউ নেই।

'কোথায় সবাই?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল ম্যাসন।

জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল গ্রিন। সবাইকে নিয়ে নেমে এল দুই নম্বর লেভেলে। এখানেও একই অবস্থা। খাঁ খাঁ করছে সব কামরা, একজন মানুষও নেই।

'কেউ নেই এখানেও!' হতভম্ব গলায় বলল পেটি অফিসার লয়েড। 'কিন্তু গেল কোথায়? কীভাবে?'

'পোলার সেন্টিনেল,' অনুমান করল গ্রিন। 'নিশ্চয়ই বিপদ টের পেয়ে নিয়ে গেছে সবাইকে।'

'আপনাদের সাবমেরিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল গ্রিন।

'এটা কোনও কথা হলো?' বিরক্ত গলায় বলল ম্যাসন। 'এত বিপদ মাথায় নিয়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিতে এলাম আমরা... অথচ ওরা দেখছি বহু আগেই পাততাড়ি গুটিয়েছে!'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনি তাতে অসন্তুষ্ট? ওরা এখানে আটকা পড়লে খুশি হতেন?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল ম্যাসন। 'ওদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে আমরাই আটকা পড়ে গেলাম কিনা...'

'আটকা আমরা এমনিতেও পড়তাম। যাবার কোনও জায়গা তো ছিল না আমাদের।'

'তাও অবশ্য ঠিক।'

'আমরা এখন কী করব, স্যর?' লেঃ গ্রিনকে জিজ্ঞেস করল পার্ল।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল গ্রিন। 'তিন নম্বর লেভেলে পুরনো একটা ওয়েপনস্ লকার আছে। গ্রেনেড, পুরনো রাইফেল... যতটা পারা যায় সংগ্রহ করব আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইল ম্যাসন।

গা-ঢাকা দেব। টিকে থাকার চেষ্টা করব।'

'আপনার প্ল্যানের দ্বিতীয় অংশটা আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল রানা।

তিন নম্বর লেভেলে মাত্র পা রেখেছে ওরা, এমন সময় ভেসে এল গুলিবর্ষণের আওয়াজ। অস্পষ্ট। উপর থেকে নয়, শব্দটা আসছে নীচ থেকে!

'গড!' বলল লয়েড। 'এখনও কেউ আছে এখানে!'

'মনে হচ্ছে ঠিক নীচের লেভেল থেকে আসছে শব্দটা,' বলল রানা।

'চলুন সবাই!' উত্তেজিত গলায় বলল গ্রিন।

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল পাঁচজনে, আর তখুনি বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো বেইস। এবার আওয়াজ এসেছে উপর থেকে। থমকে গেল সবাই।

'রাশানরা এসে গেছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এন্ট্রান্স খোলার জন্য এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করছে ওরা।'

'কুইক!' বলে হুড়মুড় করে নামতে থাকল গ্রিন। তাকে অনুসরণ করল বাকিরা।

চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে এল উপর দিক থেকে। শোনা গেল রাশান ভাষায় তর্জন-গর্জন। ধাতব মেঝেতে প্রতিধ্বনি উঠল পদশব্দের। সিঁড়ি থেকে প্রায় উড়ে এসে চার নম্বর লেভেলে নামল সবাই।

দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাল রানা। জায়গাটা অন্যরকম। মাঝখানের বৃত্তাকার অংশ খালি, কোনও আসবাবপত্র নেই। দু'পাশে দুটো দরজা। একটা বন্ধ, অন্যটা সামান্য ফাঁকা হয়ে আছে।

ফাঁকা হয়ে থাকা দরজাটার দিকে আঙুল তুলল পার্ল। 'স্নেক পিট!'

'ঠিক বলেছ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গ্রিন। 'লুকানোর জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। ওটা স্রেফ একটা গোলকধাঁধা!'

ছুটল সবাই ওদিকে।

'কিন্তু গুলি ছুঁড়ছিল কে?' দৌড়াতে দৌড়াতে জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

রানার মনেও একই প্রশ্ন।

শব্দ করে থুতু ফেলল গ্রিন। বলল, 'প্রার্থনা করুন যাতে আমাদেরই কেউ হয়।'

তার কথার অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না রানার। অস্ত্রধারী আরও কয়েকজনকে পাওয়া গেলে দলে ভারী হবে ওরা। লড়াই করতে পারবে। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে।

নীচে এখনও পৌঁছায়নি রাশানরা। তা হলে কার সঙ্গে গোলাগুলি করছে ওরা?

আটাশ

শ্যারনের লুকানোর জায়গার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে গ্রেণ্ডেল। হাঁ হয়ে আছে মুখ, দেখা যাচ্ছে রক্তমাখা ধারালো দাঁতের সারি। হাতের থাবায় লেগে আছে মেগানের ছেঁড়া স্কিনসুটের একটা অংশ।

ফাটলের আরও ভিতরে সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল শ্যারন,

হঠাৎ আল্ট্রাসোনিক সাউণ্ডের কম্পন অনুভব করল। কেঁপে উঠল চোয়ালের হাড়, শিরশিরে অনুভূতি হলো দাঁতের গোড়ায়, সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের লোম। স্থির হয়ে গেল ও, যেন একজোড়া হেডলাইট এসে পড়েছে ওর গায়ে।

মনে-প্রাণে প্রার্থনা করছে শ্যারন—আর যেন না এগোয় দানবটা। দম আটকে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ফুসফুস, চোখের সামনে লাল-নীল তারা দেখছে ও। কপাল ও গাল বেয়ে নামছে চিকন ঘামের ধারা।

ফাটলের এক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল গ্রেণ্ডেল। পিছন দিক থেকে আলো আসায় চেহারার খুঁটিনাটি ঢাকা পড়ে গেছে, ফুটে উঠেছে শুধু অবয়বটা। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে বরফের গায়ে প্রতিফলিত আভায়—সেখানে খেলা করছে প্রাণহীন, শীতল দৃষ্টি। ওদিকে তাকিয়ে শ্যারন পরিষ্কার বুঝল, মরতে চলেছে ও।

তারপর... হঠাৎ... ঝট্ করে মাথা ঘোরাল দানব। তাকাল গুহায় ঢোকার সুড়ঙ্গের দিকে। ওটাকে নড়তে দেখে বুক ধক করে উঠল শ্যারনের, নিজের অজান্তে ফোঁস করে ছেড়ে দিল দম... পরক্ষণে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল—ওর উপস্থিতি নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে গেছে!

কিন্তু ওকে অগ্রাহ্য করল দানব, পুরোপুরি ঘুরে গেল সুড়ঙ্গের দিকে। একপাশে মাথা কাত করতে দেখে মনে হলো কিছু শোনার চেষ্টা করছে। কী সেটা, জানার উপায় নেই শ্যারনের। হতে পারে কেউ আসছে সুড়ঙ্গ ধরে... কিংবা বেনটন হয়তো এখনও জীবিত, চিৎকার করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। ব্যাপার যা-ই হোক, মেঝেতে কয়েকবার লেজ ঝাপটাল গ্রেণ্ডেল, তারপর তীরের বেগে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে।

দীর্ঘ কয়েক মিনিট ফাটলের মধ্যে অপেক্ষা করল শ্যারন, তারপর বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না,

ফাটল থেকে বেরুতেই টলে উঠল, পড়ে গেল মেঝেতে। তাই বলে থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল সুড়ঙ্গের দিকে। এই মৃত্যুকূপে আর এক মুহূর্তও থাকতে রাজি নয়। মরতে হলে বাইরে গিয়ে মরবে।

চোখ-কান খোলা রাখল শ্যারন, কিন্তু দানবটার ছায়াও দেখল না কোথাও। ঢালু সুড়ঙ্গ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো ও। একটু পর পৌঁছে গেল সুড়ঙ্গের শেষ মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে বের হলো না ওখান থেকে, সাবধানে শুধু মাথা বের করল, উঁকি দিল বাইরে। গ্রেণ্ডেলটাকে দেখতে পেল এবার। বাঁ দিকের দেয়াল বেয়ে খুব দ্রুত উপরদিকে উঠছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খাদের কিনারা টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হচ্ছে নতুন কোনও শিকারের খোঁজ পেয়েছে।

চোখ ঘোরাল শ্যারন। দেয়াল ঘেঁষে এখনও ঝুলছে ওর দড়িটা। স্থির, খসে পড়েনি। শেষবার যখন দেখেছিল, তখন ওটা বাঁধা ছিল ড. বেনটনের গায়ে। এখনও কি আছে? জানার উপায় একটাই।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল ও। কাছে গিয়ে দু'হাতে শক্ত করে ধরল দড়িটা, টানাটানি করল কয়েক দফা। খুলে পড়ল না ওটা, মনে হচ্ছে ওর ওজন নিতে পারবে। আর দেরি করল না শ্যারন, দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। খাদের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ওজন ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর শরীরে শক্তি জোগাচ্ছে, ক্লান্তি স্পর্শ করছে না ওকে। কয়েক সেকেণ্ডেই উঠে এল উপরে।

খাদের কিনারে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই জেফরি বেনটনের ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখতে পেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল ও। মেগানের মত দশা হয়েছে জিয়োলজিস্টের। পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে, পেটের জায়গায় মস্ত এক গর্ত—ভিতরের

নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলা হয়েছে। রক্তের মোটা ধারা নেমে এসেছে সবগুলো ক্ষত থেকে, আর সেটাই বাঁচিয়েছে শ্যারনকে। চরম শীতল তাপমাত্রার কারণে জমে বরফ হয়ে গেছে রক্ত, আটকে ফেলেছে দেহটাকে। দড়ির গোড়ায় নোঙরের মত কাজ করেছে বেনটনের জমাট বাঁধা লাশ।

চোখ মুদে বিড়বিড় করে নিহত সঙ্গীর জন্য প্রার্থনা করল শ্যারন, কাঁদছে নিঃশব্দে। প্রার্থনা শেষ হলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল লাশের দিকে, মাথা থেকে খুলে নিল মাইনিং হেলমেটটা। আলো প্রয়োজন ওর—হেডল্যাম্পটা কাজে লাগাতে পারবে। হেলমেট খুলতে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে পেল বেনটনের চেহারা। মুখের একপাশ অদৃশ্য, থাবা দিয়ে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে মাংস, উঁকি দিচ্ছে খুলির হাড়। গলাও দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে থাবা মেরে। পুরো মুখে কালচে বরফের প্রলেপ—জমাট বাঁধা রক্ত। শিউরে উঠল শ্যারন। হেলমেট নিয়ে পিছিয়ে এল কয়েক পা। ঘুরে দাঁড়াল।

হেলমেটটা মাথায় পরল শ্যারন—একটু বড় হলো ওটা, কাত হয়ে রইল একপাশে। হেডল্যাম্পটা সোজা করে খাদের পাশের টানেলে আলো ফেলল। দানবটাকে দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় মেঝেতে চকচক করে উঠল কী যেন।

ছোট একটা আইস অ্যাক্স—ড. বেনটনের জিনিস। বোধহয় ওটার সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। লড়াইয়ের ফাঁকে পড়ে গেছে হাত থেকে। কুঠারটা কুড়িয়ে নিল শ্যারন—হয়তো গ্রেণ্ডেলকে ঠেকানো যাবে না, তবু একটা অস্ত্র তো!

টানেলের দিকে কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল ও। একটা কথা মনে পড়ে গেছে... বেনটনের বলা কথা। একাকী মেগানের খোঁজে রওনা হতে যাচ্ছিল সে, বাধা দেয়ায় বলেছিল,

বেইসের সবাই ব্যস্ত। সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল একটা বাক্য—*তা ছাড়া... ওয়াকি-টকি আছে আমার সঙ্গে!*

উল্টো ঘুরল শ্যারন। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল জিয়োলজিস্টের লাশের পাশে। ত্রস্ত হাতে তল্লাশি চালাল। কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেল যন্ত্রটা। ওটা খুলে হাতে নিল ও। ফ্রিকোয়েন্সি চেক করল, তারপর চাপ দিল ট্রান্সমিট বাটনে। লাল একটা বাতি জ্বলে উঠল ওয়াকি-টকির গায়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ড. শ্যারন বেকেট বলছি। যদি কেউ আমার কথা শুনতে পান, তা হলে জেনে রাখুন—স্নেক পিটের অচেনা একটা অংশে আটকা পড়েছি আমি। বড় আকারের একটা শিকারি পশুর কবলে পড়েছি। মেগান গুড আর ড. জেফরি বেনটনকে খুন করেছে ওটা। এবার আমার পালা। আশপাশেই কোথাও আছে পশুটা... ঠিক কোথায়, তা বলতে পারব না। আমি চেষ্টা করছি বেইসের মূল অংশে পৌঁছুনোর। প্লিজ... সাহায্য করুন আমাকে। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসবেন, প্রাণীটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র। মার্কিং করা কোনও টানেলে পৌঁছুতে পারলে আমি নিজের সঠিক লোকেশন জানাব। ওভার।'

ওয়াকি-টকির স্পিকারের উপর একটা আঙুল ছোঁয়াল শ্যারন। কেউ যদি জবাব দেয়, তা হলে হয়তো সেটা শুনতে পাবে না, কিন্তু আঙুলের ডগায় ভাইব্রেশন অনুভব করবে। কায়োমনোবাক্যে প্রার্থনা করল ও—জবাব দিক কেউ, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না। নিথর হয়ে রইল রেডিও।

একটু অপেক্ষা করে আবারও সাহায্য চাইল ও। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও হেরফের হলো না তাতে। কী আর করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল শ্যারন। ঘুরে মুখোমুখি হলো অন্ধকার টানেলের। হেডল্যাম্পের আলো ভিতরের ছায়া দূর করতে পারছে না... পারছে না ওর ভয় দূর করতে। অথচ কিছুই

করার নেই। এক হাতে ওয়াকি-টকি রাখল ও, অন্যহাতে আইস অ্যাক্স। তারপর দুরু দুরু বুকে এগোল সামনে।

নিজের চেষ্টায় উদ্ধার পেতে হবে ওকে।

সাবমেরিন ড্রাকনের পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন আন্তন রুশকিন। পরনে সবুজ রঙের ব্যাটল ইউনিফর্ম, পায়ে বুট। সন্তুষ্ট সে, এখন পর্যন্ত চমৎকার কাজ দেখিয়ে চলেছে তার ছেলেরা। রিপোর্ট আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, কোথাও কোনও ঝামেলা নেই।

তারপরেও কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না রুশকিন। আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেল দখল করা হয়েছে, কিন্তু স্নোক্যাট নিয়ে ওখানে ঢুকে পড়া আমেরিকানদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাঁচজনের ছোট একটা গ্রুপ, নিরাপত্তার জন্য বড় কোনও হুমকি নয়, তবু সে নির্দেশ দিয়েছে—যে-কোনও মূল্যে ওদেরকে আটক করা চাই। আশা করা যায় খুব শীঘ্রি ধরা পড়বে লোকগুলো। এ-ছাড়া বাকি স্টেশন সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। আধঘণ্টা আগে হাইড্রোফোনে দ্বিতীয় একটা সাবমেরিনের ব্যালাস্টের আওয়াজ পেয়েছিল ওরা, সম্ভবত ওটাতে চেপেই কেটে পড়েছে সবাই।

প্রতিপক্ষের পরিচয় জানে রুশকিন—আমেরিকান এক রিসার্চ সাবমেরিন... *ইউএসএস পোলার সেন্টিনেল*। হুমকি নয় ওটা তাদের জন্য। ডুবোজাহাজটা পরীক্ষামূলক মডেলের, নিরস্ত্র। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লেজ তুলে পালাচ্ছে মেইনল্যাণ্ডের দিকে। তাড়া করতে নিষেধ করেছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভ।

ড্রাকনের প্রাইমারি মিশন হলো আইস স্টেশন গ্রেণ্ডেলের দখল নেয়া, এবং ওখানে একটা কমিউনিকেশন সেট স্থাপন করা। এরপর আবার ডাইভ দেবে ড্রাকন, আশপাশে টহল দেবে নতুন কোনও প্রতিপক্ষ উদয় হলে তাদেরকে ঠেকানোর জন্য। অবশ্য

এ-নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করছে না ক্যাপ্টেন। প্ল্যান অনুসারে মাত্র বারো ঘণ্টা চলবে এই অপারেশন। এর মাঝে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেবে তারা। আশা করা যায়, প্রুডো বে-র দুর্ঘটনা ততক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখবে আমেরিকান নৌবাহিনীকে।

'ক্যাপ্টেন?' রেডিওম্যানের ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল রুশকিন। 'ওমেগা স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। ওরা একটা ট্রান্সমিটার মেরামত করেছে।'

'সুসংবাদ,' বলল রুশকিন। নেমে এল পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ড থেকে। রেডিও সেটের হেডফোন কানে ঠেকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন রুশকিন বলছি। রিয়াল অ্যাডমিরাল নিকোলায়েভের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন,' স্ট্যাটিক ভেদ করে শোনা গেল ওপাশের অপারেটরের গলা। 'আমি খবর দিচ্ছি অ্যাডমিরালকে।'

অপেক্ষা করার ফাঁকে কথা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল রুশকিন। ওরা যখন এদিকে এসেছে, তখন পিছনে রয়ে গেছেন নিকোলায়েভ। ওমেগা স্টেশনের বন্দিদেরকে ইণ্টারোগেট করবেন, তল্লাশি চালাবেন ওখানে। নিশ্চিত হতে চাইছেন—যে-জিনিসের খোঁজে তাঁরা এসেছেন, তা ইতিমধ্যেই ড্রিফট স্টেশনে স্থানান্তর করা হয়েছে কি না।

এমন একাগ্র এবং শান্ত মানুষ আগে কখনও দেখেনি রুশকিন। [illegible] সব সিদ্ধান্ত দেন ঠাণ্ডা মাথায়, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায় না তাঁর ভিতরে। এই শীতলতার সামনে আর্কটিকের তাপমাত্রাও হার মানবে। *সাদা প্রেত* বলে যে-ডাকনাম আছে রিয়ার অ্যাডমিরালের, তা বড়ই মানানসই। জলজ্যান্ত একটা ভূতকে দেখলে যতটা ভয় পাবে ক্যাপ্টেন, তার চেয়ে কোনও অংশেই কম ভয় পাচ্ছে না তাঁকে। দশদিন আগে... যখন এই মিশন পেল রুশকিন... যখন জানল, নর্দার্ন ফ্লিট

কমাণ্ডারকে নিয়ে অভিযানে যেতে হবে ওকে... বড়ই খুশি হয়েছিল, সম্মানিত বোধ করেছিল। করুণা অনুভব করেছিল সমসাময়িক কলিগদের প্রতি—এমন সুযোগ ওদের কপালে জোটেনি বলে। কিন্তু... দশদিনের মাথায় পুরো উল্টো অনুভূতি কাজ করছে তার ভিতরে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, নিকোলায়েভ জাহাজে না থাকায় স্বস্তি লাগছে তার।

স্পিকারে খড়খড় আওয়াজ হতেই সংবিৎ ফিরে পেল ক্যাপ্টেন। শোনা গেল রিয়ার অ্যাডমিরালের পরিচিত কণ্ঠ—বরাবরের মত নিরুত্তাপ, আবেগহীন।

'ক্যাপ্টেন, স্ট্যাটাস কী তোমাদের?' জানতে চাইলেন নিকোলায়েভ।

'আইস স্টেশনের দখল নিয়েছি আমরা, স্যর,' ঢোক গিলে বলল রুশকিন। 'আপনার অনুমানই সত্যি। আমরা পৌঁছুনোর আগেই ভিতরের লোকজন পালিয়ে গেছে। তবে নতুন পাঁচজন ঢুকেছে ওখানে... ওদেরকে খুঁজছি আমরা।' সংক্ষেপে স্নোক্যাট সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা দিল সে। তারপর বলল, 'স্ট্রাইক টিমের জনবল বাড়িয়ে দিয়েছি আমি—মোট বিশজন গেছে লেভেল-বাই-লেভেল সুইপ চালাবার জন্য। আশা করি খুব শীঘ্রি আপনার মুভমেন্টের জন্য গ্রিন সিগনাল দিতে পারব।'

'গ্রিন সিগনালের প্রয়োজন নেই। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। নিউক্লিয়ার চার্জটা কি অফলোড করা হয়েছে?'

'জী, স্যর।' রুশকিনের চোখের সামনে ভাসছে টাইটেনিয়ামের গোলকটার চেহারা। নিকোলায়েভের নির্দেশ অনুসারে বেইসের সবচেয়ে নীচের লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটা, আটকে দেয়া হয়েছে মেঝেতে। 'কিন্তু স্যর... আপনার এখুনি আসার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। এখনও শত্রুপক্ষের লোক আছে ভিতরে, ওদেরকে বন্দি না করা পর্যন্ত জায়গাটা

ঝুঁকিপূর্ণ...'

'ওই পাঁচজন আমেরিকানকে ধরতে পারলে কি না-পারলে, তাতে কিছু যায়-আসে না,' রুক্ষ গলায় তাকে থামিয়ে দিলেন নিকোলায়েভ। 'লক ডাউন দ্য বেইস। বিশেষ করে চার নম্বর লেভেল... ওটার ধারেকাছে যেন ঘেঁষতে না পারে কেউ। আমি হোভারক্র্যাফট টিমের সঙ্গে আসছি। তুমি এখুনি ড্রাকনকে নিয়ে ডাইভ দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাট্রোলিং শুরু করা দরকার। বিকেল চারটায় গ্রেগুলে আবার রন্দিভু, ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যর!' ঘড়ি দেখল রুশকিন। তিন ঘণ্টার মত টহল দিতে হবে তাকে। 'ঠিক বিকেল চারটায় আবার ভেসে উঠব আমরা।'

'খুব ভাল।' থেমে গেল স্ট্যাটিকের আওয়াজ, ইথারে মিলিয়ে গেল সাদা প্রেতের কণ্ঠ।

রেডিওম্যানের দিকে ফিরল রুশকিন। 'স্ট্রাইক টিমের লিডারের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'জী, স্যর।' কমিউনিকেশন সেটের নব আর ডায়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেডিওম্যান।

সোনার স্টেশনের দিক থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনের আওয়াজে ঘাড় ফেরাল ক্যাপ্টেন। কী নিয়ে যেন তর্ক করছে ওরা, উত্তেজিত।

ওদের দিকে এগিয়ে গেল রুশকিন। 'কী হয়েছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোনার চিফ। বলল, 'অদ্ভুত কিছু রিডিং পাচ্ছি আমরা, স্যর। এর কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কী ধরনের রিডিং?'

'মাল্টিপল অ্যাকটিভ সোনার সিগনাল। বেশ দুর্বল।'

'কোত্থেকে আসছে?' ভুরু কোঁচকাল রুশকিন। দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছে। একাধিক সিগনাল মানে একাধিক উৎস। হয়তো

আমেরিকান নেভির অ্যাটাক সাবমেরিন এসে পড়েছে, সঙ্গে সারফেস শিপও থাকতে পারে।

'ওটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, স্যার।' ক্যাপ্টেনকে অবাক করে দিল সোনার চিফ। 'সিগনালগুলো আসছে আইস স্টেশনের অভ্যন্তর থেকে!'

উনত্রিশ

পিস্তল হাতে লেফটেন্যান্ট গ্রিনের পিছু পিছু স্নেক পিটে ঢুকল রানা, আইস স্টেশনের পরিকল্পিত নির্মাণশৈলী পেরিয়ে পা রাখল খেয়ালি প্রকৃতির বুকে। ওর পাশে হাঁটছে ম্যাসন, পিছনে রয়েছে সিম্যান ডেভ পার্ল আর পেটি অফিসার লয়েড। টানেল ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে পথ দেখাচ্ছে গ্রিন, এণ্ট্রান্সের বাইরে ওই একটাই ফ্ল্যাশলাইট পাওয়া গেছে। ভেজা, মসৃণ দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো—কালচে বরফ পাচ্ছে নীল আভা। রানার মনে হলো বরফের তৈরি একটা ভাস্কর্যের ভিতর ছোটাছুটি করছে ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ম্যাসন।

'আরও কেউ আছে এখানে,' বলল গ্রিন। 'ওদের সঙ্গে যোগ দেব আমরা।'

'এই স্নেক পিট কত বড়?' জানতে চাইল রানা। ইতিমধ্যে

টানেল নেটওয়ার্কের ডাকনাম জানতে পেরেছে ও।

'যথেষ্ট বড়,' সংক্ষেপে জবাব দিল গ্রিন। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। একটু পরেই ছোট ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল। তাল মেলানোর জন্য দৌড়াতে হলো বাকিদেরও। রাশানরা বেশি পিছনে নেই। দূরত্ব বাড়িয়ে নেয়া দরকার... কোন্‌দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

সরলরেখায় এগোল না ওরা. ধাওয়াকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য বার বার ঢুকে পড়ল শাখা টানেলে। এলোমেলো পথে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে বরফ-দ্বীপের গভীরে। বড় একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুতেই আবার শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ। থমকে দাঁড়াল ওরা।

ফ্যাল ফ্যাল করে চারপাশের গুহামুখগুলোর দিকে তাকাল লয়েড। 'কোন্‌দিক থেকে এল শব্দটা?'

জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক মুহূর্ত পর। ডানদিকের একটা টানেলে উদয় হলো আলোর আভা—লাফঝাঁপ দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আবারও গুলির আওয়াজ হলো... এবার খুব কাছ থেকে। বদ্ধ টানেলে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

'ওই যে, ওদিকে!' বলল রানা। ঘুরে গেল ও. হাতের পিস্তল তাক করল আলোর দিকে।

চেঁচামেচি শোনা গেল এবার। গ্রিন ও তার সঙ্গীরাও এবার অস্ত্র তুলল—বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। আলোর পটভূমিতে দৌড়াতে থাকা একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল ওদের। ইন্টারসেকশনের কাছে পৌঁছুলে দেখা গেল মানুষটার চেহারা। অল্পবয়েসী এক তরুণ... পাগলের মত ছুটছে। সামরিক বাহিনীর কেউ নয়—মাথায় লম্বা বাবরি চুল, গায়ে সিভিলিয়ান পারকা। চেহারা দেখে মনে হলো মস্ত বিপদে পড়েছে সে।

অস্ত্রহাতে পাঁচজন মানুষকে দেখে থমকে দাঁড়াবে

তরুণ—এমনটাই ভেবেছিল সবাই। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে দিয়ে দৌড় অব্যাহত রাখল সে। ভিড়কে পাশ কাটিয়ে ছুটল পিছনের টানেলের দিকে। পার হবার সময় ওদেরকে শুধু বলল, 'পালান!'

আরও মানুষ উদয় হলো তার পিছু পিছু। বয়স্ক এক বিজ্ঞানী, সঙ্গে দুই তরুণ-তরুণী। তাদের অনুসরণ করছে নেভির ইউনিফর্ম পরা এক মেয়ে।

'লিসা!' মেয়েটাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল গ্রিন।

কুশল বিনিময়ের মুডে নেই লেঃ লিসা। খেঁকিয়ে উঠল, 'ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না, মাইকেল। দৌড়াও।'

দলটার পিছনে আবারও শোনা গেল গুলির আওয়াজ। মাজল ফ্ল্যাশে আলোকিত হলো টানেলের অভ্যন্তর। ইউনিফর্ম পরা আরেকজন মানুষকে দেখতে পেল ওরা। পিছনদিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। টানেলমুখের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল সে। একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন।

'হোয়াট দ্য হেল...' বিস্মিত গলায় বলল গ্রিন। 'হচ্ছেটা কী?'

হাঁটু গেড়ে বসা মানুষটার পিছনে... টানেলের গভীরে বিশাল একটা ছায়াকে নড়তে দেখল রানা। কী ওটা, বোঝা যাচ্ছে না। মানুষ নয়, এটুকু নিশ্চিত। তা হলে কী?

কনওয়ে আর দুই রিসার্চারকে নিয়ে ওদের কাছে পৌঁছে গেছে লিসা। থেমে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এই টানেল থেকে। এক্ষুণি!'

'সম্ভব না,' গ্রিন বলল। 'পিছনে রাশানরা আছে।'

'জাহান্নামে যাক রাশান কুত্তারা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিসা। 'আমাদের পিছনে আরও খারাপ জিনিস আসছে।'

ইউনিফর্ম পরা দ্বিতীয় মানুষটা ছুটতে শুরু করেছে। দৌড়ের মধ্যেই বদলে নিচ্ছে খালি ম্যাগাজিন।

'আমাদেরকে পালাতে হবে, মাইকেল!' জোর গলায় বলল লিসা।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল তরুণ লেফটেন্যান্ট। লয়েড আর পার্লের দিকে ফিরল। 'তোমরা... সিভিলিয়ানদের সরিয়ে নাও। এদিকটা আমরা দেখছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাসনের হাত ধরল লয়েড, তাকে নিয়ে পিছনের টানেলের দিকে ছুটল লিসা আর গবেষকদের পিছু পিছু। রানাকেও নিয়ে যেতে চাইছিল পার্ল, কিন্তু ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ও।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল পার্ল, শেষে জবরদস্তি না করার সিদ্ধান্ত নিল। কেউ সেধে মরতে চাইলে তার কী? গ্রিনকে শুধু জিজ্ঞেস করল, 'রাশানদের ব্যাপারে কী করব, স্যর?'

'স্নেক পিটের এগজিট পর্যন্ত নিয়ে যাও সবাইকে,' নির্দেশ দিল গ্রিন। 'ওখানেই অপেক্ষা কোরো আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল পার্ল, ছুট লাগাল বাকিদের পিছু পিছু।

ইউনিফর্ম পরা মানুষটা এসে গেছে। তাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল গ্রিন। 'কমাণ্ডার ফিশার!' পোলার সেন্টিনেলের এগজিকিউটিভ অফিসার এখানে কেন!

'গেট রেডি ফর সাপ্রেসিভ ফায়ার!' বলল ফিশার। অবাক হয়নি মোটেই, লেফটেন্যান্ট গ্রিনের উপস্থিতি যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

ফেলে আসা টানেলের দিকে হাঁটু গেড়ে বসল সে, কাঁধ বরাবর তুলল রাইফেল। দু'গজ পিছনে পজিশন নিল গ্রিন। ফ্ল্যাশলাইট তুলে দিল রানার হাতে, কমাণ্ডারের মাথার উপর দিয়ে নিজের রাইফেল তাক করল সে। সহজ ভঙ্গিতে ফিশারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। একহাতে আলো ফেলল টানেলের ভিতর,

অন্যহাতে তুলল নিজের হাতে ধরা পিস্তল।

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল ফিশার। 'আপনি আবার কে?'

'মাসুদ রানা... আপাতত আপনাদের সহযোদ্ধা,' হাসল রানা। 'বিস্তারিত পরিচয় নাহয় পরে হবে।'

'সেক্ষেত্রে... ওয়েলকাম টু দ্য পার্টি!' তিক্ত গলায় বলল ফিশার।

'কে আসছে ওদিক থেকে, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুঃস্বপ্ন!' থমথমে গলায় বলল ফিশার।

'পার্ডন?'

'একটু অপেক্ষা করুন। দেখলেই বুঝে যাবেন।'

ফ্ল্যাশলাইটের নাগালের বাইরে... টানেলের অন্ধকারে একজোড়া চোখ চকচক করে উঠতে দেখল রানা। পরক্ষণে বোঁ করে উঠল মাথা। শিরশিরে অনুভূতি হলো দাঁত আর চোয়ালে। আল্ট্রাসোনিকস্!

'আসছে ওরা!' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ফিশার।

আলোর মাঝখানে বিশালদেহী একটা দানব উদয় হলো এবার। ধবধবে সাদা চামড়া, শরীরে অনেকগুলো গুলির ক্ষত। ক্ষত থেকে গড়িয়ে নামছে লাল রক্ত, সাদা চামড়ার উপরে রক্তের ধারাকে দেখাচ্ছে লাল রঙা স্ট্রাইপের মত। হতভম্ব হয়ে গেল রানা। কী ওটা! এমন প্রাণী আগে কোনোদিন দেখেনি।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দানব, তারপরেই গর্জন করে ধেয়ে এল ওদের দিকে। ওটার পিছনে আরও কয়েকটা ছায়াকে নড়তে দেখল রানা। হাতের পিস্তলের দিকে চেয়ে বড্ড অসহায় মনে হলো নিজেকে। বিশালদেহী এই দানবের সামনে এই ছোট্ট বেরেটা কিছুই নয়।

আল্ট্রাসোনিকসের প্রবাহ জোরালো হয়ে উঠেছে। খুলির

ভিতরে মৌমাছির গুঞ্জন অনুভব করল ও। কমাণ্ডার ফিশার চেঁচিয়ে উঠল, 'ফায়ার!'

একসঙ্গে ট্রিগার চাপতে শুরু করল তিন সহযোদ্ধা। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে গেল ধাবমান দানবটার দিকে। সাদা শরীরটায় একের পর এক নতুন ক্ষত দেখা দিল... ছিটকে উঠল রক্ত আর মাংস, কিন্তু থামল না ওটা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এগোতেই থাকল।

'শালার ব্যাটা দেখি মরেই না!' খিস্তি করে উঠল গ্রিন।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা। দুই সঙ্গীর মত এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল না। তার বদলে সাবধানে নিশানা করল দানবের খোলা মুখ-গহ্বরটাকে। চেষ্টা করল ওটার মুখের ভিতরে গুলি ঢোকাতে। প্রাণীটা ছুটতে থাকায় সহজ হলো না সে-কাজ—উপর-নীচে উঠে যাচ্ছে বুলেট, কিংবা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। ম্যাগাজিনের শেষ বুলেট খরচ করার আগে মুহূর্তের বিরতি নিল ও, বড় করে শ্বাস নিয়ে স্থির করল নিশানা, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

এইবার হলো কাজ। খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে গেল ঘাতক বুলেট, বেরিয়ে গেল খুলি ফুটো করে। দানবের ঘাড়ের কাছে ছিটকে উঠল রক্ত মেশানো মগজ আর হাড়। ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেলো ওটা। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নড়ল না আর। বিশাল দেহ দিয়ে আটকে দিল টানেল। পিছনের দানবরা আর এগোতে পারছে না ওটাকে টপকে।

গুলিবর্ষণ থামিয়ে বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল ফিশার আর গ্রিন। প্রশংসার সুরে কমাণ্ডার বলল, 'নাইস শুটিং, মি. রানা।'

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল রানা। বলল, 'স্রেফ ভাগ্য, আর কিছু না।' পিস্তলটা দেখাল—ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে, হাঁ হয়ে আছে স্লাইড। 'ওটাই শেষ বুলেট ছিল।'

'বিনয় করছেন, না? আমরা রাইফেল দিয়ে যা করতে পারিনি,

আপনি ওই ছোট্ট বেরেটা দিয়ে তা করে ফেলেছেন! রিয়েলি ইম্প্রেসিভ।'

'এত প্রশংসা করবেন না। বিপদ এখনও কাটেনি।' আঙুল তুলে দানবের লাশটা দেখাল রানা। পিছনে জড়ো হয়েছে ওটার সঙ্গী-সাথীরা, চেষ্টা করছে সামনে এগোবার। 'কেটে পড়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন,' একমত হলো কমাণ্ডার ফিশার। 'চলুন যাওয়া যাক।'

পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল তিনজনে, উল্টোদিকের টানেলের দিকে যাচ্ছে—যেটা ধরে বিজ্ঞানী আর নৌ-সদস্যরা গেছে। লাশের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে ফিশার আর গ্রিন। হঠাৎ খড়খড় করে উঠল গ্রিনের কোমরের ওয়াকি-টকি। ট্রান্সমিট করছে কেউ। কিন্তু রিসেপশন দুর্বল হওয়ায় কথাগুলো বোঝা গেল না।

পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় রানার একটা হাত মুক্ত, বাড়তি কোনও ম্যাগাজিনও নেই। গ্রিন তাই বলল, 'মি. রানা, ওয়াকি-টকিটা একটু নেবেন? কে যোগাযোগ করছে, জানা দরকার। এই ফ্রিকোয়েন্সি শুধু আমরাই ব্যবহার করি।'

সেটটা তার বেল্ট থেকে খুলে নিল রানা। কান পাতল, কিন্তু শুনতে পেল না কিছু। ট্রান্সমিশন থেমে গেছে। ডাকাডাকি করল কয়েক দফা, তবে জবাব পাওয়া গেল না। হয়তো কোনও সমস্যা হয়েছে ওপাশে। ওর জানা নেই, অন্যপ্রান্তের মানুষটি শ্রবণশক্তিহীন, ওর গলা শুনতে পাচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ইন্টারসেকশন থেকে উল্টোদিকের টানেলে ঢুকে পড়েছে তিনজনে। দানবের নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে ফিশার বলল, 'এবার বোধহয় উল্টো ঘোরা যায়, ওরা আটকা পড়ে গেছে।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল লাশ। না, প্রাণ ফিরে পায়নি, পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পিছলে এগিয়ে এসেছে কয়েক ফুট।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল গ্রিন। দানবদের কৌশল বুঝতে পেরেছে। ধাক্কা দিয়ে লাশটাকে বের করে আনতে চাইছে ইন্টারসেকশনে—জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, লাশকে পাশ কাটিয়ে আবার এগোতে পারবে জীবিতরা।

'বড্ড তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে উঠেছিলেন আপনি,' তিক্ত গলায় বলল রানা কমাণ্ডারকে।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গাল দিয়ে উঠল ফিশার। বলল, 'পিছাতে থাকুন, নজর রাখুন শয়তানগুলোর দিকে।'

ঠিক তখুনি আবার বোঁ করে উঠল রানার মাথা। প্রথম দানবটা মারা যাবার পর কমে গিয়েছিল দাঁতের শিরশিরানি—এখন ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার ডানদিকের চোয়ালে কম্পন হচ্ছে বেশি। ভয়ানক একটা আশঙ্কা খেলা করে গেল ওর মাথায়। ঝট্ করে ডানদিকে মাথা ঘোরাল ও। ছোট্ট আরেকটা টানেলের মুখ দেখতে পাচ্ছে ওদিকে। রানা নজর ফেলতেই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠল নতুন একজোড়া চোখ।

আরেকটা দানব—ডানদিকের টানেল ধরে আসছে!

পাঁই করে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল রানা, পরিষ্কার দেখতে পেল জানোয়ারটাকে। সাদা চামড়ায় ঢাকা সাক্ষাৎ এক মৃত্যুদূত। গায়ে আলো পড়তেই ভয়ানক বেগে ছুটে এল ওর দিকে। বিদ্যুৎবেগে হাত চালাল রানা, বেল্টে ওয়াকি-টকি গুঁজে বের করে আনল পিস্তল—ওটা যে খালি, সে-কথা ভুলেই গেছে। ট্রিগার চাপল ও, খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার।

স্থির হয়ে গেল রানা। মৃত্যু এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

অন্ধকার টানেল ধরে ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে শ্যারন। জানে না গ্রেণ্ডেলটা কোথায় গেছে... কেন গেছে তা-ও বলতে পারবে না। হতে পারে, সামনের কোনও বাঁকের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে ওর জন্য। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকার উপায় নেই। এগোতেই হবে ওকে, চেষ্টা করতে হবে স্নেক পিট থেকে বেরিয়ে যাবার। মাইনিং হেলমেটের হেডল্যাম্পটাই ভরসা, ওটার ক্ষীণ আলোয় পথ চলেছে ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে সামনে।

হঠাৎ হেডল্যাম্পের আলোয় দেয়ালের গায়ে কী যেন চকচক করে উঠল। কমলা রঙের স্প্রে-পেইন্টে আঁকা একটা তীরচিহ্ন—মেগানের ট্রেইল মার্কার। উত্তেজনায় বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। দেয়াল ধরে আরও কিছুদূর এগোল শ্যারন, খেয়াল রাখছে নতুন কোনও মার্কার পাওয়া যায় কি না।

পাওয়া গেল। সবুজ রঙের একটা ত্রিভুজ। এখানেই আরেকটা ট্রেইলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মেগানের ট্রেইল। ফুঁপিয়ে উঠল শ্যারন—স্বস্তিতে... আনন্দে। স্নেক পিটের ম্যাপিং করা অংশে পৌঁছে গেছে ও। এখান থেকে সহজে চলে যেতে পারবে মূল বেইসে।

মুখের কাছে ওয়াকি-টকি এনে ট্রান্সমিট বাটন চাপল শ্যারন। বলল, 'কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন? আরেকটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছি আমি—সবুজ ত্রিভুজের। ওটা ধরে এগজিটের দিকে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ হলো জানোয়ারটার চিহ্ন দেখিনি, কিন্তু প্লিজ... সম্ভব হলে সাহায্য করুন আমাকে।'

কথা শেষ করে ওয়াকি-টকি অফ্ করে দিল ও। ব্যাটারি বাঁচানো দরকার। তারপর দ্রুত পা ফেলল সবুজ ত্রিভুজ দিয়ে মার্কিং করা প্যাসেজ ধরে। যত এগোল, ততই চেনা চেনা লাগল চারপাশ—টানেল নেটওয়ার্কের যে-সব অংশে গবেষণা চলছে, নিশ্চয়ই সেখানে পৌঁছে গেছে।

ঝুঁকি নিয়ে হেডল্যাম্প অফ করে দিল শ্যারন। চেনা জায়গা, অন্ধকারেও সম্ভবত এগোতে পারবে। শুধু শুধু ব্যাটারি খরচ করার মানে হয় না। পরে আবার কখন দরকার হয় আলো কে জানে। চোখে আঁধার সয়ে আসার জন্য কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। একটু পর ছায়ার গভীরতা আঁচ করতে পারল, টানেল কোন্‌দিকে গেছে না গেছে, বুঝতে পারছে এবার। একপাশের দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। আলোর কয়েকটা বিন্দু দেখতে পাচ্ছে দূরে। একটা স্থির... ফ্ল্যাশলাইট নিঃসন্দেহে... অন্যদুটো মিটমিট করছে রাতের আকাশের তারার মত। কী ওগুলো? মাজল ফ্ল্যাশ? গুলি করছে কেউ? ভাবনাটা শেষ হবার আগেই ছড়িয়ে গেল আলোর বিন্দু। মিটমিট করতে থাকা আলোগুলো ছুটল একদিকে... আর ফ্ল্যাশলাইট হাতের মানুষটা ছুট লাগাল ওরই দিকে। পাগলের মত দৌড়াচ্ছে সে, লাফালাফি করছে হাতের আলো। দূরত্ব কমছে ওর সঙ্গে, আলোটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

উদ্ধারকারী... নিশ্চয়ই উদ্ধারকারী! ভাবল শ্যারন। ওর ট্রান্সমিশন শুনতে পেয়েছে... অস্ত্রশস্ত্র-সহ এসেছে ওকে টানেল থেকে বের করে নিতে।

চিৎকার করে মানুষটাকে ডাকতে ইচ্ছে হলো শ্যারনের, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। আশপাশেই কোথাও আছে হিংস্র গ্রেণ্ডেল, চিৎকার দিলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু একটা সঙ্কেত তো দেয়া দরকার। ঝটপট হেডল্যাম্পটা জ্বেলে দিল।

কিন্তু ওর সঙ্কেত চোখে পড়ল না ছুটন্ত মানুষটার। তার হাতের শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটের মুখে হারিয়ে গেছে শ্যারনের ছোট্ট হেডল্যাম্পের ম্লান আলো। মোড় নিয়ে আরেকটা টানেলে ঢুকে গেল সে। হারিয়ে গেল ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যারন। হেডল্যাম্প নেভাবে কি না ভাবল, কিন্তু সাহস পেল না। তা ছাড়া আলো দেখে ওর খোঁজও পেতে পারে উদ্ধারকারীরা। তাড়াহুড়ো করে সামনে এগোল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে দেয়ালে, সবুজ ত্রিভুজের চিহ্ন যেন মিস না করে। ট্রেইলে থাকতে পারলে নিশ্চয়ই দেখা পাবে উদ্ধারকারীদের।

হাঁটতে হাঁটতে আবার ওয়াকি-টকি অন্ করল শ্যারন। কথা বলতে শুরু করল অচেনা মানুষগুলোর উদ্দেশে।

'...সবুজ ত্রিভুজের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি আমি। একটু আগে দেখতে পেয়েছি তিনজনকে। যদি আমার কথা শুনতে পান, তা হলে ট্রেইলে ফিরে আসুন। সাবধানে এগোবেন। গ্রেণ্ডেলটা আশপাশেই কোথাও আছে...'

রানার কোমরে ঝোলানো ওয়াকি-টকির স্পিকারে শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠ। কিন্তু জবাব দেবার মত অবস্থায় নেই ও, প্রাণ হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। পিছনেই কোথাও আছে ভয়ঙ্কর দানবটা, বরফে পা ফেলার পরিষ্কার আওয়াজ শুনেছে ও।

স্রেফ কপাল বলতে হবে, দানবের প্রথম হামলা থেকে বেঁচে গেছে রানা। প্রাণীটাকে ছুটে আসতে দেখে একপাশে ঝাঁপ দিয়েছিল, আর তখুনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ফিশার আর গ্রিন। গুলি করেছিল ওটাকে লক্ষ্য করে। বুলেটের অতর্কিত আঘাতে ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রাণীটা, ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। রানার নিরস্ত্র দশা সম্পর্কে সচেতন ছিল ফিশার, চেঁচিয়ে ওকে সরে যেতে বলেছে, পিছন থেকে কাভার দেবে ওরা। পরামর্শটা মেনে নিয়েছে ও, ছুট লাগিয়েছে আরেক পাশের টানেল ধরে। একটু পরেই ওয়াকি-টকিতে শোনা গেছে নারীকণ্ঠ। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই রানার। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও দুই সঙ্গীর কাছ

থেকে... এবং যদ্দূর বুঝতে পারছে, শিকার হিসেবে সশস্ত্র দুই নেভাল অফিসারের চেয়ে নিরস্ত্র-নিঃসঙ্গ মানুষটাকেই বেশি পছন্দ হয়েছে দানবের। ধাওয়া করেছে ওকে।

পাগলের মত এখন টানেল ধরে দৌড়াচ্ছে রানা। প্রতিরোধ গড়ার উপায় নেই—বুলেটহীন একটা পিস্তল আর ফ্ল্যাশলাইট ছাড়া কিছুই নেই ওর কাছে। কাজেই নিজের গতি কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করছে শত্রুকে পিছনে ফেলতে। টানেলের গোলকধাঁধার ভিতরে দানবটাকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছে।

ভেজা, পিচ্ছিল মেঝেতে কয়েক দফা আছাড় খেলো ও; পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল। ব্যথা-বেদনা নিয়ে মাথা ঘামাল না, উঠেই আবার দৌড়। কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কিছুই জানে না। টানেল নেটওয়ার্কের পুরোটাই ওর অচেনা। দেয়ালে মার্কিং আছে বলে শুনেছে, কিন্তু ওদিকে তাকাবার সময় কোথায়?

বড় একটা বাঁক পেরুতেই নতুন একটা ইণ্টারসেকশনে পৌঁছুল রানা। সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে টানেলে। বাঁয়ের মুখটার পাশে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করে থমকে দাঁড়াল। আলো ফেলল ওখানে। স্প্রে-পেইণ্টে আঁকা সবুজ রঙের একটা ত্রিভুজ উদ্ভাসিত হলো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

ট্রেইল মার্কার! এটার কথাই রেডিওতে বলছিল অচেনা মেয়েটি।

সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করল না রানা, ঢুকে পড়ল ওই টানেলে। অচেনা টানেলে একাকী ছোটাছুটি করার চেয়ে একজন সঙ্গী ঢের ভাল। তা ছাড়া সাহায্যও চেয়েছে মেয়েটি।

কিছুদূর যেতেই আবার শুনতে পেল সেই নারীকণ্ঠ।

'হ্যালো? কে ওখানে?'

এবার আর ওয়াকি-টকি থেকে নয়, সরাসরি সামনে থেকে আসছে কণ্ঠটা। বৃত্তাকার একটা পথ ঘুরে শ্যারনের পিছনে পৌঁছে

গেছে রানা। ফ্ল্যাশলাইট সামনে তাক করে এগিয়ে গেল ও। একটু পরেই দেখতে পেল অপরূপা এক যুবতীকে। গায়ে থারমাল সুট, মাথার উপরে বাঁকা হয়ে আছে একটা মাইনিং হেলমেট। আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে আছে মেয়েটির চেহারা। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে একটা আইস-অ্যাক্স।

'রিল্যাক্স!' কাছে গিয়ে বলল রানা। 'আমি আপনার ক্ষতি করব না।'

মূর্তির মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তরুণী, তারপরেই ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'থ্যাঙ্ক গড!' ছুটে এল ওর দিকে। তবে দু'হাত দূরত্বে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। সুন্দর দুই চোখে ভিড় জমাল বিস্ময়।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। 'এখানে কোত্থেকে এলেন? বাকিরা কোথায়?'

'যদি রেসকিউ পার্টি চান, তা হলে আপাতত আমাকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে,' হালকা গলায় বলল রানা। অকেজো পিস্তলটা উঁচু করল একটু। 'অবশ্য কতটা উপকারে আসব, জানি না। আমি নিরস্ত্র।'

'কিন্তু কে আপনি?' আবারও জানতে চাইল শ্যারন। কথা বলছে জড়ানো গলায়, স্বাভাবিকের চাইতে চড়া সুরে। ভ্রূকুটি করল রানা। মাতাল নাকি?

'আমি মাসুদ রানা, ম্যা'ম,' বলল ও। 'নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

'নুমা?' চোখ পিটপিট করল শ্যারন। 'আলোটা একটু নামাবেন? আপনার ঠোঁট ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না, লিপ-রিডিঙে অসুবিধে হচ্ছে। আমি বধির।'

'ওহ্ সরি!' তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাশলাইট নিচু করল রানা। জড়ানো গলা, আর চড়া কণ্ঠস্বরের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'আপনি কি ওমেগা স্টেশন থেকে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন। মনে পড়ে গেছে ভোরে ল্যাণ্ড করা অনাহূত অতিথিদের কথা।

'জী,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনার তো তা হলে বন্দি থাকার কথা,' বিভ্রান্ত গলায় বলল শ্যারন, 'এখানে এলেন কী করে?'

'অনেক কিছু ঘটে গেছে এর মাঝে, ম্যা'ম,' বলল রানা। 'এই বেইসের সব লোককে ইভ্যাকুয়েট করেছে নেভি। রাশানরা দখল করে নিয়েছে ওমেগা স্টেশন। এখানেও হামলা চালিয়েছে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল শ্যারন। 'কখন ঘটল এতকিছু? আপনি পিছনে রয়ে গেলেন কীভাবে?'

'সবই বলব। তার আগে আপনার পরিচয় দিন। কে আপনি? এখানে একাকী কী করছেন?'

'আমি ড. শ্যারন বেকেট—হেড অভ ওমেগা ড্রিফট স্টেশন...'

সংক্ষেপে স্নেক পিটের সব ঘটনা খুলে বলল শ্যারন। পিছনদিকে একটা চোখ রেখে রানাও ভাগাভাগি করল নিজের অভিজ্ঞতা। শেষে যোগ করল, 'রেডিওতে দানবগুলোকে গ্রেণ্ডেল নামে ডাকছিলেন আপনি। কিছু কি জানেন এই গ্রেণ্ডেল সম্পর্কে?'

'ওগুলো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—আধুনিক তিমির স্থলচর পূর্বপুরুষ। বরফের ভিতর জমাট বাঁধা স্পেসিমেন পেয়েছি আমরা। বায়োলজি টিমের লিডার বলছিলেন, স্পেসিমেনগুলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো... ইতিহাসের শেষ বরফ-যুগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

'বিলুপ্ত হলে কী দেখলাম আমরা? অন্তত চারটে গ্রেণ্ডেল হামলা করেছিল আমাদের উপর।'

'চা-রটা?' ভুরু কোঁচকাল শ্যারন। 'হুম... একটা থাকলে

চারটেই বা অসম্ভব ভাবি কী করে? কথা হলো, ওরা এত বছর টিকে আছে কীভাবে?'

'যে-ভাবেই থাকুক, তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল রানা। 'এই টানেল নেটওয়ার্ক যদি ওদের বাসস্থান হয়, তা হলে এখানে থাকা খুবই বিপজ্জনক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া দরকার। আর কোনও ট্রেইল চেনেন আপনি? আমাকে ধাওয়া করছিল একটা গ্রেণ্ডেল, হয়তো সবুজ ত্রিভুজের ট্রেইলে ঢুকেও পড়েছে। অন্য কোনও পথ খুঁজে নেয়া দরকার।'

'আ... আমি আসলে শিয়োর নই,' ইতস্তত করে বলল শ্যারন। 'স্নেক পিটে খুব কম এসেছি আমি। এখানকার অলি-গলি ভালমত চিনি না। তবে সব ট্রেইল-ই এগজিটে গিয়ে মিলবার কথা।'

'তা হলে এই ট্রেইলেই থাকতে হবে আমাদেরকে,' বলল রানা। 'অসুবিধে নেই, চোখ-কান খোলা রেখে এগোব। যদি কোথাও গ্রেণ্ডেলের চিহ্ন দেখি... মানে নখের আঁচড়, পায়ের ছাপ, ইত্যাদি... তা হলে ওসব জায়গা এড়িয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যারন। ওর আচরণে মুগ্ধ হলো রানা, ভয় পেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। একাকী মুখোমুখি হয়েছিল একটা দানবের, সেখান থেকে বেঁচে ফিরেছে; তারপর স্রেফ একটা ওয়াকি-টকি আর কুঠার নিয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছে... রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে মেয়েটা। তার ওপর কানে শোনে না... অচল একটা ইন্দ্রিয় নিয়ে অসাধ্যসাধন-ই করেছে বলা চলে। শ্রদ্ধা অনুভব করল ও তরুণী বিজ্ঞানীর প্রতি।

'চলুন এগোই,' বলল রানা। 'আর প্রার্থনা করি, পথে যাতে আর দেখা না হয় ওই ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোর সঙ্গে।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। আবারও বোঁ করে উঠেছে মাথা, কানে অনুভব

করছে রক্তচাপ। শিরশির করছে দাঁত। শ্যারনের দিকে তাকাল, ওরও দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে, আল্ট্রাসোনিকসের কম্পন টের পাচ্ছে নিঃসন্দেহে। সবচেয়ে বড় কথা, শব্দতরঙ্গের আঘাত আসছে সামনে থেকে!

মানেটা পরিষ্কার। এগজিটের দিকে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে গ্রেণ্ডেল। ওদিক থেকেই আসছে ওদেরকে ধরতে।

হতাশায় মাথা দোলাল রানা। প্রার্থনা কবুল হয়নি ওদের।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)